সমাজ ও সাহিত্য

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার

বেঙ্গল পাবলিশার্স
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট, কলিকাতা

আনন্দবাজার পত্রিকার কর্ণধার

শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র মজুমদারের

করকমলে—

সূচীপত্র

মহাপরিনির্ব্বান

পশ্চিম দিগ্বলয়ে প্রলয়ের রক্তিমাভা—অনিশ্চিত আশঙ্কার ঘনকৃষ্ণ মেঘমালায় পূর্ব্বাচল আচ্ছন্ন, এমন সময় ভারতের প্রদীপ্ত রবি মধ্যাহ্ন গগনে নিভিয়া গেল। অন্ধকার গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইল। সহস্র বৎসরেও যেমন মানুষ কোন দেশ, কোন জাতি দেখিবার সৌভাগ্য লাভ করে না, তেমনি একজন মানুষ অকস্মাৎ বাঙ্গালী হইয়া বাঙ্গলায় আসিয়াছিলেন,—আজ তাঁহাকে হারাইয়া বাঙ্গালী অনাথ হইল, বিশ্বমানব দরিদ্র হইল।

সার্দ্ধ দ্বিসহস্র বৎসর পূর্ব্বে এই গৌড়ভূমির নিবিড় অরণ্যানীর মধ্যে এক রাজপুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। করুণা ও মৈত্রীর সেই জীবন্ত বিগ্রহ ভারতবর্ষের পথে পথে ভ্রমণ করিয়া জীবন-সায়াহ্নে অশীতিবর্ষ বয়সে আর এক অরণ্য ভূমিতে শিষ্যবর্গ পরিবেষ্টিত হইয়া রোগজীর্ণ তনু ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। আজও ভারতের ধর্ম্মে, শিক্ষায়, শিল্পকলায় যাহা কিছু গৌরবের তাহা তাঁহারই দান। সর্ব্বমানবের কল্যাণৈকলক্ষ্য তাঁহার অভয়বাণী সমগ্র এসিয়া ভূখণ্ডে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, সে ইতিহাস সে দিব্যাবদানমালা আমরা পাঠ করিয়াছি! আর আজ চক্ষুর সম্মুখে দেখিলাম, আর এক রাজপুত্র রাজভবনে জন্মগ্রহণ করিয়া ঐশ্বর্য্য ও স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে প্রতিপালিত হইয়াও কোনও ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রহিলেন না। তাঁহার অনন্যসাধারণ প্রতিভা ও ভাবাবেগের দ্বারা বিশ্ব-মানবকে বন্দনা করিলেন। দেশ ও জাতির গণ্ডী অতিক্রম করিয়া তাঁহার প্রেম সমগ্র পৃথিবীকে, সমগ্র মনুষ্য জাতিকে বক্ষে ধারণ করিল। পীড়িত মানবের বেদনাকে তিনি দিলেন ভাষা, তাহার আশাকে তিনি দিলেন

ছন্দ, তাহার আনন্দ উৎসারিত করিলেন সঙ্গীতের শত ধারায়। মানব মহত্ত্বের এই চিরজাগ্রত পুরোহিত দেশ হইতে দেশান্তরে অশ্রান্ত ভ্রমণ করিয়া "বলের বন্যা" হইতে মনুষ্যত্বকে উদ্ধার ও রক্ষা করিবার বাণী প্রচার করিলেন। নগর ছাড়িয়া পল্লীর নিভৃত অঙ্কে আত্মসমাহিত সাধনায় সুদীর্ঘ জীবন কাটাইয়া অবশেষে অশীতিবর্ষ বয়সে পুনরায় জোড়াসাকোর ঠাকুরবাড়ীর রাজভবনে শিষ্য প্রশিষ্য ও গুণমুগ্ধ ভক্তমণ্ডলী পরিবেষ্টিত হইয়া বয়োজীর্ণ তনু ত্যাগ করিলেন। এতবড় ইতিহাস স্মরণীয় মহাপরিনির্ব্বাণ প্রত্যক্ষ করিয়া যখন শোকনম্র শিরে ফিরিয়া আসিতেছিলাম, তখন পক্ষাঘাতগ্রস্ত পঙ্গুর মত হৃদয় ও মন বুঝিতেই পারিল না যে, ব্যক্তির পক্ষে, জাতির পক্ষে, ইহা কত বড় ক্ষতি। বুদ্ধদেবকে তৎকালীন ভারত অল্পই চিনিয়াছিল। সে মহা ক্ষতি ও মহা ঐশ্বর্য্য জানিবার, বুঝিবার পক্ষে তৎকালে বহু অন্তরায় ছিল। আজিকার এই বিজ্ঞানের যুগে মুদ্রাযন্ত্র ও দ্রুত সংবাদ আদান প্রদানের দিনেও কি সমগ্র জাতি বুঝিতে পারিল যে, সে কি পাইয়াছিল, আর সে কি হারাইল। যাঁহার শবযাত্রার পশ্চাতে কৌতূহলী নরনারীর জনস্রোত দেখিলাম তাহারা কি বুঝিতে পারিল যে, বাঙ্গলার গর্ব্ব ও গৌরবের রবীন্দ্রনাথ কি ছিলেন, কে ছিলেন। এই নিরক্ষরের দেশে শতকরা পঁচানব্বই জন লোকের জ্ঞান বুদ্ধির বাতায়ন চিরতরে রুদ্ধ; রবির আলোক সেখানে প্রতিহত হইয়াছে। যেদিন, এদেশ, এ জাতি স্বাধীন হইয়া সর্ব্বমানবের মুক্তির মধ্যে বন্ধন মুক্তির গৌরব অনুভব করিবে সেইদিন ভারতের প্রান্ত হইতে প্রান্তান্তর এই অলোকসামান্য অবিনশ্বর কীর্ত্তি প্রতিভার আলোকে দীপ্যমান হইবে।

মৃত্যু নশ্বর ক্ষণভঙ্গুর জীবনের চরম পরিণতি—মৃত মানব এই পৃথিবীর মৃত্তিকাতেই পড়িয়া থাকে। মানুষ সহজেই তাহাকে ভুলিয়া যায়। ধাবমান কাল সমগ্র স্মৃতি মুছিয়া ফেলে। কোন ইন্দ্রলোক, চন্দ্রলোকে

অমরত্ব নাই। এই পৃথিবীই কোন কোন মানুষকে অমরত্ব দিয়াছে। সেই মুষ্টিমেয় মহামানবের অনির্ব্বাণ কীর্ত্তির পার্শ্বে রবীন্দ্র প্রতিভাও দূর ভাবীকাল পর্য্যন্ত রশ্মিমালায় সমুজ্জ্বল হইয়া থাকিবে।

বাঙ্গলাদেশের এক দরিদ্র কবি খ্যাতি ও মান না পাইয়াও পরম বিশ্বাসে লিখিয়াছিলেন,—

"সাম্রাজ্য ঐশ্বর্য্য বীর্য্য জগতে নশ্বর
কবিতা অমৃত আর কবিরা অমর।"

রবীন্দ্রনাথের কাব্য সঙ্গীত সত্যই অমৃতের মাধুরীমণ্ডিত; বাঙ্গলা দেশের "কোন কোন ভাগ্যবান" এই অমৃতধারা আশৈশব অঞ্জলি ভরিয়া পান করিয়াছেন, তাঁহাদের শিরায় শিরায় এই অমৃত প্রবাহিত হইয়া অস্থিমজ্জায় মিশিয়া গিয়াছে। তাই তাঁহারা এই দুর্ভাগা জাতির প্রতি প্রেম অম্লান রাখিতে পারিয়াছেন। কৃতঘ্নতা কুসংস্কার লোভের আঘাত ও দংশন তাঁহাদের চিত্তকে মলিন করিতে পারে নাই, বুদ্ধিকে বিকৃত করিতে পারে নাই, নবযুগের এই সকল নূতন মানুষ রবীন্দ্র প্রতিভার সৃষ্টি। চণ্ডীদাসের কাব্য একদিন বাঙ্গলায় মহাপ্রভুর ধর্ম্মকে রূপ দিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের কাব্য মানব ধর্ম্মকে তেমনি এক অপূর্ব্ব রূপ দিয়াছে। জাতি বর্ণ সম্প্রদায়ের সঙ্কীর্ণতার বন্ধন হইতে মুক্ত মানুষ, রবীন্দ্রনাথই বাঙ্গলায় সম্ভব করিয়াছেন। বিশ্বমানবের বেদনার পুরোহিত, দীনতম নরনারীর ক্ষুদ্র জীবনকেও মহিমামণ্ডিত করিয়াছেন।

৭ই আগষ্ট বাঙ্গলার ইতিহাসের চিরস্মরণীয় দিন। এই ৭ই আগষ্টকে স্বদেশী যুগের রবীন্দ্রনাথ রাখিবন্ধন দিন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। বাঙ্গলার ঘরে যত ভাইবোন সকলকে একত্রে মিলাইবার জন্য পরিণত যৌবনের সুঠামকান্তি লইয়া রবীন্দ্রনাথ কলিকাতার পথে বাহির হইয়াছিলেন। সেদিন এই আত্মভোলা প্রেমিকের পশ্চাতে ছিল যুবক

ও ছাত্রদল। রবীন্দ্রনাথের রাখি সেদিন বাঙ্গলার প্রতি পল্লী নগরের আবাল-বৃদ্ধ বনিতার মণিবন্ধে দেশাত্মবোধের মর্য্যাদায় জাগ্রত নূতন শক্তির সঞ্চার করিয়াছিল। সেই সমারোহের স্মৃতি আজ বেশী করিয়া মনে পড়িল, যখন দেখিলাম, কবির বিগতজীবন দেহের পশ্চাতে অশ্রুসজল বাঙ্গলার ছাত্র ও যুবকগণ নতশিরে চলিয়াছে। এ দিনের যুবক ও ছাত্রদের মুখে সেদিনের যুবক ও ছাত্রদের আশা ও সঙ্কল্পের বাণী পুনরায় পাঠ করিলাম। বুঝিলাম তাহারা রবীন্দ্রনাথের মহৎ উত্তরাধিকারকে রক্ষা করিতে পারিবে।

কিন্তু তবুও বর্ত্তমানের এই ক্ষতিকে কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছি না। স্বদেশী যুগে কবির রুদ্র বীণার তীব্র ঝঙ্কারে হৃদয়তন্ত্রীতে যে প্রতিধ্বনি জাগিয়াছিল এখনও তাহার রেশ নিঃশেষ হইয়া যায় নাই। সেই বীণা ফেলিয়া রাখিয়া সত্যই কবি চলিয়া গেলেন। সূর্য্য যেমন প্রতি প্রভাতেই নূতন বিস্ময়ের মত পূর্ব্ব গগনে উদিত হন, তেমনি রবীন্দ্র প্রতিভাও প্রতিদিন নূতন চিন্তা, নূতন কাব্য, নূতন সঙ্গীত অজস্র ধারায় বিতরণ করিয়াছেন। নিঃস্ব কাঙ্গাল জাতি এ ঐশ্বর্য্য বিনা চেষ্টায় অর্জ্জিত সম্পদের মত দীর্ঘকাল পাইয়া আসিতেছে; আজ তাহা শেষ হইয়া গেল। এই নিদারুণ মহাসর্ব্বনাশের সম্মুখে দাঁড়াইয়া মৃত্যুকে ধিক্কার দিব, না জীবনকে বন্দনা করিব! হয়ত কিছুই হারাইলাম না। এক মহৎ জীবনের স্বাভাবিক পরিণতির পরিপূর্ণতার সম্মুখে দাঁড়াইয়া লঘু বিলাপ সহজেই সঙ্কুচিত হয়। যে মৃত্যু শ্লাঘার, যে মৃত্যু গৌরবের সেই মহান্ মৃত্যুর মহিমা উপলব্ধি করিয়া ক্ষয় ক্ষতির উর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিব।

৭ই আগষ্ট, ১৯৪১

রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথ চলিয়া গেলেন। তাঁহার মৃত্যুতে বাঙ্গলার কাব্য ও সাহিত্যের অপূরণীয় ক্ষতি হইল। বাঙ্গলা দেশ, অকাল-মৃত্যুর দেশ। এই দেশে অশীতিপর বৃদ্ধ হইয়াও রবীন্দ্রনাথের চিত্ত, বুদ্ধি, মন ও প্রতিভা আমৃত্যু সতেজ, নবীন ও অম্লান ছিল। তাঁহার বহুমুখী প্রতিভার এই বিশেষত্বই বাঙ্গলার কাব্য ও সাহিত্য-ভাণ্ডারকে অজস্র দানে সমৃদ্ধ করিয়াছে। বাঙ্গলার বর্ত্তমান কাব্য-সাহিত্য একমাত্র তাঁহার সৃষ্টি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কেননা, তিনি কেবল কাব্য ও সাহিত্য সৃষ্টিই করেন নাই, বহু কবি ও সাহিত্যিকও তাঁহার সৃষ্টি। রবীন্দ্র-প্রতিভার আলোকে অনেকেই প্রকাশিত ও উদ্ভাসিত হইয়াছেন। কোন দেশে কোন জাতির মধ্যে এত বড় ঘটনা ইতিপূর্ব্বে কখনও সম্ভব হয় নাই।

রবীন্দ্রনাথ প্রতিভার বরপুত্র। অনুপম ও অতুলনীয় কবিতা, সঙ্গীত, গল্প, উপন্যাস ও প্রবন্ধমালায় তিনি বাঙ্গালীর চিত্ত ভরিয়া দিয়াছেন। দীর্ঘ ষাট বৎসরকাল কাব্য ও সাহিত্যানুরাগীরা অঞ্জলি ভরিয়া যে অমৃত পান করিয়াছেন, তাহার অধিকাংশই রবীন্দ্রনাথের দান। রবীন্দ্র-প্রতিভা আমাদের মনকে কখনও অলস হইতে দেয় নাই—নিত্য নূতন ভাবধারায় আমরা সঞ্জীবিত হইয়াছি; প্রত্যাশায় অতীত নব নব বিস্ময়ে অভিভূত হইয়াছি। আমরা তাঁহার অনুসরণ করিয়াছি, অনুকরণ করিয়াছি। ছোটবড় কোন সমসাময়িক কবি, সাহিত্যিক ও লেখক রবীন্দ্র-প্রতিভার প্রভাব এড়াইতে পারেন নাই। ইহা অগৌরবের কথা নহে। কেবল বাঙ্গলার নহে, পৃথিবীর বহুদেশের কবি ও মনীষীরা পর্য্যন্তও রবীন্দ্রনাথের

ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হইয়াছেন। ইহা স্বাভাবিক ; কেননা, এতবড় কবি-প্রতিভা ও অফুরন্ত সৃজনী শক্তি লইয়া আর কোন মানুষ ইতিহাস-পথে দেখা দেন নাই।

সহস্র সহস্র বল্মীক-পিণ্ডের মধ্যে হিমগিরির মত উত্তুঙ্গ মহিমায় তিনি শোভা পাইতেন। বিশালতায়, বৈচিত্র্যে তিনি অসাধারণ। রূপে রূপে তিনি অপরূপ। সেই রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘায়ত সৌম্য কান্তি আর দেখিব না। উদয়াচলের অরুণ ছটার মত সমুজ্জ্বল সেই আয়ত নেত্রের স্নেহার্দ্র দৃষ্টি আর আমাদের মুখের উপর পড়িবে না, সেই স্পষ্ট, সতেজ, অমৃতমধুর কণ্ঠস্বর বীণার ঝঙ্কারের মত আর হৃদয়তন্ত্রী রণিত করিয়া তুলিবে না। দুঃখ ও বেদনা ইহাই। যাহারা তাঁহাকে দেখে নাই এবং আর দেখিবে না, তাহারা যুগযুগান্ত ধরিয়া রবীন্দ্র-সাহিত্যের রসধারা পান করিবে। কিন্তু যাহারা তাঁহাকে দেখিয়াছে, ঘনিষ্ঠভাবে তাঁহাকে পাইয়াছে, তাঁহার মর্ম্মকথা বুঝিতে পারিয়াছে—তাহারা যাহা হারাইল, তাহা আর এ জীবনে ফিরিয়া পাইবে না। স্রষ্টা ও সৃষ্টিকে একসঙ্গে দেখিবার সৌভাগ্য আমাদের হইয়াছিল। তাই রবীন্দ্রনাথকে হারাইয়া চিত্তলোকে বিজয়া-দশমীর শূন্যতা অনুভব করিতেছি।

সে কি আজিকার কথা! স্বদেশীযুগে এক অভূতপূর্ব্ব জাতীয়তার বন্যা দেখিতে দেখিতে বাঙ্গলাদেশ প্লাবিত করিয়া ফেলিল। তাহার শুভ্র তরঙ্গশীর্ষে দেখিলাম, এক সুন্দর সুঠামকান্তি দিব্য পুরুষ রুদ্র বীণায় ঝঙ্কার দিয়া দেশজননীর বন্দনাগীতিতে দেশ মুখরিত করিয়া তুলিতেছেন। ধূর্জ্জটীর জটাজালনিঃসৃত জাহ্নবীধারা যেমন শত তরঙ্গে প্রবাহিত হইয়া সগর-সন্তানদিগকে দুর্ভাগ্যের অভিশাপ হইতে মুক্ত করিয়াছিল, ঠিক তেমনিভাবে সঙ্গীতে, কবিতায়, প্রবন্ধে একক রবীন্দ্রনাথ উদ্দীপনাময় অভয়বাণী উচ্চারণ করিয়া একটা নিদ্রিত জাতিকে সুপ্তি-শয্যা হইতে

জাগ্রত করিলেন। বিশ্বমানবের কল্যাণে এক অতি উদার সার্ব্বভৌমিক আদর্শ যাঁহার লক্ষ্য ও সাধনা, তিনি যুগ-সন্ধিক্ষণে এবং পরবর্ত্তীকালেও তাঁহার স্বদেশের বিশেষ প্রয়োজন ও অভাব কখনও ভোলেন নাই। ইহা তাঁহার চরিত্র ও প্রতিভার এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য। যখন রবীন্দ্র-প্রতিভার খ্যাতি ভারতবর্ষ অতিক্রম করিয়া দেশ হইতে দেশান্তরে পরিব্যাপ্ত হইল, যখন বিশ্বের বুধমণ্ডলীর আমন্ত্রণ আসিল, তখন রবীন্দ্রনাথ তরী ভাসাইয়া সপ্তসমুদ্রের তীরে তীরে বিভিন্ন সভ্যজাতির আতিথ্য গ্রহণ করিলেন,—কেবল কবি ও দার্শনিকরূপে নহে, অতীত ও বর্ত্তমান ভারতের প্রতিনিধিরূপে। রামমোহন ও বিবেকানন্দের পর রবীন্দ্রনাথ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে জ্ঞান ও বিজ্ঞানের আদানপ্রদানের সম্পর্ক স্থাপনের জন্য অসাধ্য সাধন করিয়াছেন। তাঁহার বিশ্বভারতী সেই সাধনা ও আরাধনার মূর্ত্ত প্রতীক।

বিশ্বপ্রেমিক বলিয়া রবীন্দ্রনাথের খ্যাতি ও অখ্যাতি আছে। সর্ব্বমানবের কল্যাণ যাঁহার কামনা, পীড়িত মানবের বন্ধনমুক্তি যাঁহার দিবসের চিন্তা, নিশীথের স্বপ্ন, তিনি মানবের সভ্যতার ইতিহাসকে ক্ষুদ্র ও খণ্ড করিয়া দেখিতে পারেন না। স্বদেশের পরাধীনতা, লাঞ্ছনা ও অপমান যে ভাবে তাঁহার চিত্তকে সর্ব্বদা ক্ষুব্ধ ও বেদনার্ত্ত করিয়া রাখিত, তেমনি প্রতিচীর পর-ধনলুব্ধ বণিক-সভ্যতার নিদারুণ নিষ্ঠুরতায় মনুষ্যজাতির ভবিষ্যৎ ভাবিয়া তিনি আকুল হইতেন। তাঁহার জীবনের শেষভাগ এই দুশ্চিন্তা ও নৈরাশ্যে কাটিয়াছে। প্রথম মহাযুদ্ধের অবসানের পর মানুষের ক্রূরতা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সম্ভব করিবে বলিয়া তিনি যে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন, তাহা জীবিত কালেই প্রত্যক্ষ করিয়া গিয়াছেন। এই সঙ্কটের দিনে বৃটিশনীতির অনুদারতা ও দূরদৃষ্টিহীনতার জন্য অশেষ ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াও তিনি আমাদিগকে নির্দ্দেশ দিয়াছেন, ভয় পাইও না,

নৈরাশ্যে ভাঙ্গিয়া পড়িও না, এই মহা আহবের অবসানে আকাশের ঘনঘটা কাটিয়া যাইবে, মেঘমুক্ত আকাশে এক নির্ম্মল সূর্য্যোদয় নবযুগকে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিবে। আমরা ভুলি নাই, ভুলিব না তোমার আহ্বান—

নাগিনীরা চারিদিকে ফেলিতেছে
বিষাক্ত নিঃশ্বাস
শান্তির ললিত বাণী
শুনাইবে ব্যর্থ পরিহাস।
বিদায় নেবার আগে তাই
ডাক দিয়ে যাই
দানবের সাথে যারা সংগ্রামের তরে
প্রস্তুত হতেছে ঘরে ঘরে।

হে কবিগুরু! তোমার এই সর্ব্বশেষ আশ্বাসবাণী সম্বল করিয়া আমরা পূর্ব্বদিগন্তের পানে চাহিয়া আছি। বাঙ্গালীর ভাগ্য-গগনের রবি আজ অস্তমিত হইলেও কাল প্রভাতে তাহা পূর্ব্বাচলের উদয় শিখরে পুনরায় আবির্ভূত হইবে। তোমার দেওয়া স্থরে ও ভাষায় সেই নবীন আবির্ভাবকে আমরা বন্দনা করিব, সেই আশায় স্রক্-চন্দন হস্তে বাঙ্গলার পথে দাঁড়াইয়া আছি।

২৩শে আগষ্ট, ১৯৪১

ক্ষ্যাপা মহেশ্বর

রজনী গভীর, সময়ের কোন ঠিকানা নাই, আধ-ঘুম আধ-জাগরণে অস্পষ্ট চিন্তার স্বপ্নখণ্ডগুলি মনে উঠিতেছিল, ভাসিতেছিল, ডুবিতেছিল, এমন সময় নারী-কণ্ঠে কে যেন ডাকিল, "নন্দী! বাহিরে আইস।" এ যেন চির-পরিচিত অথচ কাহার ভুলিয়া গিয়াছি। কতদিন—কে জানে কতকাল! আহ্বান শুনিয়াই মনে হইল, এই ডাক শুনিবার জন্যই যেন জন্ম-জন্মান্তর প্রতীক্ষা করিয়া আছি। জাগরণে যাহা শুনি নাই, নিদ্রায় তাহা ধ্যান-মন্ত্রের মত পরিস্ফুট হইল,—আবার শুনিলাম, "বাহিরে-আইস।"

দেহকে ছাড়িয়া কেমন করিয়া আত্মা বাহির হইয়া যায় জানি না। কিন্তু সত্যই আমি যেন দেহের বন্ধন টুটিয়া বাহির হইলাম। ধরণীর একি রূপ! আলো নহে, অন্ধকার নহে, প্রধুনিত তুলা-রাশির মত স্বচ্ছ বাষ্পাবরণে দশ দিক আবৃত, সবই যেন দেখা যায়। এই অনন্তের মধ্যে একা দাঁড়াইয়া অনুভব করিলাম, কালের গতি স্তম্ভিত হইয়াছে, বহু শতাব্দী যেন আজ মুষ্টি-কবলে ধরিতে পারা যায়। আবার সেই আহ্বান—বিহ্বলের মত অগ্রসর হইলাম। কত গিরি-অরণ্য, নদী-প্রান্তর আমার পদতলে সরিয়া যাইতে লাগিল। কত ক্ষুদ্র-বৃহৎ নগরীর ধ্বংসাবশেষ চকিতে দেখিলাম। সুদীর্ঘ সর্পিল রেলপথগুলির ভগ্ন লৌহ-খণ্ডগুলি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত, সেতুগুলির সাক্ষ্য স্বরূপ ভগ্ন খিলান জলে দাঁড়াইয়া কাঁপিতেছে। সমুদ্রে প্রায় অর্দ্ধ নিমগ্ন বিরাটকায় তরণীগুলির মাস্তুল দেখা যাইতেছে। মহাদেশ হইতে মহাদেশ পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ সমুদ্রের তীরে তীরে তীরে ভ্রমণ করিয়া দেখিলাম, মৃত কঙ্কালের মত মানুষের সৃষ্টির ধ্বংসাবশেষ পড়িয়া আছে। স্বীয় নিঃসঙ্গ একাকীত্বে বিহ্বল হইয়া

চীৎকার করিয়া ডাকিলাম, কে কোথায় আছ সাড়া দাও, মানুষের স্বর শুনিবার জন্য সে কি ঐকান্তিক আকুতি! অনন্তের বুকে একটা প্রতিধ্বনি পর্য্যন্ত জাগিল না। দিন, প্রহর, মাস, বৎসরের কোন চিহ্ন নাই—যেন সীমাহীন কাল মহাশূন্যে নিস্তব্ধ হইয়া আছে।

সহসা দেখিলাম, হিমালয়ের শৃঙ্গে শৃঙ্গে অপূর্ব্ব আলোক রশ্মিতে চির-তুষাররাশি বর্ণে বর্ণে অপরূপ হইয়া উঠিয়াছে। ঐ ত ধবলগিরি, কাঞ্চনজঙ্ঘা, গৌরীশৃঙ্গ; তাহারই পার্শ্বে কৈলাসশিখর যেন রক্তিম শিখার মত জ্বলিতেছে। মুখ ফিরাইয়া অগ্রসর হইলাম। শিলাসনে মহাযোগী মহেশ্বর বসিয়া আছেন। তাঁহার সম্মুখে চিরন্তন মানব যুক্তকরে দণ্ডায়মান। আমাকে দেখিবামাত্র যোগীরাজের চক্ষু বিস্ফারিত হইল। দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলি সঙ্কেতে অদূরবর্ত্তী আসনে বসিবার ইঙ্গিত করিলেন। প্রণাম করিয়া ভীতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলাম, প্রভু! একি দেখিলাম।

অট্টহাস্যে দিক্ কম্পিত করিয়া তিনি বলিলেন, আমি ধ্বংসের দেবতা। আজ আমার সংহার-শূল উদ্যত। সৃষ্টি ও ধ্বংস দুইই আমার লীলাবিলাস। আমি কহিলাম, দেবাদিদেব! মানুষ কোথায় গেল? তাহার কি হইবে?

"মানুষ? ধ্বংসের মহাশ্মশানে নিহত; লক্ষ কোটি নরমুণ্ডের উপর আবার প্রজাপতি ব্রহ্মা নব সৃষ্টির ধ্যানে বসিবেন। সহস্র সহস্র বৎসরের সৃষ্টি আজ সমাধি-শিলার নিম্নে চিরনিদ্রায় অভিভূত। মানুষ যদি সভ্য না হইত, তাহা হইলে ইহা সম্ভব হইত না। যেদিন আদিম মানব ভূপৃষ্ঠে দেখা দিয়াছিল, প্রকৃতিকে জয় করিয়া ভোগের দুরাশায় উন্মত্ত হইয়াছিল, সেই দিন হইতেই আমি মানুষ দিয়া মানুষ মারিতেছি। সহস্র সহস্র বৎসর তাহারা তীর ধনুক বর্শা তরবারি প্রভৃতি দ্বারা পরস্পরকে হত্যা করিয়া আসিতেছে কিন্তু নরকুলকে উৎপাদন করিতে পারে নাই। কত দৈত্য-

দানবকে বর দিয়াছি, ত্রিলোক জয় করিয়া তাহারা যখনই ধ্বংসের ব্রত ভুলিয়াছে, তখন আবার তাহাদেরই সংহার করিয়াছি।

"তারপর মানুষ আবিষ্কার করিল বারুদ, আসিল বন্দুক, আসিল কামান; কিন্তু তাহাও হত্যার পক্ষে অতি সামান্য; তারপর মানুষ হইল সভ্য, আসিল আধুনিক বিজ্ঞান। মারণাস্ত্রের কি বিস্ময়কর দ্রুত উন্নতি! মানুষ শিখিল উড়িতে, জলের নীচ দিয়া চালাইল জাহাজ, পর্ব্বত-স্তূপ গলাইয়া বাহির করিল লৌহ, পরিবর্ত্তিত হইল বৃহৎ কামানে অতিকায় অর্ণবপোতে। খনির গহ্বর হইতে তুলিয়া আনিল প্রস্তরীভূত অঙ্গার— কি তাহার উত্তাপ দাহজ্বালা ও শক্তি! মানুষ বলিতে লাগিল, প্রকৃতিকে জয় করিয়া সে ধরণীকে সুন্দর ও শোভাময় করিয়া তুলিবে; কিন্তু কাজে সে সংগ্রহ করিতে লাগিল বিপুল মারণাস্ত্র-স্তূপ। যন্ত্র! যন্ত্র! বিস্ময়কর শক্তি!"

আমি বলিলাম, "মহাদেব! মানুষের প্রতিভা বহুমুখী। সে সঙ্গে সঙ্গে অন্ধ বিশ্বাসের পরিবর্ত্তে আনিয়াছে যুক্তিবাদ। সে চায় বিশ্বশান্তি, সর্ব্বমানবের ভ্রাতৃত্ব।"

মানব: "হে আদি পুরুষ! আমরা সহস্র সহস্র বৎসর সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরকে খুঁজিয়াছি। সেই কল্পিত পরম দয়ালুর অভয় আশীর্ব্বাদ যাজ্ঞা করিয়াছি। আমাদের কাতর আবেদনের আর্ত্তস্বরকে প্রতিধ্বনি করিয়াছে ব্যঙ্গ। তখন আমরা আমাদের মস্তিষ্ক-বলে ঈশ্বরকে সৃষ্টি করিয়াছি। অন্তরের অন্তস্তলে আত্মার মধ্যে ঈশ্বরের অন্বেষণে ক্লান্ত ও বিরক্ত আমরা এতদিন পর তাঁহাকে খুঁজিয়া পাইয়াছি আমাদের রাসায়নিক গবেষণাগারে। জড় প্রকৃতিপুঞ্জের অন্ধ উদ্দাম শক্তির মধ্যে যেদিন আমরা তাঁহার সন্ধান পাইলাম, সেদিন তাঁহার অশরীরী আত্মাকে আমরা যন্ত্রদেহের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করিয়াছি। যন্ত্র দিয়াছে আমাদিগকে

মর্য্যাদা আশীর্ব্বাদ গৌরব ও শক্তি—বস্তুপুঞ্জ হইতে সতত উচ্ছীয়মান শক্তির নিত্য অপচয়কে আমরা যন্ত্রের মধ্য দিয়া মানুষের সৃজন সম্পদ সঞ্চয়ের কাজে লাগাইয়াছি। আমরা শক্তিমান, আমরা কেন ধ্বংস হইব ?"

মহারুদ্রের মুখমণ্ডল আরক্ত হইয়া উঠিল। অট্টহাস্যে তিনি আপন মনেই বলিতে লাগিলেন, "মানুষ এই যন্ত্র সৃষ্টি করিয়াছে আমারই জন্য এবং আমার ভক্ত ভৃত্য অত্যাচারী সম্রাট, ডিক্টেটর প্রভৃতি মানব-শত্রুর জন্য। যন্ত্র যতই বৃহৎ হইতে বৃহত্তর হইয়াছে আমি হাসিয়াছি, দেখিয়া আনন্দিত হইয়াছি মানুষ কেমন করিয়া যন্ত্রের ক্রীতদাসে পরিণত হইতেছে।"

আমি ভয়ার্ত্ত সম্ভ্রম ভরে কহিলাম, "প্রভো! এই যন্ত্র মানুষের প্রভু নহে, পরম বান্ধব। যন্ত্রের অজস্র সৃষ্টির দাক্ষিণ্য মানবকে বিচ্ছিন্নতা ও অনৈক্য হইতে একসূত্রে বাঁধিতেছে। আজিকার অকল্যাণ ও দুর্ম্মতি কাল থাকিবে না।"

অট্টহাস্যে মহাশূন্য প্রতিধ্বনিত করিয়া মহাদেব বলিলেন, "আমার সৃষ্টি এই যন্ত্র আমিই আমার ভৃত্যগণের হস্তে তুলিয়া দিয়াছি। কিন্তু যন্ত্রের কল্যাণশক্তিকে তাহারা ধ্বংসের কাজে লাগাইয়াছে। শ্বেত-মানুষের যন্ত্র পীতকায়ের হস্তে যাইতেছে, পরস্পরকে তাহারা হনন করিতেছে, এক মহাযুদ্ধের ধ্বংসাবশেষের উপর তাহারা আর এক বিশাল মহাযুদ্ধের পত্তন করিতেছে। সব ধ্বংস হইবে, জড়-বিজ্ঞানের দু'দণ্ডের লীলাবিলাস ও ক্ষণিক জয়ের উত্তেজনা ধ্বংসকে আরও তীব্র ও ব্যাপক করিবে। পৃথিবীর সমস্ত আহৃত সম্পদ এবং মানুষের অবিরত শ্রম যন্ত্রের বিশাল ক্ষুধার্ত্ত জঠরে জীর্ণ হইয়া যাইবে, পরে ইহা তাহার স্রষ্টাকে আহার করিবে ; লক্ষকোটি মানবের সমাধিভূমি এই যন্ত্রের জঠরে। যন্ত্র মানুষকে হত্যা করিতেছে, সমাজকে বিষাক্ত করিতেছে, নগর জনপদ দগ্ধ করিতেছে,

অগণিত মানবকে দরিদ্র ক্ষুধিত করিয়া রাখিয়াছে। এইবার আমি ধ্বংসকে সম্পূর্ণ করিব। আমার উদ্যত সংহার শূলের নির্দ্দেশ লক্ষ্য করিয়া, হে মানব, অগ্রসর হও।"

আমি কাতরে কহিলাম, "সৃষ্টির উপর ধ্বংসকে জয়ী করিয়া পরিণাম কি হইবে প্রভু? কি ইহার রহস্য?"

"রহস্য? রহস্য আমি জানি না। সহস্র সহস্র বৎসর এই শিলাসনে বসিয়া সেই রহস্যেরই অনুসন্ধান করিতেছি, পরম রহস্যময়ী মহাকালীর কালনৃত্য দেখিব বলিয়া। কিন্তু করালিনী কথা কহে না, নির্নিমেষ ত্রিনয়ন মেলিয়া ভীষণা শুধু চাহিয়া থাকে, ভয়ে ত্রস্ত সমুদ্র গর্জ্জন করে, অরণ্যানী আলোড়িত হয়, মরুভূমির তপ্ত বালুকা অন্ধ আক্রোশে ছুটিয়া চলে। মানুষ হিংসায় ক্ষোভে উন্মত্ত হইয়া শস্ত্রপাণি মূর্ত্তিতে পরস্পরের সম্মুখীন হয়। এ রহস্য তিনিই জানেন।"

মহেশ্বরের কণ্ঠস্বর সহসা নিস্তব্ধ হইয়া গেল। তিনি যেন কাহাকেও লক্ষ্য করিয়া দৃষ্টিপাত করিলেন। আমিও চাহিলাম, দেখিলাম চরণ-নূপুর ধ্বনিতে অপূর্ব্ব শিঞ্জন তুলিয়া মহাকালী আসিতেছেন। মহাকালের মুখের দিকে চাহিয়া মহাকালী ঈষৎ হাস্য করিলেন, তাঁহার রুধির সিক্ত ওষ্ঠদ্বয় কাঁপিতে লাগিল। চিরন্তন মানুষ আর আমি উভয়ে উৎকর্ণ হইলাম। সৃষ্টি ও প্রলয়ের রহস্য এখনই বুঝি বা মনোহর সঙ্গীতের মত বাজিয়া উঠিবে।

সহসা উঠিল ঝড়, গাঢ়তর অন্ধকারে সূর্য্য চন্দ্র তারকা ডুবিয়া গেল। আমার পার্শ্ববর্ত্তী মানুষকে খুঁজিয়া পাইলাম না। এক মহাশূন্যে নিরাবলম্ব হইয়া ভাসিতে লাগিলাম।

১২ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪১

লোকখ্যাতি

উদ্দেশ্যহীনভাবে পথ, চলিতেছিলাম। এমন সময় এক দোকানের সাইনবোর্ড দেখিয়া মনে পড়িল, কয়েকটি জামা তৈয়ার করিতে হইবে। এই দোকানে আমি কখনও প্রবেশ করি নাই। অপরিচিত আর দশজন আগন্তককে যেভাবে অভ্যর্থনা করা হয় আমিও ঠিক সেইভাবে আপ্যায়িত হইয়া এক বৃহৎ আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইলাম। একজন সুশ্রী যুবক আসিয়া গায়ের মাপ লইলেন এবং আমার ফরমাইজ খাতায় লিখিলেন। আমি বলিলাম, 'কিছু টাকা জমা রাখুন।' যুবক স্মিত মুখে উত্তর দিল, 'আপনার টাকা জমা দেবার আবশ্যক নেই। সোমবার নিয়ে যাবেন।' তাহার মুখে দেখিলাম একটা সম্ভ্রমের দীপ্তি। বুঝিলাম এই যুবক আমার নাম ও চেহারা দুই-ই জানে। খ্যাতির সহিত শ্রদ্ধার এই স্বাভাবিক সমাবেশ দেখিয়া একটু ভাবাবেগ জাগ্রত হইল। নিতান্ত বালকোচিত আগ্রহ সহকারে বলিলাম, 'না, না, টাকাটা যখন আছে, দিয়েই যাই।' পাঁচ টাকার নোটখানি যুবক গ্রহণ করিয়া বিনা বাক্যব্যয়ে রসিদ কাটিয়া দিল। আমি দোকান হইতে পথে বাহির হইলাম। নিজের আচরণটা একটু নাটকীয় মনে হইল। অমনভাবে টাকাটা না দিলেও চলিত।

লেখক ও সাংবাদিক বলিয়া দীর্ঘকালে আমার একটা খ্যাতি গড়িয়া উঠিয়াছে। এই শ্রেণীর খ্যাতি খুব উচ্ছ্বাসময় ও মুখর নহে। আমি এত খ্যাতিমান নহি যে রাস্তায় বাহির হইলে জনতা পশ্চাতে ধাবিত হইবে, দিব্য স্বচ্ছন্দে ট্রামে, বাসে অথবা পায়ে হাটিয়া চলাফেরা করিতে পারি। কদাচিৎ কেহ অঙ্গুলি নির্দেশে অপরকে দেখাইয়া দেয়, অনুচ্চ কণ্ঠে কি যেন বলে, তখন বুঝিতে পারি আমারই কথা হইতেছে। সাংবাদিকদের ভক্তমণ্ডলী দেশব্যাপী ছড়াইয়া আছে, আর আছে

অপরিচয়ের রহস্যময় ব্যবধান। এই খ্যাতি স্বল্পজীবী। সাংবাদিক নেপথ্যে চলিয়া গেলে লোকে অল্পেই ভুলিয়া যায়। তবুও জনমনোরঞ্জন এবং তাহার বিনিময়ে প্রাপ্য খ্যাতির প্রতি আমার আকাঙ্ক্ষা নাই, এমন কথা বলিতে পারি না। হয়ত বা সচেতনভাবে যশ ও খ্যাতির পশ্চাতে ছুটি নাই বলিয়া কিছু খ্যাতি আপনিই গড়িয়া উঠিয়াছে।

খ্যাতি সব সময় সুখের নহে, শান্তিরও নহে। বহু যশস্বী লোক দেখিয়াছি যাঁহারা লোকখ্যাতির লোভে আত্মগৌরব অপরকে দিয়া ঘোষণা করাইয়া লন। যে খ্যাতি তাঁহার প্রাপ্য নহে এবং যাহা অপরের, তাহাও আত্মসাৎ করেন। খ্যাতিমান হইবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এই সকল ব্যক্তির অনুরোধ উপরোধে সংবাদপত্র ও সাংবাদিকদিগকে যে কত বিব্রত হইতে হয় তাহা ভুক্তভোগী মাত্রই জানেন। কিন্তু জননায়কদের সম্বন্ধে এ কথা বলা চলে না। তাঁহাদের খ্যাতি জনতামহারাজের খেয়ালের উপর নির্ভর করে। যখন জলস্রোতের মত জনস্রোত ইঁহাদের পশ্চাতে ছুটিতে থাকে, কেহ দেখিবার জন্য, কেহ দু'টি কথা শুনিবার জন্য, কেহ পদধূলি লইবার জন্য, উন্মাদের মত ব্যাকুল হইয়া ওঠে তখন সেই খ্যাতিকে পরিপাক করা কঠিন। জনতার এই অত্যাচারকে বিরক্তি গোপন করিয়া হাস্যমুখে সহ্য করা এক সুকঠিন ব্যাপার। গান্ধীজী এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। জওহরলাল জনতার আচরণে মাঝে মাঝে বিরক্ত, এমন কি ক্রুদ্ধ হইয়া উঠেন। কিন্তু তিনিও লোকখ্যাতির প্রতি উদাসীন নহেন। সুভাষচন্দ্রকেও দেখিয়াছি। জনতার উৎপাত এমন কি অত্যাচারও তিনি হাসিমুখে সহ্য করিয়া যান। জনতার শ্রদ্ধা ও ভক্তির উচ্ছ্বাসকে তিনি অতি সচেতন মন দিয়া উপভোগ করেন। এই শ্রেণীর জননায়কগণের দুঃখ ও বেদনা কত গভীর। লবণাক্ত সমুদ্রের অপরিমিত সলিলরাশির মধ্যে যেমন এক বিন্দু পানীয় জল মেলে না, তেমনি জনতার

আবর্ত্তের মধ্যে থাকিয়া ইঁহারা প্রাণের যোগ স্থাপন করিতে পারেন না। তাঁহাদের চক্ষুর সম্মুখে বিশাল জনতা অপরিচিত অরণ্যানীর মতো উদ্বেল হইয়া উঠে। শৃঙ্খলাহীন ধৈর্য্যহীন জনতার অত্যাচার ও উৎপীড়ন সহ্য করিয়া লোকখ্যাতির আনন্দ ইঁহারা কতটুকু অনুভব করেন বলা কঠিন। কেননা, আমার মত ইঁহারা সচ্ছন্দে পথ চলিতে পারেন না, কোন প্রমোদ উদ্যানে কিংবা রাজপথে বিশ্রাম ও ভ্রমণ সুখ উপভোগ করিতে পারেন না, এমন কি গৃহে বন্দীর মতো লুকাইয়া অবস্থান করিতে হয়। উৎসুক ভক্তিমান জনতাকে ভৎর্সনা করাও কঠিন। তাহারা কিছুই কামনা করে না, নেতার সুখশান্তি আরামও বুঝে না, বারান্দায়, জানালায় উৎসুক দৃষ্টি মেলিয়া চাহিয়া থাকে।

এইখানেই শেষ নহে। রাস্তায়, ঘাটে, চায়ের দোকানে, বৈঠকখানায় উকিল-সভায় এই সকল নেতাদের কার্য্যকলাপ এবং রাজনৈতিক মতামত লইয়া আলোচনা হয়। সেই সকল তর্কযুদ্ধে দুই দলের মধ্যে বচসা ক্রমে হাতাহাতিতে পরিণত হয়। যে জনতা একদিন জয়ধ্বনিতে গগন বিদীর্ণ করে সেই জনতাই আবার বিক্ষোভে ভাঙিয়া পড়ে। জননায়কগণের লোকখ্যাতি পারদের মত তরল, চপল, উজ্জ্বল এবং অনির্দ্দিষ্ট, সর্ব্বদাই টলমল। তথাপি ইহার উত্তেজনা ও মোহ সামান্য নহে। এবং এই খ্যাতির প্রতি, এই কণ্টক-মুকুটের প্রতি অনেকেরই হাস্যকর লোভ আছে। সভামঞ্চে বক্তৃতা করিয়া, কিংবা আইন-সভায় গর্জ্জন করিয়া সস্তা লোকখ্যাতির মোহে ইঁহারা মশগুল হন।

আমাদের দেশের কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিকেরা অতটা জনপ্রিয় হইতে পারেন না। তাঁহাদের জনপ্রিয়তাটা অনেকাংশে শান্ত, গভীর এবং রসজ্ঞ ও সাহিত্যামোদী সমাজের মধ্যেই আবদ্ধ। এই শ্রেণীর শ্রদ্ধা ও অনুরাগ চপল ও চঞ্চল নহে। কোন বিশেষ মতবাদ বা কর্ম্ম-প্রচেষ্টার

উপর এই খ্যাতি নির্ভর করে না। যিনি লেখনী-মুখে পাঠক পাঠিকার মনোরঞ্জন করিতে পারেন তিনি নিজের অজ্ঞাতসারেই এই খ্যাতির অধিকারী হন। এই খ্যাতিরও তারতম্য আছে। কাহারও খ্যাতি দূর ভাবীকালে প্রসারিত, কাহারও খ্যাতি সমসাময়িক কালের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। জীবন অবসান অথবা লেখনী স্তব্ধ হইলেই মানুষ তাঁহাদের ভুলিয়া যায়। অথচ আশ্চর্য্য এই, অনেকের ধারণা সমসাময়িক কালের যাঁহার রচনার আদর হইল না, ভাবীকালে তিনি পূজা পাইবেন। কিন্তু যাহাকে সমসাময়িক সম্মান দিল না, ভাবীকাল তাহাকে লইয়া মাথায় করিয়া নাচিবে এই প্রত্যাশার মধ্যে যে কি সান্ত্বনা আছে তাহা আমি জানি না।

আমি সাংবাদিক ও লেখক। যতটুকু খ্যাতি বা অখ্যাতি আমার প্রাপ্য তাহার অধিক কিছুই কামনা করি না। আমি জানি, অতি ক্ষুদ্র দৈনন্দিন প্রয়োজন পূরণ করিয়া আমার রচনা সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় চির-নিদ্রায় অভিভূত হইয়া থাকিবে। সেই আবর্জ্জনাস্তূপের ধূলিজাল সরাইয়া কোন কৌতূহলী পাঠক তাহা আর অন্বেষণ করিবে না। ক্ষণিক প্রয়োজনের, ক্ষণিক তৃপ্তির মধ্যেই তাহার অবসান। যে ফুল প্রভাতে ফুটিয়া সন্ধ্যায় ঝরিয়া যায় তাহাও সংসারে মূল্যহীন নহে। একজন হিতৈষী বন্ধু কহিলেন, 'সংবাদপত্রে তো অনেক লিখলেন, কিছু স্থায়ী সাহিত্য রচনা করুন। নামটা অন্তত থাকবে।' ইহাও খ্যাতির প্রলোভন। আমার মৃত্যুর পর লোকে যাহাতে আমাকে ভুলিয়া না যায় সে ব্যবস্থা আমাকেই করিতে হইবে। "স্থায়ী সাহিত্য" হইবে আমার স্বহস্তে নির্ম্মিত কীর্ত্তিস্তম্ভ। অপরে কিছু করিবে না এই আশঙ্কায় সেকালের পাঠান ও মোগল সম্রাটেরা স্ব স্ব সমাধিসৌধ জীবিতকালেই নির্ম্মাণ করিতেন। কিন্তু আমি সম্রাট নহি, কর্ম্মবীর নহি, আমার ক্ষুদ্র কর্ম্মক্ষেত্র বর্ত্তমানকালের

মধ্যেই সীমাবদ্ধ। আমি কহিলাম, বর্ত্তমানকাল ও সমাজের প্রতি আমার যে ক্ষুদ্র কর্ত্তব্য আছে তাহাই যথাসাধ্য পালন করিব। ভাবীকালের প্রতিও আমার কর্ত্তব্য আছে এতবড় স্পর্দ্ধা রাখি না। বন্ধু বলিলেন, 'অতীতের কাছে তুমি ঋণী। আজকের বর্ত্তমান কাল হবে অতীত, কাজেই ভাবী কাল বোলে কিছু নেই। ইহকালই নিত্য বর্ত্তমান।' কিন্তু অনেক চিন্তা করিয়াও নিজের খ্যাতিকে ভাবীকালের দিকে প্রসারিত করিবার মত প্রেরণা ও উৎসাহ পাইলাম না। সম্ভবতঃ আমার মানসিক গঠন-প্রণালীই এরূপ যে খ্যাতি ও যশের প্রতি বিশেষ কোন লোভ নাই। লোকখ্যাতি মিথ্যা কুৎসার মতই রসনায় রসনায় নৃত্য করিয়া শূন্যে মিলাইয়া যায়। এই "বন্য হংসীর পশ্চাদ্ধাবন" করিবার আমার উৎসাহ নাই, লোভও নাই। খ্যাতি তাহাদের থাকুক যাহারা খ্যাতির কাঙ্গাল। কীর্ত্তিহীন কর্ত্তব্যই সাংবাদিকের লক্ষ্য। সাংবাদিকের ব্রত, সৈনিকের ব্রত। যে সৈনিকের শোণিত-মূল্যে বিজয়লক্ষ্মীর বরমাল্য সেনাপতির কণ্ঠ বিভূষিত করে, তাহার বীরত্ব ও শৌর্য্যের কোন ইতিহাস থাকে না। অগণিত স্তূপাকৃতি মৃতদেহের মধ্যে রণক্ষেত্রেই তাহার সমাধি চিহ্নহীন।

১৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪১

নারীর মর্য্যাদা

বাসে চলিয়াছি। সম্মুখের আসনে তুইটি মেয়ে পাশাপাশি বসিয়া আলাপ করিতেছিল। যে কথাগুলি কানে আসিয়াছিল, তাহা সাজাইলে গুছাইলে এইরূপ দাঁড়ায়,—

"শুনেছিস্, রমার বিয়ে হয়ে গেল।"

"তাই নাকি ? তা হলে বি. এ. টা আর দেবে না।"

"দরকার কি বল ? ভাল বর জুট্‌লে বাপ মা আর পড়াবার দরকার বোধ করেন না।"

"রূপের জোরেই রমার বিয়ে হয়ে গেল বল্।"

"রূপ আর এমন কি ? ফরসা হলেই রূপসী হয় না।"

"কেন ওর শরীরের গড়নও মন্দ নয়। যে কোন রঙের সাড়ীতে ওকে চমৎকার মানায়।"

প্রসঙ্গটা চাপা পড়িল। নারীর রূপের যে একটা মূল্য আছে, এটা তাহাদের সহজাত সংস্কার। মনুষ্য-সমাজ চিরদিনই নারীর রূপ ও সৌন্দর্য্যকে প্রধান আসন দিয়াছে। রূপবতী নারীর গুণ ও বিদ্যা যদি থাকে ত ভালই, না থাকিলেও কোন ক্ষতি নাই। নিছক রূপের জন্যই নারী সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে সমাদৃতা। কাব্যে, সঙ্গীতে, কতভাবে নারীর রূপ বর্ণিত হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। ভাস্কর, তক্ষণশিল্পী, চিত্রকর, মন্দিরগাত্রে, প্রাসাদ-তোরণে, চিত্রপটে নারীর বিকশিত যৌবন উৎকীর্ণ করিয়াছে। রূপসী নারী সর্ব্বজন-মনোলোভা। পুরাণে, ইতিহাসে রূপসী নারীকে লাভ করিবার জন্য কত যুদ্ধ-বিগ্রহের ইতিহাস লিপিবদ্ধ হইয়াছে, যুগ-যুগান্ত ধরিয়া মানুষ সেই সকল চিরস্মরণীয়া নারীর কাহিনী আগ্রহভরে পাঠ করিতেছে। রূপই নারীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য্য। পুরুষ এই রূপের

কাঙাল, নারী তাহা জানে। কি ভাবে বসন-ভূষণ-প্রসাধন-পারিপাট্যে রূপকে মনোহর করিয়া তুলিতে হয়, এ বিদ্যা নারী যুগযুগান্ত হইতে চর্চ্চা করিয়া আসিতেছে। কেননা, নারী জানে যে গুণবতী অপেক্ষা রূপবতীর আদর বেশী।

রূপ সূর্য্যের মত স্বপ্রকাশ, পুষ্পের মত পেলব লাবণ্যে বিকশিত। রূপের সম্মুখে দাঁড়াইয়া মানুষ নিমেষেই মুগ্ধ হয়। চারিত্রিক গুণ বুঝিতে হইলে বিদ্যাবুদ্ধি, মার্জিতরুচি আবশ্যক এবং তাহাও চক্ষের পলকপাতে বুঝা যায় না। সে পরিচয় লাভ করিতে হইলে সময়ের আবশ্যক। কিন্তু, তথাপি নারীর রূপ পুরুষ অপেক্ষা নারী বোঝে বেশী। নারীর রূপ সম্বন্ধে পুরুষ অপেক্ষা নারীর মতের মূল্য অধিক ; কেননা নারীর চক্ষে কামনা ও মোহের তৃষ্ণা নাই। সে নারীর রূপকে সহজভাবে, অচঞ্চলচিত্তে যাচাই করিতে পারে। পুরুষেরা পরস্পরের দৈহিক সৌন্দর্য্য সম্পর্কে এক স্বাস্থ্য ব্যতীত সর্ব্বদাই অনেকটা উদাসীন। কিন্তু, নারী অন্য নারীকে পুরুষোচিত ঔদাসীন্য লইয়া দেখে না। পুরুষ কোন নারীর চক্ষু, কেশদাম, নিটোল বাহুলতা, পীবর বক্ষ প্রভৃতি দেখিয়া মুগ্ধ হয়। কিন্তু নারী, নারীর সর্ব্বাবয়বিক সৌন্দর্য্যকে সমগ্রভাবে বিচার করিয়া তবে মত প্রকাশ করে।

পোযাক-পরিচ্ছদ-প্রসাধন সম্পর্কেও সেই কথা বলা চলে। পুরুষেরা পরস্পরের পোষাক পরিচ্ছদ সম্পর্কে অনেকটা উদাসীন। ফ্যাসান-পাগল নকলনবীশ ছাড়া অধিকাংশ পুরুষই পরস্পরের পরিচ্ছদ লইয়া আলোচনা করে না। কিন্তু মেয়েদের বেলায় ইহা সম্পূর্ণ বিপরীত। তাহারা প্রত্যেকটি খুটিনাটি বিচার করে, সমালোচনা করে এবং পরস্পরের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে চেষ্টা করে। কোন রঙের শাড়ী কখন পরিতে হয়, কোন অলঙ্কার কিরূপ মানায় এ সম্বন্ধে নারীর মন সর্ব্বদা সজাগ ও

সচেতন। কেননা, রূপই তাহার একমাত্র সম্বল। এ সম্বন্ধে পুরুষের ব্যবহার তাহাকে অনেক শিক্ষা দিয়াছে।

বহুযুগ অতিক্রম করিয়া আমরা জ্ঞান বিজ্ঞানে উন্নত বিংশ শতাব্দীর মধ্যাহ্নে আসিয়াছি। প্রাচীনগণের কুসংস্কার ও নির্ব্বুদ্ধিতার আমরা সমালোচনা করি। মনে করি, বুদ্ধি ও চিত্তের উৎকর্ষের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের রুচিও বদলাইয়াছে। দেহকে অতিক্রম করিয়া দেহাতীত চিত্ত ও মনোলোকের সৌন্দর্য্য ও ঐশ্বর্য্য আমরা উপলব্ধি করিতে পারি। কিন্তু সমাজজীবনে দেখি নারী সম্পর্কে পুরুষ এখনও আদিম যুগের বর্ব্বরই রহিয়া গিয়াছে। যে কোন সংবাদপত্রের পাত্রপাত্রীর বিজ্ঞাপন পাঠ করিলেই দেখা যাইবে সকলেরই সুন্দরী ও গৌরবর্ণা পাত্রী চাই। বাঙ্গলা দেশে দৈহিক সৌন্দর্য্যে কুৎসিত এমন নারীর সংখ্যা অতি কম। অধিকাংশই মানানসই মাঝারি গোছের সুন্দরী। গৌরবর্ণা কন্যার সংখ্যা শতকরা দশজনও হইবে কিনা সন্দেহ। অবশ্য, কন্যার পিতা ও অভিভাবক স্বর্ণ ও রৌপ্য দ্বারা গাত্রচর্ম্মের মালিন্যের ক্ষতিপূরণ করিয়া দিলে, স্বতন্ত্র কথা। শিক্ষিতা, গৃহকর্ম্মনিপুণা, স্বাস্থ্যবতী, নৃত্যগীত পটিয়সী এ সকল যদিও উল্লেখ করা হয়, কিন্তু আসল সমাদর রূপের। বিবাহ-যোগ্যা কন্যাকে সাজিয়া গুজিয়া এই রূপের পরীক্ষা বারম্বার দিতে হয়। সেকালের বালিকাদের নিকট ইহা কৌতুকের ছিল। কিন্তু, একালের তরুণীদের পক্ষে ইহা দস্তুরমত অপমানজনক। কিন্তু, অসহায় পিতামাতার মুখ চাহিয়া বি, এ, পাশ যুবতীকেও এই আত্মাবমাননা ও অপমান সহ্য করিয়া যাইতে হয়। স্বতঃই তাহার মনে প্রশ্ন জাগে, রূপ ছাড়া আমার মধ্যে কি আর মর্য্যাদা ও সম্মান পাইবার কিছুই নাই। বিদ্যা, বুদ্ধি, চরিত্রবল এসকলের যেন কোনই মূল্য নাই, রূপই একমাত্র সম্পদ। তাহা হইলে, প্রশ্ন দাঁড়ায় নারী মাত্রেই রূপোপজীবিনী।

'কাল মেয়ের কাল হরিণ চোখ' কবিতায় পড়িতেই সুন্দর। সমাজে সে অনাদৃতা।

এই রূপের বেসাতি লইয়া নারী যুগের পর যুগ অতিক্রম করিয়াছে। এই রূপ তাহাকে হীনকুল হইতে সাম্রাজ্ঞীর আসনে বসাইয়াছে, হিরণ্ময় অলঙ্কারে ভূষিত করিয়াছে। যেকালে নারী বীর্য্যশুল্কা ছিল, সেকালে কত বীর তাহার রূপের বেদীমূলে জীবনের অর্ঘ্য ঢালিয়া দিয়াছে। যেকালে নারী অর্থলভ্যা সেকালেও মানুষ উন্মত্তের মত ঐশ্বর্য্যের স্বর্ণ-পারিজাতের একটি করিয়া পাপ্‌ড়ি খসাইয়া অর্ঘ্য দিয়াছে। নারীর রূপ তরঙ্গের পর তরঙ্গ তুলিয়া পুরুষের হৃদয়ের তটভূমিতে আবেগে এলাইয়া পড়িয়াছে। ভোগের অনলে আত্মাহুতি দিয়া সে পুরুষকে গৃহ দিয়াছে, পরিজন দিয়াছে; সমাজের শৃঙ্খলা ও সুবিন্যস্ত ব্যবস্থাকে নারী চিরদিন ধারণ করিয়া আছে। গৃহে গৃহে, জননী জায়া কন্যারূপে এই নারীকেই আমরা দেখিতে অভ্যস্ত। ইহারা কোন কালেই স্বাধীনা নহে। শাস্ত্রের নির্দ্দেশে বাল্যে পিতার, যৌবনে ভর্ত্তার এবং বার্দ্ধক্যে পুত্রের অধীন। নারীর অন্য-নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র স্বাধীন সামাজিক মর্য্যাদা নাই। ফলে নারী এত পাইয়াও তৃপ্ত হয় নাই। অতৃপ্তির ক্ষুধায় স্বীয় স্বাতন্ত্র্য অনুভব করিবার জন্য সে কখনও হইয়াছে সন্ন্যাসিনী, কখনও হইয়াছে স্বৈরিণী। রূপ দিয়া পুরুষকে ভুলাইয়া পারিবারিক জীবনের পরনির্ভরশীল তৃপ্তিকে আমরা দীর্ঘকাল উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছি। মাতৃত্বের মহিমা, সতীত্বের গরিমা, সেবাব্রতধারিণীর বন্দনা রচনা করিয়া আমরা নারীর আত্মাভি-মানকে তৃপ্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু নারীকে তাহার প্রাপ্য মর্য্যাদার আসন দিতে পারি নাই।

আমরা যাহা পারি নাই, বিজ্ঞান ও যন্ত্রযুগ তাহাই সম্ভব করিয়াছে। পাশ্চাত্যের নারীরা প্রথম বেড়া ভাঙ্গিয়া ব্যাপকতর কর্ম্মক্ষেত্রে দেখা

দিলেন। সমাজের বিবিধ মঙ্গল কর্ম্মে তাঁহারা আত্মনিয়োগ করিলেন। কেবল তাহাই নহে, কর্ম্মক্ষেত্রে পুরুষের মতই উপার্জ্জনশীলা হইয়া সামাজিক সম্ভ্রম ও মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হইলেন। এ মর্য্যাদা পুরুষের দয়ার দান নহে, ইহা তাঁহারা দুঃখের মূল্যে অর্জ্জন করিয়াছেন এবং বহু বাধা বিঘ্নের মধ্য দিয়া পুরুষের বহু পরুষকলুষিত সমালোচনা সহ্য করিয়া তাঁহারা সামাজিক বিরুদ্ধতাকে জয় করিয়াছেন। আমাদের দেশে তাহার সূচনা মাত্র দেখা দিয়াছে। অবশ্য, শুশ্রূষাকারিণী, শিক্ষয়িত্রী ব্যতীত জীবনের আর কোন কর্ম্মক্ষেত্রে এখনও ভারতীয় নারীরা বিশেষ অধিকার পান নাই। যেটুকু পাইয়াছেন তাহাতেও বিরুদ্ধতার সহিত তাহাদের যুদ্ধ করিতে হইয়াছে। শিক্ষিতা ও আধুনিকা নারী সম্পর্কে সমাজের স্তরে স্তরে পুরুষমহলে যে সকল আলোচনা হয় তাহা কাপুরুষোচিত বর্ব্বর রুচিরই পরিচায়ক। উপর্জ্জনশীলা কিম্বা স্বাধীন শিক্ষিতা নারীর অপবাদ রটনা করিতে এই হতভাগ্য দেশে রসনার অভাব নাই! এই অপমান, অসম্মান, সংযম ও ধীরতার সহিত সহ্য করিয়া যাঁহারা হাসিমুখে কর্ত্তব্য পালন করিতেছেন, তাঁহারাই আনিতেছেন রূপকে অতিক্রম করিয়া নারীর চারিত্রিক কর্ম্ম-কুশলতার মর্য্যাদা। আজিকার সমাজের মূঢ়, নির্ব্বোধ জনমণ্ডলীর কটূক্তি ইহা প্রতিরোধ করিতে পারিবে না। নারী আজ তাঁহার অন্যনিরপেক্ষ আত্মশক্তির সন্ধান পাইতেছে। এই শক্তিকে অচরিতার্থ রাখিয়া তাহারা কেন গতানুগতিক জীবনযাত্রার মধ্যে সন্তুষ্ট হইয়া থাকিবে। যাহারা নিজেদের সংস্কৃতিমান ও উদার বলিয়া গর্ব্ব করেন, তাহারা যদি পারেন তাহা হইলে আনন্দ ও আগ্রহের সহিত নারীকে এই স্বাভাবিক মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হইবার সুযোগ দিন। ব্যর্থ ও নিষ্ফল সমালোচনা অতীতের কুসংস্কারকেই প্রশ্রয় দেয় মাত্র।

১০ই অক্টোবর, ১৯৪১

বাঙ্গলার দুর্ভাগ্য

বৃটিশ শাসন এখনও অব্যাহত ও অক্ষুন্ন। এতকাল বৃটিশ সামাজ্যের অধীন ভারতকে কোন প্রতিশ্রুতি দূরের কথা এমন কোন আশ্বাসও দেওয়া হয় নাই যে তাহার রাজনৈতিক ভাগ্য সে নিজের হাতে গড়িবার অধিকার পাইবে। সেদিন আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রীয় কংগ্রেসে মিঃ চার্চ্চিল যুদ্ধের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, ইউরোপের পরাধীন জাতিগুলির অপহৃত স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারই আমাদের ব্রত। এশিয়ার পরাধীন জাতিগুলির কিম্বা ভারতবর্ষের কোন উল্লেখই তিনি করেন নাই। ভারতবর্ষ চিরদিনই বৃটেনের করায়ত্ত ও অধীন থাকিবে, এই ভরসায় বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা নীরব হইয়া আছেন। শত্রুর আক্রমণ হইতে ভারতকে রক্ষা করিতে পারিবেন, এ দৃঢ়তাও তাঁহারা দেখাইতেছেন। আভ্যন্তরীণ ব্যাপারেও এই পুলিশী রাষ্ট্রের শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষার কড়াকড়ি কোনদিক দিয়াই শিথিল হয় নাই। হিন্দু-মহাসভার অধিবেশন প্রতিরোধ করিতে গিয়া, ভাগলপুরের কর্ত্তৃপক্ষের যে দণ্ডধারী মূর্ত্তি আমরা দেখিলাম তাহার মধ্যে প্রভুত্বের অহমিকার চির-পরিচিত ভ্রূকুটিলভঙ্গী আমাদের দৃষ্টি এড়ায় নাই। ভারতবাসী যেই হউন, যত বড়ই হউন, তাঁহার মর্য্যাদা, প্রতিশ্রুতি, যুক্তিতর্কের কোন মূল্যই শাসকগণ দিতে প্রস্তুত নহেন। মুষ্টিমেয় স্থানীয় অধস্তন কর্ম্মচারীর হুকুম ও নির্দ্দেশ চরম বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। সিন্ধুদেশে প্রধান মন্ত্রী আলাবক্স আর্ত্তনাদ করিয়া বলিতেছেন, মন্ত্রীদের শাসন ব্যাপার নির্ব্বাহের সামান্য অধিকারেও গভর্ণর অত্যন্ত আপত্তিজনকভাবে হস্তক্ষেপ করিতেছেন। আবার উড়িষ্যার কতিপয় কংগ্রেসদ্রোহীকে হস্তগত করিয়া সিভিলিয়ান গভর্ণর এক মন্ত্রিসভা খাড়া করিয়াছেন। শাসনতন্ত্রের মধ্যে মন্ত্রিমণ্ডল যে

সিবিলিয়ান দলের সম্মুখের শিখণ্ডীমাত্র ইহার বহু প্রমাণ সম্মুখে থাকা সত্ত্বেও বাঙ্গলায় কংগ্রেসদোহী দল, হিন্দুমহাসভা, মুস্লিম লীগ একত্র হইয়া নূতন মন্ত্রিমণ্ডল গঠন করিলেন এবং এই মন্ত্রিমণ্ডলের সমর্থকেরা ডঙ্কা বাজাইয়া দিনের পর দিন প্রচরে করিতেছে, সুখ-সমৃদ্ধি-শান্তির এক নবযুগ আসিল। দেশশুদ্ধ চিন্তাহীন লক্ষ্যহীন বুদ্ধিমানের দল স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া ভাবিতে লাগিল, বাঁচা গেল। নূতন মন্ত্রিমণ্ডল গঠিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে জাপ আক্রমণের আশঙ্কায় সমস্ত বাঙ্গলা দেশ জরুরী অঞ্চল বলিয়া ঘোষিত অর্থাৎ গভর্ণর সিবিলিয়ানতন্ত্রসহ শান্তি, শৃঙ্খলা ও ব্যবস্থার ভার স্বয়ং গ্রহণ করিলেন। মন্ত্রীদের কোন ক্ষমতাই রহিল না।

শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার এমন দেশব্যাপী নিখুত সুব্যবস্থার মধ্যে সহসা কলিকাতা সহর ত্যাগ করিয়া লক্ষ লক্ষ নর-নারী প্রাণভয়ে পলাইয়া গেল কেন? বৃটিশ বাহুবলের উপর এতবড় অবিশ্বাস আসিল কোথা হইতে? গত দুই বৎসরের মধ্যে এক কংগ্রেস ব্যতীত বর্ত্তমান ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আর কোনদিকে সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে কোন অসন্তোষ ও আপত্তি প্রকাশিত হয় নাই। অথচ, বিপদ না আসিতেই বাঙ্গালী নিজের ঘর নিজে ভাঙ্গিয়া চলিয়া যাইতেছে। বাহির হইতে দেখিলে মনে হইবে যে, বোমার ভীতিই একমাত্র কারণ। কিন্তু যাঁহাদের দূরদৃষ্টি আছে, তাঁহারা দেখিতেছেন, লক্ষ্যভ্রষ্ট, আদর্শভ্রষ্ট বাঙ্গলার বুদ্ধিজীবি ও বৃত্তিজীবী শ্রেণীর আদর্শভ্রষ্টতাই রহিয়াছে ইহার মূলে। অতি মাত্রায় আত্মকেন্দ্রিক হইয়া মধ্যশ্রেণী একদিকে আত্মবিশ্বাস হারাইয়াছে, অন্যদিকে পারস্পরিক নির্ভরতাও হারাইয়াছে। শিক্ষিত বাঙ্গালী পাপ করিয়াছে, প্রায়শ্চিত্ত করে নাই। আজ সেই প্রায়শ্চিত্তের দিন আগত।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের সেবাধর্ম্ম ও স্বদেশী যুগের দেশাত্মবোধ—এই দুইএ মিলিয়া বাঙ্গালীকে চরিত্রের একটা নূতন বনিয়াদ দিয়াছিল।

আত্মীয়কুটুম্ব পরিবৃত পারিবারিক জীবনের সঙ্কীর্ণতা হইতে বৃহৎ সমাজ জীবনের ঐক্য, দায়িত্ব গ্রহণ করিবার পথের সন্ধান বাঙ্গালী পাইয়াছিল। সেই পথে আসিল অগণিত পথিক, রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা লাভের কামনাকে তাহারা দুর্জ্জয় রূপ দিয়া আত্মোৎসর্গের এক অপরূপ শক্তির বিকাশ করিল। প্রেম, পরিজন, অর্থোপার্জ্জন, বিষয়লিপ্সা দুই পায়ে দলিয়া এই বাঙ্গালী সর্ব্ববিধ প্রগতিশীল ও সংস্কৃতিমূলক আন্দোলনে এবং রাজনৈতিক আন্দোলনে যে ইতিহাস রচনা করিয়াছে, পরাধীন সত্বেও তাহা লইয়া আমরা গৌরব বোধ করিতে পারি। ১৯২১-এর আন্দোলন ও ১৯৩০-৩২ এর আন্দোলনেও বাঙ্গালী ভারতবর্ষের পুরোভাগে ছিল, একথা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তাহার পর কিসে যে কি হইল, কি ভাবে বাঙ্গালীর চিন্তায় ও চরিত্রে বুদ্ধিতে ঘুণ ধরিল কেহ তাহার হিসাব করিল না। যাত্রাভঙ্গে সবই ছত্রভঙ্গ হইল। বাঙ্গালী-প্রধানেরা, কর্ম্মবীরেরা একটা প্রাদেশিক অহমিকায় ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন। কি ব্যবসা ক্ষেত্রে, কি সামাজিক ব্যাপারে, কি রাজনীতিতে বাঙ্গালী অবাঙ্গালী কথাটি অত্যন্ত বেশী শোনা যাইতে লাগিল। বাঙ্গালীর আত্মাভিমানের অনলে ফুৎকার দিয়া বাঙ্গালীর ঘর আলোকিত করিবার চেষ্টা হইল, সেই আগুনে বাঙ্গালীর কপাল পুড়িল। বাঙ্গালী কংগ্রেসদ্রোহী হইল, মুস্লিম লীগের চাকুরী ও প্রতিষ্ঠা কাড়াকাড়ির নকলে হিন্দু মহাসভা করিল, প্রাদেশিকতা ও সাম্প্রদায়িকতার ধ্বজা হাতে যে দাপাদাপি সুরু হইল, তাহার ফলে সঙ্ঘশক্তি চূর্ণ হইয়া গেল! বিশ বৎসরের চেষ্টায় বাঙ্গলার প্রতি পল্লী নগরে যে প্রতিষ্ঠানগুলি গড়িয়া উঠিয়াছিল, নিজ হাতে আমরা তাহা ভাঙ্গিয়া দিয়াছি। গান্ধিজী অথবা কংগ্রেসের সম্মিলিত নেতৃত্বের ভুল ত্রুটির প্রতিকার করিতে গিয়া আমরা কংগ্রেসের মর্ম্মকেন্দ্রে আঘাত করিতেও কুণ্ঠিত হইলাম না। সেই আঘাত আজ প্রতিঘাতরূপে ফিরিয়া

আসিয়াছে। কি মুস্লিম লীগ, কি হিন্দু মহাসভা উভয়েরই কোন সুশৃঙ্খল শাখা প্রশাখাসমন্বিত সঙ্ঘ নাই। কতকগুলি উত্তেজক ও বিদ্বেষ তিক্ত বচন দ্বারা সমাজের এক এক অংশে ইহারা একটা বিশেষ মানসিক অবস্থা সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছে মাত্র। সাম্প্রদায়িকতা,—বুদ্ধির বিকৃতি, চরিত্রের দৌর্ব্বল্য। প্রচণ্ডতা ও প্রবলতায় যে পার্থক্য, নিষ্ঠুরতা ও বীরত্বে যে পার্থক্য—সাম্প্রদায়িকতা ও জাতীয়তায় সেই পার্থক্য। মানুষের নিকৃষ্ট রিপুকে উত্তেজিত করিয়া কোন মহৎ কর্ম্ম হয় না, কোন বৃহৎ প্রতিষ্ঠান গড়া বা রক্ষা করা যায় না। দুর্ভাগা বাঙ্গালী তাহা বুঝিল না। তাহার অর্দ্ধ-শতাব্দীকালের জাতীয় ঐক্য, স্বাধীনতার সাধনায় সে আর বিশ্বাস রাখিতে পারিল না। প্রতিকূল বায়ুকে সে অনুকূল মনে করিয়া অনির্দ্দেশ যাত্রায় তরী ভাসাইল। আত্মখণ্ডনের এমন শোচনীয় দৃশ্য দেখিয়া যাহারা সাবধান-বাণী উচ্চারণ করিল, তাহারা বিদ্রূপের পাত্র হইল, নির্য্যাতিত হইল। জনমতকে উচ্ছৃঙ্খল ও উন্মার্গগামী করিয়া জননায়কত্ব রক্ষা করা যায় না। সেই বিয়োগান্ত নাটকের অভিনয়ও আমরা দেখিলাম। আজ দেখিতেছি বিপদের সম্ভাবনাতেই বাঙ্গালী ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িতেছে, সত্যিকার বিপদ আসিলে ইহাদের কি দশা হইবে কে জানে। শান্তি-শৃঙ্খলা ইহাতে বিঘ্নিত হয় নাই, কাজেই শাসকগণ নির্ব্বিকার। কিন্তু, বাঙ্গালী মধ্যশ্রেণীর সামাজিক ও অর্থ নৈতিক জীবনে যে বিপর্য্যয় আসিল তাহা কি কেহ চিন্তা করিবে না? কই বাঙ্গলার কোন প্রান্তে কোন আশার বাণী, কোন অভয় বাণী ত ধ্বনিত হইতেছে না। গৃহহারা আশ্রয়-লিপ্সুদিগকে শোষণ ও উৎপীড়ন করিতে কেহ' ত কসুর করিতেছে না। কোনও বাঙ্গালী প্রধানের মুখে জাতীয় চরিত্রের এই প্রগল্ভ বিকৃতির বিরুদ্ধে একটি কথাও ত শুনি না।

অল্পদিন পূর্ব্বের অতীতের দিকে চাহিয়া দেখ, এই অসহায় অবস্থা

তোমরা নিজেরাই ডাকিয়া আনিয়াছ। আদর্শভ্রষ্টতা তোমাদিগকে চরিত্র-ভ্রষ্ট করিয়াছে এবং এই চরিত্রভ্রষ্টতা তোমার সঙ্ঘশক্তি ক্ষয় করিয়াছে। এখনও যদি তোমরা পুনরায় পূর্ব্বগামী দেশসেবকদের আদর্শ সঙ্ঘনিষ্ঠায় ফিরিয়া আইস, তাহা হইলে এই দুর্দ্দিনে বাঁচিবার একমাত্র সম্বল ফিরিয়া পাইবে। অবিলম্বে জাতীয় পতাকা-হস্তে বাঙ্গালী পুনরায় ঐক্যবদ্ধ হইয়া নিখিল ভারতীয় কংগ্রেসের পতাকাতলে সমবেত হও। স্বাধীকার লাভের পথই আত্মরক্ষার একমাত্র পথ। আমাদের ক্ষীণকণ্ঠে যদি ভৈরবের হুঙ্কার থাকিত, তাহা হইলে একবার ডাকিয়া বলিতে পারিতাম, বাঙ্গলার বৃত্তিজীবী ও বুদ্ধিজীবী শিক্ষাভিমানী ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা বিকৃতবুদ্ধির অহমিকা ত্যাগ করিয়া পুনরায় ঐক্যবদ্ধ কংগ্রেসকে প্রতি পল্লীনগরে প্রতিষ্ঠা করুন। আর্ত্ত ও অমঙ্গলভীত ছত্রভঙ্গ বাঙ্গালীকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া মাভৈ বাণী শুনান। আমরা সাধারণ সৈনিকের মত অবনতশিরে আপনাদের অনুগমন করিব।

২রা জানুয়ারী, ১৯৪২

প্রেমে পড়া ও বিবাহ

শিরোনামা দেখিয়া কেহ মনে করিবেন না যে আমি "হিয়া দগদগি পরাণ পোড়ানির" লক্ষণযুক্ত প্রেম এবং তাহার শেষ অঙ্কে হয় বিবাহ নয় চিরন্তন দীর্ঘশ্বাসের একটা মনোরম আলেখ্য আঁকিতে বসিয়াছি! গল্প? আমার চেয়ে কৃতী ব্যক্তিরা যে-সব প্রেমকাহিনী লিখিয়াছেন এবং লিখিতেছেন, তাহার সহিত পাল্লা দিবার মত দুঃসাহসও আমি রাখি না। প্রথমেই স্বীকার করা ভাল যে অনেক কাল হইল আমি প্রেমে পড়ি নাই; সে দিন আয়নায়, মুখে, গণ্ডে, গ্রীবায় কালের কুঞ্চিত লোল রেখাগুলি এবং বিরলকেশ মস্তকটি দেখিয়া বুঝিলাম প্রেমের সে তীব্র অনুভূতি আর আমার জীবনে আসিবে না। অতএব অগত্যা 'ক্ষণিকার' কবির সহিত সুর মিলাইয়া বলিতে পারি,—

"সবলে কারেও ধরিনে বাসনা মুঠিতে,
দিয়াছি সবারে আপন বৃন্তে ফুটিতে।"

কোন একজন বিলাতী বড় কবি (নাম মনে নাই) বলিয়াছেন, কোন আবেশ বা রসাভূতিতে চিত্ত যখন অভিভূত বা আচ্ছন্ন থাকে, তখন কবিতা লেখা চলে না। শান্ত ও অনুদ্বিগ্ন মনের পক্ষেই রসানুভূতিকে কাব্যের রূপান্তরে প্রকাশ করা সম্ভব। কথাটা ঠিক। যখন লোকে প্রেমে পড়িয়া হাবুডুবু খায় তখন সে সব কথা গুছাইয়া বলিতে পারে না; তখন তাহার কথা অর্থহীন কূজনের মত কলকাকলীতে ভাঙ্গিয়া পড়ে, নয় অন্তর্লীন মৌনতায় সমাধিস্থ হইয়া থাকে। আবেগের জোয়ার সরিয়া গিয়া যখন তাহা স্মৃতিতে অভিজ্ঞতার পলি রাখিয়া যায়, তখনই দার্শনিকের অনাসক্ত মন লইয়া প্রেমে পড়ার কথা আলোচনা করা চলিতে পারে।

এখন কথাটা বলি। প্রেমে-পড়া এমন কিছু কঠিন নহে। যে-কেহ সময় ও সুযোগ পাইলে প্রেমে পড়িতে পারে। তবে প্রেমের লক্ষণগুলি খাঁটি কি মেকী বুঝা কঠিন। কম্প, পিপাসা, উত্তাপ দেখিয়া জ্বর ধরা যায়; কিন্তু তাহা ম্যালেরিয়া কি ডেঙ্গু অথবা স্বল্পস্থায়ী ইনফ্লুয়েঞ্জা তাহা ঠাহর করা যায় না। এই জন্যই কেহ পস্তায়, কেহ পিছাইয়া পড়ে, কেহ বা সামলাইয়া লয়, আবার কেহ নিজের ছেলেমানুষীর জন্য নিজেই লজ্জিত হয়। এই সকল কারণে 'বাল্য-প্রেম' কথাটার কাব্যে ও গল্পে ছড়াছড়ি। প্রেমের রহস্য-যবনিকা উদ্ঘাটন করিবার চেষ্টায় 'বাল্যপ্রেম' শিক্ষা-নবিশীর সুযোগ দেয়—ছায়া না কায়া ধরিতে যাইতেছি তাহা হাতেকলমেই শিখিতে হয়।

'বাল্যপ্রেম' বা বয়োসন্ধিকালের প্রেমটা আমাদের সমাজে থাকিতে পারে না। বঙ্কিমচন্দ্রের 'প্রতাপ-শৈবলিনী' দীর্ঘকাল কিশোর-কিশোরী যুবক-যুবতীদের ভয় দেখাইয়া অভিভাবককুলের আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছে। 'কুন্দনন্দিনীর' মরণ আর 'বিনোদিনী'র দশা দেখিয়া অমন দয়াল শরৎবাবুও 'রমা-রমেশের' বিবাহ দিতে পারেন নাই, বৈদান্তিক কিরণময়ীকে পাগল করিয়া ছাড়িয়াছেন। বাল্যপ্রেমের উপর নাকি 'বিধাতার অভিশাপ' আছে। তাহা আছে কিনা জানি না, যৌতুকের লোভ, সামাজিক সংস্কারের দণ্ডভীতি যে আছে তাহা প্রত্যক্ষ। তবে 'বাল্য-প্রেমের' ব্যর্থতায় সকলেই প্রতাপের মত ইন্দ্রিয়সংযম দ্বারা পূণ্যার্জ্জন ও অক্ষয় স্বর্গপ্রাপ্তির আশায় তুদিনের নশ্বর জীবন কাটাইয়া দেয় না। বাল্য-প্রেমের অভিজ্ঞতা আমার আছে বলিয়াই একথাটা বলিতেছি। আট বৎসর বয়সেই প্রেমে পড়িয়াছিলাম। তাহার বাবা বদ্‌লী হইয়া আমাদের গ্রামে আসিলেন। খাঁটি পদ্মাপারের মেয়ে, ঐ নদীটির প্রখর চঞ্চলতা ওর সারা দেহে। তাহার উপর দারোগার মেয়ে,

দারোগা বলিলেই হয়। প্রথম দর্শনে প্রেমে পড়ি নাই। গ্রামের দশটা মেয়ের মতই ও ছিল সামান্যা ও সাধারণ। দোল উপলক্ষ্যে যাত্রা— উত্তরা-অভিমন্যু অর্থাৎ কীচকবধের পালা। লাল-নীল সেজের আলোর সামনে আমরা ছেলেমেয়েরা ভাল কাপড় পরিয়া বসিয়াছি। পালা শেষ হয়, উত্তরা ও অভিমন্যুর ফুলবাগানে দেখা, উভয়ের প্রণয়-সঙ্গীত—ঠিক সেই সময় আমি তার মুখের দিকে চাহিলাম। খয়েরের টিপ-পরা শ্যামা মেয়েটির চোখে-মুখে সে কি দীপ্তি! আমার চাহনীর অর্থ বুঝিয়া সে লজ্জায় মুখ ঘুরাইল। যাত্রা কি হইল আর মনে নাই, আমার মন অভিমন্যুর সহিত কেবলি গাহিতে লাগিল, "বললো সরলে এ ফুলেরই আগে, অন্য ফুল কেন নয়নে না লাগে।" ঐ সময় প্রেমে না পড়িয়া আমার উপায় ছিল না। মাস দুই নেশার মত ভাব ছিল, তারপর আবার বদ্‌লী প্রাসাদাৎ সে বালুর খেলাঘর কালের সৈকতে মিলাইয়া গেল।

বাল্য-প্রেমের কাহিনী শুনিয়া অনেকে হাসেন। অরুণোদয়ের পূর্ব্বে ঊষার বিকাশ, বা নববসন্তের অনুদ্ভিন্ন শোভা দেখিয়াও তাহা হইলে হাসিতে হয়। বাল্য-প্রেম আসলে বিশ্বপ্রকৃতির প্রতি মানব-হৃদয়ের প্রথম অনুরাগ, সৌন্দর্য্যানুভূতির প্রথম জাগরণ; বাল্য-প্রেম হৃদয়ের দীপ-শিখা জ্বালাইবার মণি-দীপ।

তরুণ বয়সে প্রেমে-পড়া স্বাভাবিক। মানসিক উন্নতি ও চারিত্রিক গুণাবলী বিকাশের ব্যায়ামশালা হইল প্রেমে পড়িয়া আকুলি-বিকুলি করা। প্রেমে পড়াকে যাঁহারা একটা ব্যাধি মনে করিয়া উৎকণ্ঠিত হন, তাঁহাদিগকে আশ্বাস দিয়া আমি বলিব—ছেলেবেলায় হামজ্বর হইলে যেমন বিপদের আশঙ্কা নাই, তেমনি এ প্রেমও সহজেই আরোগ্য হয়। বেশী বয়সে হামজ্বর যেমন মারাত্মক ব্যাধি, বেশী বয়সে প্রেমে পড়িলে তাহাও সাংঘাতিক হইয়া উঠে। বেশী বয়সে প্রেমে পড়িলে বুড়ারা যেমন

কাণ্ডজ্ঞান হারাইয়া পাগল হইয়া উঠে, যুবকেরা সেরূপ হয় না। যৌবনের প্রেম শালীনতার তটবন্ধনে স্রোতস্বিনীর মত কলতানে বহিয়া যায়। প্রেম ব্যাপারে যুবক বেহিসাবী ও উদ্দাম হইলেও তাহা দেখিতে সুন্দর ; কিন্তু বেশী বয়সে উহা অত্যন্ত বেমানান। বেশী বয়সে প্রেমে "পড়া" উচিত নহে, ধীর পদক্ষেপে হাঁটিয়া চলাই উচিত। পায়ের তলার মাটি ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া সাবধানে চলার দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছিল আমার বন্ধু "সুদূর মফঃস্বলের ত্যাগী কর্ম্মী" তারাপদ। দীর্ঘকাল খদ্দর ও কংগ্রেসের সেবা করিয়া চিরকুমার অতএব ত্যাগী তারাপদ আইন সভার সদস্য হইল। পৈত্রিক ও স্বোপার্জ্জিত (অসদুপায়ে না বলিয়া সকলে যে ভাবে টাকা করে সেই উপায়ে বলাই সঙ্গত) অর্থে স্বচ্ছল তারাপদ একদিন আসিয়া আমাকে বলিল,--"মনিকাকে আপনার কেনন মনে হয় ?" "খাসা মেয়ে, এম, এ পাশ করে রুদ্রাণী কন্যা মন্দিরে চাকরী করছে, বেশ নম্র ধীর।" তারাপদ একথা সেকথার পর অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিল,—"রান্নাবান্না ঘর সংসারের কাজকর্ম্ম......" আমি হাসিয়া বলিলাম,—"সেকথা আর বলতে হবে না—পরিপাটি, পরিপাটি !" তারাপদ মনস্থির করিয়াই আসিয়াছে। স্বাভাবিকভাবে বলিল, "আপনার সঙ্গে ত প্রায়ই দেখা হয়, দেখা হ'লে বলবেন, তারাপদ রাজী আছে, নমস্কার।" মধ্যবয়সে প্রেম ও বিবাহ করিতে হইলে হিসাবী ও সাবধানী তারাপদর আদর্শ ই গ্রহণ করা উচিত। কিন্তু যুবক এত হিসাবী না হইলে দোষ দেওয়া যায় না। আমার বন্ধু হরিশবাবু এই ভুল করিয়া পস্তাইতেছেন। যুবক পুত্র প্রেমে পড়িয়াছে শুনিয়া তিনি চটিয়াই লাল। পুত্রকে বুঝাইলেন,—"দাশরথীবাবু নগদ মোটা টাকা গয়না যৌতুক এত দিচ্ছে , তা ফেলে তুই ঐ ইস্কুল মাষ্টারের মেয়েটাকে—ছিঃ ছিঃ !" পুত্র অটল। "টাকার জন্য বিয়ে করা দোষের কি ! তোর মাকে বিয়ে না

করলে এই লোহার কারবার বাড়ী গাড়ী কি হত ?” পিতৃ-আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া ‘মহাপাতকী’ পুত্র ইস্কুল-মাষ্টারের কন্যার জন্য বাড়ী ছাড়িল।

টাকার লোভে বিবাহ করা বা টাকাকে বিবাহ করা আমাদের দেশে দোষের নহে। হরিশবাবু বলেন, বিবাহে টাকা লওয়া অপেক্ষাও টাকা রোজগারের অনেক হীনতম পন্থা আছে। টাকার আদান-প্রদানের মধ্যে যতই কসাইবৃত্তি থাকুক—তাহাতে বিবাহোত্তর প্রেমের কোন বাধা হয় না। বিবাহের পর নিশ্চিন্তে নিরুদ্বেগে প্রেমে পড়াই আমাদের পারিবারিক ও সামাজিক বিধান। সর্ব্বোচ্চ মূল্যে ছেলে-বেচার দলও ধর্ম্ম আওড়াইয়া বলে,—“শুভদৃষ্টি চার চোখের মিলন, ও যে বিধির বিধান। জন্মান্তরের স্ত্রী ঠিক হইয়াই আছে, মানুষ কেবল নিমিত্ত হইয়া মিলন ঘটাইয়া দেয়।” বিবাহের ও প্রেমের জন্মান্তর পর্য্যন্ত প্রসারিত পারমার্থিক ব্যাখ্যা সম্বন্ধে আমার কোন বক্তব্য নাই। ভগবানের ইচ্ছায় চালিত হইয়া যাঁহারা মেয়ে পছন্দ করিবার ও মেয়ের বাপের তহবিল মারিবার জন্য চতুর শিকারীর মত ঘুরিয়া বেড়ান, সেই সকল ধার্ম্মিক ব্যক্তি সমাজের শ্রদ্ধাস্পদ সন্দেহ নাই।

যাহা হউক ধর্ম্মের অনুশাসন না মানিয়া প্রেমে পড়িতে গিয়া চণ্ডীদাস-রজকিনী হইতে অনেকের লাঞ্ছনা হইয়াছে। অনেক চতুর ব্যক্তি রাধাকৃষ্ণের আবরণে পরকীয়া রসাস্বাদন করিয়া প্রণাম ও প্রণামী কুড়াইয়াছেন। সে যাহা হউক, প্রেমে পড়ার আতিশয্যের পরিণাম শুভ হয় না—অনেক দুঃখ সহিতে হয়। শকুন্তলা ও দময়ন্তী তাহার প্রমাণ। যে দেশে মেয়েরা পারিবারিক ও সামাজিক “কন্‌সেণ্ট্রেশান ক্যাম্পে” এতকাল ছিল—তাহার এতদিন পরে যখন স্কুল কলেজ ও চাকুরী-ক্ষেত্রে দেখা দিয়াছে—তখন প্রেমে পড়া ঠেকাইবার উপায় নাই। অতএব যুবকেরা প্রেমে পড়ুক এবং মনোমত বিবাহ করুক। কিন্তু মানস-প্রতিমা

রচনা করিয়া আকাশে নীড় বাঁধিবার স্বপ্ন না দেখাই ভাল। মানানসই আটপৌরে গোছের প্রেমে পড়িয়া চটপট বিবাহ করিয়া ফেলাই উচিত। তাহা যে পারে না, তাহার স্বাধীনভাবে প্রেমে পড়া উচিত নয়। সামাজিক বা পারিবারিক "ফরমাইসী প্রেমের" দাম্পত্য জীবনের সুখ অন্বেষণ করার গতানুগতিক ধারা অনুসরণ করাই তাহার পক্ষে বুদ্ধিমানের কার্য্য। যাহারা প্রেমে পঁড়িয়া বিবাহ করিতেছে তাহাদের দুঃসাহসকে আমি বন্দনা করি। আমার দীর্ঘ অভিজ্ঞতা হইতে বলিব,—প্রেমে পড়ার কোন 'ফরমূলা' নাই। সামাজিক অচলায়তনের দণ্ডভীতিমুক্ত আধুনিক যুবক-যুবতী প্রেমে পড়িয়া বিবাহ করিতেছে—ইহা সমাজ-জীবনের স্বাভাবিক স্বাস্থ্যেরই লক্ষণ; এক বলিষ্ঠ নূতন সমাজের বনিয়াদ ইহারা রচনা করিতেছে। আমার মত বুড়ারা ইহাদের অভিশাপ না দিয়া আশীর্ব্বাদ করুন।

৫ই মার্চ্চ, ১৯৪৩

একটি-ভাবের মানুষ

এলাহাবাদ যাইতেছিলাম, ট্রেনেই দেখা। গল্প জমিয়া উঠিল। প্রৌঢ় ভদ্রলোক, চোখে মুখে একটা অমায়িক ভাব। অগ্রহায়ণের উজ্জ্বল দিন। কলিকাতার ধূলি-ধূম ছাড়িয়া ট্রেন মুক্ত প্রান্তরে প্রবেশ করিয়াছে। এই খুসীর অবসরে কত কথাই না বলিতে ও শুনিতে ইচ্ছা করে! কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই আমি আবিষ্কার করিলাম, ভদ্রলোক সব কথাই ঘুরাইয়া ফিরাইয়া ভিটামিনে আনিয়া উপস্থিত করেন। বাঙ্গালী জাতির দুঃখ-দুর্দ্দশার কথা আমিও আর দশজনের মতই ভাবিয়া থাকি, কিন্তু কেবলমাত্র এবং একমাত্র ভিটামিনের প্রতি অবহেলাই যে তাহার কারণ এতটা ভাবিতে পারি নাই। কিন্তু আত্মপ্রত্যয়ে অটল ভদ্রলোক আমাকে তাহাই ভাবাইয়া—অন্ততঃ স্বীকার করাইয়া ছাড়িবেন। বিরক্ত ও বিব্রত হইয়া উঠিলাম, আকারে ইঙ্গিতে তাহা প্রকাশও করিলাম; কিন্তু তাঁহার পাদ্রী-সুলভ উৎসাহ দমিবার নহে। বাঙ্গালীর সঙ্গীত, শিল্পরুচি, কবিতা, এমন কি রাজনীতি—কোন কথা তুলিয়াই তাঁহার মনের মোড় ঘুরাইতে পারিলাম না। তিনি আপন মনেই উত্তেজিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন: দেখছেন, ওরা কেবল খাদ্যের প্রাণকেই পিষে মারছে না, মানুষ-মারা কল বসিয়েছে। বর্দ্ধমান জেলার রেলপথের পাশে কোন চাউলের কলের প্রতি তাঁহার তর্জ্জনী অভিশাপের ভঙ্গীতে উদ্যত হইল। আর সহ্য করা কঠিন। "লাঞ্চে"র নাম করিয়া খাবারের গাড়ীতে গিয়া উঠিলাম। এইরূপ একটি-ভাবের মানুষ লইয়া রেলগাড়ীর একটি কামরায় ভ্রমণের দুর্ভাগ্য যেন জীবনে না আসে, সেদিন এর চেয়ে বড় প্রার্থনা আমার ছিল না।

এই শ্রেণীর লোক দেখিলেই আমরা সাধারণতঃ বলিয়া থাকি, লোকটার মাথায় ছিট আছে। একটা ভাব কোনক্রমে ইহাদের মগজে ঢুকিয়া সমস্ত চিন্তা ও বুদ্ধিকে এমন ভাবে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে যে ইহাদের কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞান থাকে না। ফলে লোকে ইহাদের দেখিলেই পাশ কাটাইয়া যাইবার চেষ্টা করে। একই কথা একই ভাবে যে বারম্বার বলে, তাহার কথায় লোকের কৌতূহল থাকে না। কিন্তু ইহাদের সে খেয়াল নাই। ইহারা ভাবকে চালিত করে না, ভাবের দ্বারা চালিত হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ কলিকাতার সাংবাদিক মহলে সুপরিচিত জ—বাবুর নাম বলা যাইতে পারে। রাস্তায় দেখা হইলে যদি শিষ্টাচারের অভ্যাস বশতঃ আপনি বলেন, নমস্কার, কেমন আছেন, তাহা হইলে আর রক্ষা নাই, আপনাকে অন্ততঃ আধঘণ্টা কাল জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে বক্তৃতা শুনিতে হইবে। জাতির বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে এমন সব দামী কথা ঈশ্বরের প্রত্যাদেশের মত তাঁহার কণ্ঠ হইতে বাহির হইয়া আসিবে, যাহা কেবল জ—বাবুর মত নিঃস্বার্থ মানবহিতৈষীর পক্ষেই সম্ভব।

কিন্তু জ—বাবুর একটা ব্যতিক্রম আমি দেখিয়াছিলাম। প্রথম যখন তাঁহার সহিত আমার পরিচয় তখন তিনি যৌবনের উগ্র উৎসাহ লইয়া মদ্যপানের বিরুদ্ধে প্রচারকার্য্য করিতেছেন। প্রতি অপরাহ্নে হেদুয়ার উত্তর দিকে বালক-বালিকা ও পেনসনপ্রাপ্ত বৃদ্ধদের জড় করিয়া জ—বাবু কম্বুকণ্ঠে গর্জ্জন করিয়া বলিতেন: পৃথিবী হইতে সুরা-রাক্ষসীকে বিদায় করিয়া দাও, জীবনের সমস্ত সমস্যা সমাধান হইবে, দুঃখ ও দীর্ঘশ্বাস আর জীবন কলুষিত করিবে না। কিন্তু চিন্তার গতিপথে জলৌকাবৎ জ—বাবু এই ভাব অতিক্রম করিয়া আসিয়াছেন। মানব-দুঃখের প্রতিকারের জন্য সুরার বিলোপ অপেক্ষা সন্তান-বিলোপের কথা বলিতেই তাঁহার দীপ্ত চক্ষে বিশ্বাসের অনল ঝলসিয়া উঠে। পার্কে পার্কে শিশুদের কলকোলাহল

তাঁহার কর্ণে জাতীয় দুর্ভাগ্যের মরণ-সঙ্গীতের মত শত তীক্ষ্ণ সূচীমুখে আঘাত করে। বিবাহ হইয়াছে অনেকদিন অথচ সন্তান হয় নাই, এমন সংবাদ শুনিলে জ—বাবু স্বর্গীয় আনন্দে আপ্লুত হন; বহুসন্তানপরিপূর্ণ সংসারকে তিনি পাপের সিংহদ্বার বলিয়া পরিহার করিয়া চলেন। জার্ম্মানীতে হিটলারের আবির্ভাবের পর আর্য্যরক্তের বিশুদ্ধি রক্ষার জন্য সেখানকার বৈজ্ঞানিকেরা নাকি এমন একটা দাওয়াই আবিষ্কার করিয়াছেন যাহাতে নরনারী খোজা না হইয়াও বাজা হইয়া যাইবে—এই সংবাদ পাওয়ার পর হইতে জ—বাবু কল্পনা করিতেছেন, এদেশের পাপিষ্ঠদের আইন দ্বারা বাজা করিতে বাধ্য না করিলে ছয় কোটি বাঙ্গালীর অন্ন-সমস্যা সমাধানের উপায় নাই। জ—বাবু হিটলারকে অবতার বলিয়া মনে করেন, ইহা বলাই বাহুল্য।

জ—বাবুর এক-ভাবুকতা ভাল কি মন্দ তাহা আমার বিচার্য্য বিষয় নহে। মানুষ একটা ভাব লইয়া মাতিয়া উঠিলে কি দাঁড়ায় তাহার দৃষ্টান্ত স্বরূপই জ—বাবুর কথা উল্লেখ করিলাম। একটা ভাব ভালও হইতে পারে, মন্দও হইতে পারে। কিন্তু সমস্ত চিন্তা একটি ভাবের পশ্চাতে সমগ্র ভাবে নিয়োজিত করা মানসিক স্বাভাবিক স্বাস্থ্যের লক্ষণ নহে। যাঁহাদের মন বহুমুখী, বিভিন্ন বিষয়ে যাঁহাদের মতবাদের দৃঢ়তা আছে, যাঁহারা নিজেকে সংযত করিতে জানেন এবং ক্ষেত্রবিশেষে অনুকূল প্রতিবেশে নিজের চিন্তার ঐশ্বর্য্যকে বিস্তার করিতে পারেন এবং "বেনাবনে মুক্তা না ছড়াইয়া" আত্মসম্বরণ করিতে পারেন, সেইসব মানুষকেই আমাদের ভাল লাগে। তাঁহারা বৈচিত্র্যহীন একঘেয়ে নহেন, তাঁহাদের মনের প্রসারিত প্রান্তরের রূপ ও বর্ণের সমারোহ আমাদের মুগ্ধ করে। একটি-ভাবের দাস হইব, এমন দুর্ভাগ্য যেন আমাদের কখনও না হয়। দশটা ভাব, দশটা আদর্শ বিচার করিয়া তর্ক করিয়া জীবনের একটা পথ আবিষ্কার করিয়া

লইতে হয় এবং এই পরিবর্ত্তনশীল জগতে কোন স্থায়ী বাসা বাঁধিয়া নিশ্চিন্ত হইবার উপায় নাই। যাহা হউক, কোন বাঁধাধরা ভাব লইয়া পাদ্রী সাজিয়া জগতে বিচরণ করাটা জীবনের শোচনীয় অপচয় বলিয়াই আমি মনে করি।

আমার মনে আছে, একটি সাধুচরিত্র ভদ্রলোক প্রত্যহ অপরাহ্ণে কলেজস্কোয়ারে একটী বেঞ্চের উপর দাঁড়াইয়া প্রায়ই সন্ধ্যায় যুবকগণকে ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধে উপদেশ দিতেন। অধিকাংশই তাঁহার দিকে ফিরিয়া চাহিত না। তিনি সেকালের গ্রাজুয়েট এবং হেডমাষ্টার ছিলেন; গুরুর আদেশে নিষ্কামভাবে মানবজাতির কল্যাণের জন্য ব্রহ্মচর্য্য প্রচার করিতেন। দীর্ঘকাল কেহ তাঁহার কথা শুনে নাই, শুনিল না। যুবকেরা তাঁহাকে উপহাস করিত, বিষয়ীরা তাঁহার মলিন বসন দেখিয়া তাঁহাকে পাগল বলিয়া বিদ্রূপ করিত; কিন্তু মানুষের দুর্ম্মতি ও দুর্ব্বুদ্ধির সমস্ত আঘাতে তিনি ভাঙ্গিয়া পড়িলেও বাণী প্রচার হইতে বিরত হন নাই।

বহুমুখী কর্ম্মধারায় জীবন জটিল—ইহার মধ্যে কেবল একটি মাত্র ভাব লইয়া যে মাতিয়া থাকে, তাহাকে হয় পাগল বলিয়া আমরা উড়াইয়া দেই, নয় ধার্ম্মিক বলিয়া তাহার পূজা করিতে ব্যগ্র হই। ১৯২১-এর জানুয়ারী মাসে শ্রদ্ধানন্দ পার্কে (তখন মৃজাপুর পার্ক) গান্ধীজী ও অন্যান্য নেতাদের অহিংস অসহযোগের বক্তৃতা শুনিয়া ফিরিতেছি। জনারণ্যে চারিদিক ছাইয়া গিয়াছে, ছাত্রগণ ইস্কুল-কলেজ ছাড়িয়া আসিয়াছে—আসন্ন বন্ধন-মুক্তির সে এক অপূর্ব্ব উন্মাদনা! ব্যারিষ্টার সি. আর দাস বিপুল বিত্তোপার্জ্জন ছাড়িয়া দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন রূপে যে বাণী দিলেন তাহাই আলোচনা হইতেছে, এমন সময় পিছন হইতে সেই সাধুচরিত্র ভদ্রলোকটি বলিলেন: সবই শুনলাম, কিন্তু কেউ ব্রহ্মচর্য্যের কথা বললেন না, ব্রহ্মচর্য্য ছাড়া……ইত্যাদি। মনে পড়ে, অত্যন্ত রূঢ় উত্তর দিয়াছিলাম। বেচারা

ভালমানুষ, দেশব্যাপী এতবড় আলোড়নের মধ্যেও তাঁহার মন ঐ একটি ভাবে সমাহিত হইয়া আছে।

অবশ্য একই ভাবের ভাবুক মানুষদের আর এক দিক দিয়াও দেখা যায়। তাঁহারা তো মানুষের ভালোর জন্য যাহা বলিবার বলিতেছেনই, তাঁহাদের পক্ষ হইয়া আমিও দুটি কথা বলিতে পারি। তাঁহাদের ভাবের আবেগ আর যাহাই হউক, স্বার্থলেশহীন; অথচ এ জগতে স্বার্থ ছাড়া উৎসাহ কত বিরল! যে উপাদানে আদর্শের জন্য আত্মবলিদানকারী তৈয়ারী হয়, সেই উপাদান ইঁহাদের মধ্যেও আছে। ইঁহারা যে ভাবের জন্য কেবল মরিতে পারেন তাহা নহে; তাহাপেক্ষা অধিক দুঃখ সহ্য করেন, যখন পায়ের জুতা খুলিবার যোগ্য নহে এমন লোকও কটুবাক্যে ইহাদিগকে অপমান করে। এই অন্ধকারময় জগতে জীবনের অপরিমেয় আবেগই ভাবের দীপশিখা জ্বালাইয়া আলোক বিকীর্ণ করে। ভাবুক বা আদর্শবাদী না থাকিলে মানুষের নৈতিক জীবন এবং সাধারণ জীবনযাত্রা বিকৃত ও বিস্বাদ হইয়া যাইত। ইহাদের অনন্যনির্ভর লক্ষ্যের আমি প্রশংসা করি। ইহাদের নিঃস্বার্থ পরহিতৈষণার সহিত তুলনা করিয়া নিজে লজ্জিত হই। কিন্তু তৎসত্ত্বেও আমি এইরূপ একজন ব্যক্তির সহিত আর এলাহাবাদ যাইতে রাজী নহি। তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় দাঁড়াইয়া অথবা পার্শ্বেলের গাদার মধ্যে বসিয়া যাইতেও আমি রাজী, কিন্তু "ভিটামিনের" সহিত দ্বিতীয় শ্রেণীর আরাম······

২৬শে মার্চ্চ, ১৯৪৩

এ, আর, পি

উত্তর কলিকাতার ঘোড়াবাগানের চৌধুরীরা বনিয়াদী বংশ। অর্থাৎ জন কোম্পানীর আমলে রামধন সরকার কলিকাতায় আসিয়া; সামান্ত গোমস্তাগিরি হইতে সাহেব কোম্পানীর মুচ্ছুদীগিরি এবং বেনামী ব্যবসায় করিয়া অনেক টাকা রোজগার করিয়া বনিয়াদ পত্তন করেন। এই বনিয়াদের উপর তস্তপুত্র শ্যামধন চৌধুরী যখন সবেমাত্র বসিয়াছেন, এমন সময় বাধিয়া উঠিল মিউটিনি—নানাগুজবে কলিকাতার ধনীমহলে আতঙ্কের স্থষ্টি হইল। ঠিক আজিকার মতই পল্লীভবনে পালাইবার পালা আসিল, শ্যামধন জলের দামে কোম্পানীর কাগজ ও নোট কিনিয়া ফাঁপিয়া উঠিলেন। এই স্থযোগে এক সাহেব ব্যাঙ্কারকে ঘায়েল করিয়া পিতার বনিয়াদের তিনি ওপর লক্ষ্মীর মন্দির গড়িয়া তুলিলেন; অর্থের পরেই যশ। বার মাসে তের পার্ব্বণ, ব্রাহ্মণ ভোজন ও ভাল দক্ষিণা—সহরে ধন্য ধন্য পড়িয়া গেল। শ্যামধনের বাগানবাড়ীতে এক এক দিন বাই-খেমটা নাচের আসর বসিত; দিশী বাবু এবং সওদাগরী আপিসের এলেন, ডিলন প্রভৃতি সাহেবেরা প্রচুর বিলাতী মদ্যপান করিয়া শ্যামধনকে কৃতার্থ করিতেন। ক্রমে সরকারী মহলে শ্যামধনের খ্যাতি ছড়াইয়া পড়িল। থানা ও চাঁদা দিয়া রাজা উপাধিপ্রাপ্ত শ্যামধন কলিকাতার ধনীসমাজের চূড়ামণি হইয়া উঠিলেন। তস্য পুত্র কুমার হরিধন কোম্পানীর কাগজের সাড়ে তিন পার্সেণ্ট স্থদ ও বাড়ীভাড়ার টাকা গোনা ছাড়া বিশেষ কিছু করিতে না পারিলেও, পাঁচ পুত্র ও পাঁচ কন্যার জন্ম দিয়া চৌধুরী বংশের মর্য্যাদা বাড়াইলেন। অর্থাৎ কলিকাতার আর দশটা ঐ শ্রেণীর বনিয়াদী

বংশের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া আভিজাত্যের ভিত্তি পাকা করিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর পাঁচ ভাই পৃথক হইয়া "ঘোড়াবাগান রাজবাটি"তে নানাস্থানে খাপছাড়া দেয়াল তুলিয়া, জানালা বন্ধ করিয়া এক বিচিত্র গোলকধাঁধার সৃষ্টি করিলেন। সম্পত্তি ভাগ হইয়া গেলেও প্রত্যেকের সুখ স্বচ্ছন্দে কাটাইবার বিত্তের অভাব হইল না। এই বংশের ধারায় মেজবাবু হারাধন চৌধুরী পিতামহের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া গণ্য মান্য হইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

ইংরাজ রাজত্বের সুশীতল ছায়ায় ধনী-সমাজের জীবন যাত্রা প্রণালীর বাধা রাস্তায় হারাধন এণ্ট্রাস ক্লাস পর্য্যন্ত পড়িয়া, সংসার ধর্ম্মে মন দিলেন। কিন্তু মন বসিল না। বাবু-ধর্ম্মের ডাকে বিশেষ পল্লীতে বিশেষ পানীয় পান করিয়া মাঝে মাঝে বেসামাল হইতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুকাল পরেই, হয় গৃহিনীর গুণে নয় নিজের চেষ্টায় কিছুটা সামলাইয়া লইয়া সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভের দিকে মন দিলেন। কয়েকটি ক্লাবের ও বণিক সমিতির সদস্য হইয়া চাপার্টি ও খানাপিনা মারফৎ মিঃ এইচ চৌধুরী ক্রমে গণ্যমান্য হইয়া উঠিলেন। চোগা চাপকান, মোটা সোনার চেন ঠাকুর-ক্যাপ ছাড়িয়া মিঃ চৌধুরী বিলাতী সুট ধরিলেন। লালদিঘীর দপ্তরখানার ছোট ও মেজ সাহেবদের তোষামোদী করিয়া হারাধন যেদিন অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট হইলেন; সেদিন পাড়ায় তাঁহার প্রতিপত্তি বাড়িয়া গেল। ক্লাব, লাইব্রেরীর পৃষ্ঠপোষক এবং স্কুলের পুরস্কার বিতরণী সভার সভাপতি, মোহনবাগান ক্লাবের কার্য্যকরী সমিতির সদস্য মিঃ চৌধুরীকে "দীনজন সেবক"রূপে কলিকাতা কর্পোরেশনে পাঠাইবার জন্য ঘোড়াবাগান ড্রামেটিক ক্লাব কোমর বাঁধিল। লুব্ধ হারাধন অনেক টাকার শ্রাদ্ধ করিয়াও কিছু করিতে পারিলেন না। তিনি আবার "জনসেবা", ছাড়িয়া 'সাহেব সেবার' দিকে ঝুঁকিলেন। তাঁহার শশুরকূলে একজন 'স্যর. ও

গুটিকয়েক 'রায় বাহাদুর' আছেন। একটি রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াও চৌধুরী রায় বাহাদুর পর্য্যন্ত হইতে পারিলেন না। ইহাতে চৌধুরী-গিন্নীর ক্ষোভের অন্ত ছিল না।

মিঃ চৌধুরী আশায় আশায় দিন গণিতেছেন এমন সময় সুযোগ আসিল। ইয়োরোপে বাধিয়া উঠিল মহাযুদ্ধ। রাজভক্তদের ডাক পড়িল। চৌধুরী আসিলেন আগাইয়া। ইংরাজ বাহাদুরের জয় কামনা করিয়া তিনি কালীঘাটে ঘটা করিয়া এক মারণ যজ্ঞ করিলেন। পট্টবস্ত্র পরিহিত চৌধুরী "জার্ম্মান্ নিধনং স্বাহা" বলিয়া হোমকুণ্ডে আহুতি দিতেছেন, এমন একটা ছবি দৈনিক সংবাদ পত্রগুলিতে প্রকাশিত হইল। উত্তর কলিকাতার পুলিশের বড় কর্ত্তা চৌধুরীকে ডাকিয়া লইয়া আপ্যায়িত করিলেন। তাঁহার বুক ফুলিয়া উঠিল, এইবার "রায়বাহাদুরী" মারে কে? ১৯৪১ এর সুরুতেই কর্ত্তৃপক্ষের অনুমোদন লইয়া, ঘোড়াবাগান ড্রামেটিক ক্লাবের যোগাযোগে; এ, আর, পি কমিটি গঠন করিয়া ফেলিলেন এবং নিজে হইলেন কর্ত্তা। সাহেব বাড়ী হইতে খাকীর জঙ্গী পোষাক তৈয়ার করিয়া চৌধুরী প্যারড্ সুরু করিলেন, সরকারী মহলে ধন্য ধন্য পড়িয়া গেল। এ, আর, পি তে মিঃ চৌধুরী "পাইওনীর।" একদিন সত্য সত্যই ঘোড়াবাগানের মাঠে এ, আর, পির কর্ত্তাদের লইয়া স্বয়ং গভর্ণর সহাস্য অনুগ্রহে চৌধুরীর করমর্দ্দন করিলেন তখন চৌধুরীর শিরদাঁড়ায় কূলকুণ্ডলিনী শক্তি শির শির করিয়া উঠিল;—লাঙ্গুলহীন চৌধুরী মাজা দুলাইয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন। ব্যাপার মিটিয়া গেলে, আহ্লাদে নাচিতে নাচিতে চৌধুরী বাড়ীতে আসিয়া স্ত্রীর নিকট বীরত্বের খ্যাতি সবিস্তার করিয়া বলিলেন, "রায়বাহাদুর তুচ্ছ, রাজাবাহাদুরও হতে পারি। স্বামী সৌভাগ্য গর্ব্বিতা চৌধুরী গিন্নী কৃত্রিম আশঙ্কায় বিগলিত হইয়া বলিলেন, "সবই

তো বুঝলাম, কিন্তু ওরা যদি তোমাকে যুদ্ধে ধরে নিয়ে যায়?" চৌধুরী হাসিয়া বলিলেন, "আরে ধ্যেৎ, আমরা হলাম, এ, আর, পি! আমাদের কোথাও যেতে হবে না। কলকাতায় যদি জার্ম্মানরা বোমা ফেলে, তা'হলে এ, আর, পির দল সেই সময় করবে লোককে রক্ষা তবে তার আর দরকার হবে না। সেবারের মত এবারও যুদ্ধ ইয়োরোপেই খতম হবে। ফাঁকতালে আমার কাজ হাসিল হয়ে যাবে।"

মিষ্টার চৌধুরী মহোৎসাহে উত্তর কলিকাতার এ, আর, পি গঠন করিতে লাগিলেন। প্রত্যহ যথা নিয়মে ঘাঁটিতে গিয়া এ, আর, পির কর্ত্তব্য সম্বন্ধে ইস্তাহার পাঠ ও রক্ষীদলের কুচকাওয়াজের তদারক করিতে লাগিলেন। আশায় থাকিলেন, সম্রাটের জন্মদিনে অথবা নব বর্ষের উপাধি তালিকায় তাঁহার নাম প্রকাশিত না হইয়া যায় না। মাঝে মাঝে চৌধুরী একটু বেসামাল হইয়া অধিক রাত্রিতে বাড়ী ফিরলে চৌধুরী গিন্নী সানুনাসিক গঞ্জনা দিতে থাকেন, চৌধুরী প্রবোধ দিয়া বলেন, "সাহেব সুবোদের সঙ্গে মিশতে গেলে এমন এক আধটু হয়। বড় মহলে উপরের দিকে উঠ্‌তে হ'লে এই জলপথই হ'ল প্রশস্ত।" চৌধুরীর ধর্ম্মপত্নী নিরুত্তর হইয়া যান।

চলিতেছিল ভালই, এমন সময় জাপান দিল পূর্ব্বদ্বারে হানা। সিঙ্গাপুর গিলিয়া বন জঙ্গল ভাঙ্গিয়া জাপান বর্ম্মা মুল্লুকে প্রবেশ করিয়াছে। জাপানী আসিবে পরে, কিন্তু বোমা যে কোন মুহূর্ত্তে আসিতে পারে। কলিকাতায় পালাও পালাও রব উঠিল। 'ইভাকুয়েশন' 'ইভাকুয়েশান' শব্দে সহর পল্লী মুখরিত হইয়া উঠিল। চৌধুরী বংশের অন্যান্য সরিক সপরিবারে হাজারীবাগে পলাইয়া গেলেন। মিষ্টার এইচ, চৌধুরীর পালাইবার উপায় নাই। ঘোড়াবাগানের এ, আর, পি দলের তৎপরতা আরও বাড়িয়া গিয়াছে। দুই বেলা কুচকাওয়াজ ও পরামর্শ

সভা করিতে হয়, ধাঁটিতে ঘাঁটিতে ছুটাছুটি করিতে হয়। পলাইলে বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ সবই নষ্ট হইবে। হয়তো ওয়ারেণ্ট জারী করিয়া ধরিয়াও আনিতে পারে। "এসেন্সিয়াল সার্ভিস্" হায় আগে জানিলে······।

প্রকাণ্ড বাড়ী রাত্রে খাঁ খাঁ করে। স্বল্প দীপ অন্ধকারে দীর্ঘ ছায়াগুলি ভূতের মত হাত বাড়াইয়া যেন টুটি চাপিয়া ধরিতে চায়। ডিসেম্বরের শীতেও চৌধুরী দুঃস্বপ্ন দেখিয়া ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে জাগিয়া উঠেন। গিন্নীর হাত চাপিয়া ধরিয়া বলেন, "আমার কপালে যা হোক হবে, তুমি কালই হাজারীবাগ যাও।" পতিপ্রাণা সতী স্বামীর টাকে হাত বুলাইতে বুলাইতে সোহাগ বিগলিত কণ্ঠে বলেন, "আমি গেলে তোমার নাওয়া খাওয়া দেখবে কে?" কথা কাটাকাটি চলিতে থাকে। চৌধুরী মরিয়া হইয়া বলেন, "আর ভাবতে পারিনে বাবা, এই সব সেকেলে মেয়েকে বোঝান ঝকমারী। এদিকে যে অবস্থা—" চৌধুরীর মুখের উপর হাত নাড়িয়া গিন্নী ঝঙ্কার দিয়া উঠিয়া বসিলেন! চৌধুরী নরম হইয়া বলেন, "আমার জন্যে ভাবি না, তোমার ভালর জন্যই"—আবাল্য স্বামীর চরিত্রে সন্দিগ্ধা সতী রুখিয়া বলেন, "আমি যাই, আর তুমি শাকচুন্নী পেত্নী নিয়ে"—ইত্যাদি। তারপর দাম্পত্য জীবনে পরস্পরের অতীত জীবনের টুক্‌রা টুক্‌রা ঘটনা লইয়া যে সকল কথা হয়, তাহার বর্ণনা পাঠ করা অপেক্ষা অনুমান করা ভাল।

এক দিকে স্ত্রীর সহিত কলহ, অন্যদিকে হিতৈষীদের সতর্ক বাণী, "করছেন কি মশাই, এখনও গেলেন না?" শুনিতে শুনিতে চৌধুরীর পাগল হইবার উপক্রম। একদিন সকালে আয়নায় মুখ দেখিয়া চৌধুরী শিহরিয়া উঠিলেন। নাকের দু পাশ হইতে চোয়াল পর্য্যন্ত কুঞ্চিত রেখা নামিয়া গাল তোবড়াইয়া গিয়াছে। দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া চৌধুরী সোফায় বসিয়া পড়েন। ক্লান্ত হস্তে খবরের কাগজখানা কোলের উপর প্রসারিত

করেন। রেঙ্গুণে বোমা পড়া আর এ, আর, পির কাণ্ড কারখানার সংবাদগুলা পড়িতে পড়িতে চৌধুরীর প্লীহা ও যকৃত পেটের মধ্যে স্থান পরিবর্ত্তনের চেষ্টা করে, ছত্রিশ হাত নাড়ী মোচড় দিয়া বুকের মধ্যে হাতুড়ী পিটিতে থাকে। তবুও উপায় নাই, উর্দ্দী পরিয়া এ, আর, পি মহলে যাইতে হয়, কাষ্ঠ হাসি হাসিয়া সাহেব সুবাদের সঙ্গে আলাপ করিতে হয়। মনের জ্বালায় জ্বলিতে জ্বলিতে চৌধুরী শুকাইয়া উঠিয়াছেন। রায়বাহাদুরীর লোভে এমন বেঘোরে মারা পড়িবার বেকুবীর জন্য তিনি নিজেকেই নিজের মনের মধ্যে চাবুক মারিতে থাকেন।

জানুয়ারী মাসে চৌধুরী মরিয়া হইয়া উঠিলেন। এক ঠিকাদার কোম্পানীর সহিত ব্যবস্থা করিয়া বাড়ীর মধ্যে গর্ত্ত খুঁড়িয়া নিরাপদ 'সেল্টার' তৈয়ারীর ব্যবস্থা করিলেন। গিন্নী বলেন, এ আবার হচ্ছে কি? পাড়ার লোক ভাববে আমরা গর্ত্ত খুঁড়ে টাকাকড়ি গয়নাগাঠি মাটিতে পুত্ছি। শেষ কালে ডাকাত পড়ুক। এ, আর পির কর্ত্তা বিমান আক্রমণের নিরাপদ আশ্রয় স্থল সম্বন্ধে লাটসাহেবের বাড়ী হইতে লাহা, মল্লিক, সেন, বোসেদের বাড়ীতে কি হইয়াছে তাহা সবিস্তারে বর্ণনা করিয়া বলিলেন, "ওখানে বসবাস করতে হবে না, সাইরেন বাজ্লে ওখানে থাকাই নিরাপদ।" অতি কষ্টে গিন্নীকে বাগ মানাইয়া, চৌধুরী ললাটের ঘর্ম্ম মুছিলেন।

তবু, তবুও শান্তি নাই। প্রতিদিন সংবাদ আসিতেছে, সিঙ্গাপুর যায় যায়, রেঙ্গুন, পেগু, মৌলমেনে বোমাবর্ষণ, ভেড়ার পালে জাপানী বাঘ আসিয়া পড়িল বলিয়া। হাবড়া ও শিয়ালদহে পলায়মান জনতার ভীড়, নারীর আর্ত্তনাদ শিশুর ক্রন্দন। সহর ছাড়িয়া সকলেই চলিয়াছে, কেবল চৌধুরী নিরুপায়। এমন দুর্ভাগ্য একটা কঠিন রোগও হয় না যে ডাক্তারের সার্টিফিকেট দেখাইয়া কলিকাতা ছাড়া যায়। কিন্তু

তাহাও কিছু হয় না। এদিকে নির্ব্বোধ অবুঝ গিন্নী ফুলগাছের আলোক-লতার মত চৌধুরীকে পাকে পাকে জড়াইয়া নির্ব্বিকার চিত্তে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন। নির্ব্বোধের ভয় নাই। ভয়ে হাত পা ঝিম ঝিম করে, মুখ শুকাইয়া উঠে, তবুও এ, আর, পির সেজ কর্ত্তা মিঃ হারাধন চৌধুরীকে সহরের বাসিন্দাদের মনোবল রক্ষার জন্য পরামর্শ দিতে হয়, কর্ম্মীদের সাহস ও উৎসাহ দিতে হয় এবং বনিয়াদী চৌধুরী বংশের বীর হারাধন চৌধুরীর সাহস ও শৌর্য্যে গুণমুগ্ধ বড় সাহেবেরা নিশ্চিন্ত। রায়বাহাদুর খেতাব পাইতে আর কত বিলম্ব!

৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪২

মধ্যবিত্তের দুশ্চিন্তা

(১)

ডেপুটি গজানন্দ, রায়বাহাদুরী খেতাব ও পেন্সন লইয়া যখন অবসর গ্রহণ করিলেন তখন তাঁহার বালীগঞ্জের বাড়ী তৈয়ার শেষ হইয়াছে। গজানন্দের সংসার ছোট নহে, তিন পুত্র চারি কন্যা। ইহাদের লালন শিক্ষাদি ব্যাপারে অনেক টাকা খরচ হইয়াছে, চাকুরী জীবনে সাধারণ মধ্যবিত্তের মতই আত্মীয়স্বজনকেও মাঝে মাঝে সাহায্য করিতে হইয়াছে। তেলাপোকা পক্ষী না হইলেও উড়িতে পারে, ডেপুটি সিভিলিয়ন না হইলেও হাকিম। এই হাকিমী মর্য্যাদার জন্য অনেক 'অপব্যয়' করিতে হইয়াছে। কিন্তু সরকারী চাকুরীর মহিমা এই, বিশেষ যোগ্যতা কুশলতা না থাকিলেও বেতন যথা নিয়মে বাড়িয়া যায় এবং ক্রমে হরেক রকম উপার্জ্জনের ফিকির ফন্দীর সন্ধান পাওয়া যায়। এই পথেই গজানন্দ নগদে ও কোম্পানীর কাগজে মোটা টাকা করিয়াছেন। কুলোকে বলে, গজানন্দ "সেটেলমেণ্টে" ঢুকিয়া অনেক টাকা ঘুষ খাইয়াছেন ও মফঃস্বলের ক্যাম্পে, পাঠা হাঁস, মুরগী ভেট পাইলে, চাপরাশী মারফৎ হাটে বেচিয়া দিতেন, এমনই ছিলেন কঞ্জুস। গজানন্দ বলেন, টাকা উপার্জ্জন করা সহজ রাখা কঠিন বাড়ানো আরও সুকঠিন। সেই সুকঠিন পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

লোকে পরোক্ষে নিন্দাই করুক আর অসাক্ষাতে বিদ্রুপই করুক, টাকা আছে এটা অখ্যাতি নয় খ্যাতি। এই খ্যাতির জোরে বালীগঞ্জ

সমাজের উপরের দিকের বৈঠকখানায় তাঁহার সম্মানের আসন সংখ্যা বাড়িতে লাগিল। ডেপুটিত্বের অভিমান এবং অভ্যস্ত হাকিমী মেজাজ তাঁহাকে এমন একটা আত্মমর্য্যাদা জ্ঞান দিয়াছে যে, তিনি অপরের বাড়ীর আয়তন উচ্চতা ও আসবাব না দেখিয়া ঘনিষ্ঠতা করেন না। পুত্র কন্যাদের "বড় ঘরে" বিবাহ দিয়া নিশ্চিন্ত হইবার আশায় এমন মেলামেশার সুবিধা আছে। গজানন্দ ও গৃহিণী একটু সেকেলে হইলেও, সিভিলিয়ন বা সমপর্য্যায়ের সরকারী চাকুরীয়া পাত্র ধরিবার জন্য গৃহে একাল আমদানী করিয়াছেন। মেয়েরা কলেজে পড়ে, পিয়ানো বাজায় রেডিও শোনে, হার্ম্মোনিয়ম বাজাইয়া অধুনিক গান গায়। ছোট দুটি আবার ওরিয়েণ্টাল নৃত্য শিখিতেছে। মেয়েরা দাদাদের সতীর্থদের সঙ্গে সিনেমায় যায়, পিকনিক করে; পছন্দ না হইলেও গজানন্দ ইহা বরদাস্ত করেন। যে কালের যা উপায় নাই।

কিন্তু গজানন্দ মনে মনে একালের ছেলেদের দু'চক্ষে দেখিতে পারেন না। মফঃস্বলে থাকিতে তিনি শুনিতেন কলিকাতায় "তরুণ" নামক একশ্রেণীর যুবকের আবির্ভাব হইয়াছে, যাহাদের চালচুলা নাই, ফ্যাসন করিয়া লোটন পায়রার মত ধূতি পরে, রবি ঠাকুরের কবিতা আওড়ায়, রাজনৈতিক সভায় হাততালি দেয়, সাহিত্য ও আর্টের আবরণে আদিরসের আলোচনা করে, আর ঐ আর্টের বুলি আওড়াইয়া মেয়েদের সঙ্গে প্রেম করিবার চেষ্টা করে। তাই কলিকাতায় আসিয়া তিনি সর্ব্বদাই হুঁসিয়ার থাকেন। পশ্চিম অঞ্চলের কৃষকেরা যেমন ক্ষেতে টোম বাঁধিয়া টিয়াপাখী তাড়ায়, তিনিও তেমনি দোতালার ঘরে বসিয়াই একতলার তরুণদের তাড়াইবার চেষ্টা করিতেন। কিন্তু সব তরুণ সমান নয়। হাপ সার্ট ও কাবুলী স্যাণ্ডেল চক্রব্যূহ ভেদের কৌশল জানে। কয়েকজন গজানন্দ গৃহিনীকে মাসিমা বলিয়া, ফাই-ফরমাইস খাটিয়া এবং মেয়েদের প্যাটার্ণ

মাফিক বুনানির সুতা মিউনিসিপ্যাল মার্কেট চষিয়া কিনিয়া দিয়া একটু স্থায়ী আসন করিয়া লইয়াছে। কন্যাগণ এবং এই সকল নাছোড়-বান্দাদের মধ্যে ব্যবধান রাখিবার জন্য গজানন্দ প্রায়ই নীচের বৈঠকখানায় আসিয়া বসেন। তাঁহাকে পাইলেই তরুণেরা সুভাষ বোস, জওহরলালের প্রসঙ্গ তুলিয়া কংগ্রেস, সোশ্যালিজম, কার্ল মার্কস, লেনিন লইয়া আলোচনায় মুখর হইয়া উঠে। সুবিজ্ঞ গজানন্দ মুচকী হাসিয়া বলিতেন,—"যাই বল বাপু, ইংরাজের মত জাত হয় না, ইংরাজ এদেশে এসেছিল তাই তোমরা মানুষ হয়েছ। ওদের তুল্য কেউ নয়। বড় বড় সিভিলিয়নের সঙ্গে চাকরী করে এসেছি। হ্যাঁ তারা মানুষ বটে। যেন চর্ব্বি দিয়ে মাজা শঙ্কর মাছের লেজের চাবুক—কাছে গেলেই সমীহ করে চলতে হয়। তা না হলে আর ভগবান দয়া করে এত বড় সাম্রাজ্যটা দিয়েছেন।"

গজানন্দের অচলা বৃটিশ-ভক্তি, তরুণেরা তো ছার, স্বয়ং হিটলার টলাইতে পারেন নাই। তরুণেরা তর্ক করে আর চার চারটি যুবতী কন্যার পিতা বলিয়া সমবেদনার সুরে মন্তব্য করে—"উনি বড়ই সেকেলে।" কেহবা মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া বলিয়া উঠে, "রাজনৈতিক ব্যাপারে ওঁর মত গোঁড়া হলেও সামাজিক ব্যাপারে ওঁর মত বড় উদার।" কথা বলিতে বলিতে তরুণটি হয়তো কোন তরুণীর মুখে সকৃতজ্ঞ সমর্থনের উৎসুক দীপ্তি খোঁজে।

এমনিভাবে দিন যায়। অকস্মাৎ বিনামেঘে বজ্রগর্জনের মত ইয়োরোপে বাধিয়া উঠিল লড়াই। ইংরাজ পড়িল জড়াইয়া। পোলাণ্ড গেল, ফ্রান্স গেল, ডানকার্ক হইতে নাজেহাল ইংরাজ সৈন্য ফিরিল, হিটলার ইয়োরোপময় দাপাদাপি করিয়া ঝাপাইয়া পড়িলেন রুশিয়ার উপর। গজানন্দ খবরের কাগজ পড়েন, আর ফিক্ ফিক্ করিয়া হাসেন,

সোনার দর চড়িতেছে দেখিয়া পুলকিত হন, কোম্পানীর কাগজের দাম ঠিক আছে দেখিয়া নিশ্চিন্ত হন। এইভাবেই চলিতেছিল—এমন সময় আর এক অঘটন ঘটিল,—জাপানের মালয় আক্রমণ, রেঙ্গুনে বোমাপতন এবং সঙ্গে সঙ্গে ধনী প্রতিবেশীদের পলায়ন,—এই তিনে মিলিয়া গজানন্দের ডেপুটিত্বের মহিমা ধূলিসাৎ করিয়া দিল। সাধারণ গৃহস্থেরা কি ভাবে, কি বলাবলি করে, লোকের কি অবস্থা হইবে, এই সকল খুঁটিনাটি সংবাদের জন্য তিনি অত্যন্ত কৌতুহলী হইয়া উঠিলেন। চারিপাশের গরীব ভদ্রলোকদের সংশ্রব যিনি সাবধানে এড়াইয়া চলিয়াছেন, কেহ উৎসুক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে পাছে আলাপ করিয়া বসে এই ভয়ে ছাতা আড়াল দিয়া মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন, আজ সেই গজানন্দ গায়ে পড়িয়া কেরাণী, উকীল, ইস্কুল মাষ্টারদের সঙ্গে আলাপ করেন, সন্ধ্যায় রেডিয়ো শুনিবার জন্য আমন্ত্রণ করেন। ইহাদের সহিত একত্র বসিয়া কম্পান্বিত কলেবরে জাপানী বক্তৃতা শোনেন। যাহাদের সহিত একাসনে বসার কথা গজানন্দ কল্পনাও করিতে পারিতেন না, আজ তাহাদিগকে চা-সিগারেট্ দিয়া আপ্যায়িত করেন।

গজানন্দ একেবারেই বদলাইয়া গিয়াছেন। যুদ্ধ ও জাপানী বোমা ছাড়া তাঁহার আলোচনার আর কিছুই নাই। তাঁহার বৈঠকখানায় বিভিন্ন বয়সের পত্নীবিরহীদের অশ্রান্ত গমনাগমন ও আড্ডা সুরু হইয়াছে। মেয়েরা ড্রয়িংরুম ছাড়িয়া পাশের একটা ছোট ঘরে আশ্রয় লইল, গৃহিনী পল্লীভবনে যাইবার জন্য ব্যাকুলা হইলেন। সুবিজ্ঞ গজানন্দ মাথা নাড়িয়া বলেন,—"তিরিশ বছর ইংরাজের সঙ্গে ঘর করছি, অত সহজ নয় গিন্নী, এই আড়াই বছরে অতবড় জার্ম্মান ইংরাজের এক ইঞ্চি জমী নিতে পারেনি,—ওকি জাপানীর কর্ম্ম।

লোকে না বুঝেই পালাচ্ছে। দুদিন পরেই সুড় সুড় করে ফিরে আসবে দেখে নিয়ো"। বাহিরে বৈঠকখানায় বলেন,—"ইংরাজের কৌশল জাপানীরা কি বুঝবে! তোমরা যা বল্‌ছো বিলকুল গলতি কথা। জাপানীরা এগুচ্ছে ঠিক, কিন্তু আসলে ইন্দুর এগুচ্ছেন জাঁতি-কলের দিকে, সিঙ্গাপুর হ'ল সেই কল। একটি খ্যাঁদা বাছাকেও আর দেশে ফিরে যেতে হবে না"। গজানন্দকে তর্কে হারাইবার জো নাই। তিনি কালীঘাটের বিখ্যাত জ্যোতিষীকে দিয়া চার্চ্চিল-রুজভেল্ট এমনকি বড়লাট ছোটলাটদের কুষ্টি বিচার করিয়া নিশ্চিন্ত আছেন।

একদিন সকালবেলা খবরের কাগজে বড় বড় হরপগুলি দেখিয়া গজানন্দ বিস্ফারিত নেত্রে স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। পড়িতে শিরদাঁড়া শির শির করিয়া উঠিল, কাল হরপগুলি আগুনের ফুলকির মত চক্ষুর সম্মুখে নাচিতে লাগিল। দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া গজানন্দ গুম হইয়া রহিলেন। দেখিতে দেখিতে বৈঠকখানায় লোক সমাগম, সকলের মুখে এককথা, সিঙ্গাপুর গেল, এখন উপায়! ততক্ষণে গজানন্দ সামলাইয়া লইয়াছেন, কাষ্ঠহাসি হাসিয়া গজানন্দ বলেন, "হুঁ, চার্চ্চিলের বক্তৃতা পড়েছো? কেউটে সাপের জাত বাবা। সহজে ফণা নামাবে না।" কিন্তু আজ গজানন্দের মনের জোর নাই—সমগ্র আসাম-বঙ্গের পালাও পালাও রব তাঁহার মগজে হাতুড়ী মারিতে লাগিল। আলোচনা যখন জুমুল, সকলের অলক্ষ্যে গজানন্দ উপরে উঠিয়া গেলেন। জামা পরিয়া ছাতিটা হাতে লইতেই, গৃহিনী জিজ্ঞাসা করলেন, "এখন আবার কোথায় বেরুচ্ছ!" গজানন্দ উদাসভাবে বলিলেন,— "মহাপ্রস্থানের পথের-সন্ধানে—"

ট্রাম ধরিয়া গজানন্দ সোজা লালদিঘীর মোড়ে নামিয়া পড়িলেন। সোৎসুক দৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন, সরকারী দপ্তরখানা ও

জেনারেল পোষ্টাপিসের কাজকর্ম্ম ঠিকই চলিতেছে। ব্যাঙ্কে গিয়া দেখিলেন, লোকে টাকা তুলিবার জন্য ভীড় জমায় নাই, একবার ভাবিলেন, কালই হয়তো ভীড় হইবে, আজ টাকাগুলি তুলিয়া লই। আবার ভাবিলেন, না থাক, দিবে তো কতকগুলো কাগজ। অকারণে ক্লাইভ ষ্ট্রীটে ঘুরিয়া ঘুরিয়া পরিশ্রান্ত গজানন্দ এক পানের দোকানের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। ডেপুটিত্বের অহমিকায় পরিস্ফীত গজানন্দ, ফুটপাতে দাঁড়াইয়া মাটির খুরীতে লেমনেড পান করিতেছেন, এই দৃশ্য ছয় মাস পূর্ব্বে কেহ কল্পনাও করিতে পারিত না। কেবল তাহাই নহে, পানওয়ালার সঙ্গে আলাপ করিয়া, সওদাগরী আপিসগুলির হালচাল জানিতে লাগিলেন। পানওয়ালা চাপরাসী দরোয়ানদের নিকট শোনা কথা, রং ফলাইয়া বলিতে লাগিল। গজানন্দ করুণ হইয়া বলিলেন, "আমাকেই যা বললে, এসব কথা কাউকে বল না, পুলিশের ফ্যাসাদে পড়বে।" পানওয়ালা সচকিত হইয়া বলিল, "ঠিক বোলেছেন, এ সোব কথায় হামার কি কাজ বাবু—।"

সেখান হইতে গজানন্দ এক খবরের কাগজের আপিসে গিয়া উঠিলেন। "কি মশাই খবর কি ?" কর্ম্মব্যস্ত সাংবাদিক মুখ না তুলিয়াই বলিল, 'সে তো কাগজেই দেখতে পাচ্ছেন।' 'সে খবর নয় মশাই, আপনারা যা পান অথচ ছাপাতে পারেন না, সেই সব খবর—' গজানন্দ অর্থপূর্ণ হাস্য করিলেন, ডিমে তা দেওয়া হাসের মত কিছুক্ষণ ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া, সাংবাদিক পুনরায় কাজে মনোনিবেশ করিতেই, গজানন্দ বলিয়া উঠিলেন,—"চেপে যাচ্ছেন কেন ? বলুন না মশাই। বোঝেন তো কাচ্চাবাচ্ছা নিয়ে ঘর করি।" এইবার সাংবাদিক সম্বিৎ ফিরিয়া পাইলেন, হাসিয়া বলিলেন, ওসব খবর সম্পাদকেরা রাখেন।

গজানন্দ কার্ড দিয়া সম্পাদকের সহিত দেখা করিলেন, ভারিক্কী মানুষ দেখিয়া সম্পাদক আদর করিয়া বসাইলেন। সহৃদয় আবহাওয়ার মধ্যে গজানন্দের রসনা বল্গহীন হইল। তাঁহার ত্রিশ বৎসরের চাকুরী জীবনের অভিজ্ঞতা ও সিভিলিয়ান ইংরাজ-চরিত্রের মহিমা শুনিতে শুনিতে সম্পাদক বিব্রত হইয়া পড়িলেন। তারপর উঠিল যুদ্ধের কথা। আধঘণ্টা পর আলোচনা সিঙ্গাপুরের পতনে আসিয়া ঠেকিল। এইবার অন্তরঙ্গ হইয়া গজানন্দ প্রশ্ন করিলেন,—"আপনি কি মনে করেন, কলকাতায় শীগগিরই বোমা পড়বে"? প্রাচ্যের প্রধানতম জ্ঞানীপুরুষের মত মাথা নাড়িয়া সম্পাদক বলিলেন, "এপ্রিলের আগে সে সম্ভাবনা দেখছি না, তবে আগেভাগে সাবধান থাকাই তো উচিত।" গজানন্দ আরও ঘনিষ্ঠ হইয়া প্রশ্ন করেন, "ইণ্ডিয়া না অষ্ট্রেলিয়া?" রণনীতিজ্ঞ সম্পাদক প্রত্যয়সিদ্ধ কণ্ঠে বর্ত্তমান যুগের রণকৌশলের সহিত রেঙ্গুন, বাটাভিয়া, আমেরিকান নেভী, জাপ-বিমান বহরের জটিল সমস্যা ব্যক্ত করিতেছেন,—এমন সময় খাপছাড়াভাবে গজানন্দ জিজ্ঞাসা করলেন—, "আচ্ছা ব্যাঙ্কগুলোর কি হবে!" সম্পাদকের হুস হইল, এত খোলাখুলি ভাবে কথা বলা ঠিক হয় নাই। বুড়া ডেপুটি হয়তো আই বি'র স্পাই। ভারতরক্ষা আইন স্মরণ করিয়া সম্পাদক মুদ্রিত নেত্রে মৌন হইলেন। গজানন্দ আবার হাইকোর্ট পাড়ায় ফিরিয়া আসিলেন। ঝানু এটর্ণী বন্ধুর সহিত বিষয় সম্পত্তি, কোম্পানীর কাগজ, ব্যাঙ্কের টাকা প্রভৃতির নিরাপত্তা লইয়া অনেক আলোচনা করিলেন। না, ভরসার কিছুই নাই, একটা সর্ব্বজনীন সর্ব্বনাশের বিভীষিকা তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল।

রজনী গভীর। পার্শ্বে অনিদ্রিতা গৃহিনীকে ঠেলা মারিয়া গজানন্দ বলিলেন, "শুন্‌ছো?" গৃহিনী জড়িতস্বরে বলিলেন, 'বল'।

"বোল্‌বো বা কি! ষ্টেটস্‌ম্যান পড়লে তো! দীর্ঘকাল জমিদারী ভোগ করলে যা হয়, এদেরও তাই হয়েছে—এত বাবুগিরি······ সিঙ্গাপুরটা ঠেকাতে পারলে না।" গৃহিনী সান্ত্বনা দিয়া বলেন, "এখন একটু ঘুমোও দেখি।" গজানন্দ দীর্ঘকাল ঘুমাইবার ভান করিয়া, টুক্‌রো, টুক্‌রো চিন্তার অঙ্কগুলিকে যোগ বিয়োগ, গুণ ভাগ করিয়া একটা ফল বাহির করিবার চেষ্টায় ছিলেন, পত্নীর সহানুভূতিতে তাহা আবার গুলাইয়া গেল। অস্ফুট আর্ত্তস্বরে গজানন্দ বলেন, "আর ঘুমোবো! সবই ভেস্তে যায় গিন্নী;—ছেলে দুটোর চাকরী হ'ল না, মেয়েদের বিয়ে হ'ল না। আজীবনের এত কষ্টের কড়ি—তবু বল আমি ঘুমোবো!" হাপরের মত দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া গজানন্দ পাশ ফিরিয়া শুইলেন। আসামী, উকীল; সাক্ষী, পেস্কার, পিনাল কোর্ড, তাঁহার মগজে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ইংরাজ রাজত্বের অটল মহিমা যতই বুঝাইতে চেষ্টা করে, গজানন্দের চিন্তা ততই ছেঁড়া পুটুলীর সরিষার মত সর সর করিয়া সরিয়া যায়।

২০শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪২

২

বোমা! বোমা! বোমা! মাথায় ভাঙ্গিয়াও পড়ে না, মাথা হইতে নামেও না। এতদিন সহরে বাস করিতেছি, এমন জ্বালায় কখনও জ্বলি নাই। রাস্তায় ট্রামে, বাসে, দোকানে, আপিসে সর্ব্বত্র ঐ এক আলোচনা,—বোমা। প্রত্যহ্ প্রভাতে সিঙ্গাপুর রেঙ্গুনের সংবাদ পাঠ করি—গায়ে কাঁটা দিয়া উঠে। গেল বছর শীতকালে ইয়োরোপের উপর এমনি বোমা পড়ার খবর পরম আরামে চা-পান

করিতে করিতে পাঠ করিয়াছি। তখন এমনটি হয় নাই। এবার পাগল হইবার উপক্রম। প্রত্যহ সকালে খবরের সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ কমিশনার ও এ, আর, পির নোটিশগুলি পড়ি, আর দুশ্চিন্তা বুকের মধ্যে বিড়ালের নখের মত আঁচড় মারিতে থাকে। বিমান আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য দশজনের মত আমিও ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছি। দোতালা ছাড়িয়া একতলার ঘরে শুই, গিন্নী পুত্রকন্যা নাতি-নাতনীসহ মধুপুরে গিয়াছেন, প্রত্যহ ডাকে অশ্রুসজল মিনতিপূর্ণ পত্র আসিয়াছে। তিনিও জানেন, আমিও জানি, পলাইবার পথ নাই। চাকুরী ছাড়ার অর্থ বোমা পড়িবার আগেই মরা। হোটেলে খাই, মাঠে বেড়াই, রাত্রে নিষ্প্রদীপ বাসায় বসিয়া রেডিয়ো শুনি। এই দুই মাসের মধ্যে মরিয়া হইয়া উঠিয়াছি। আর তো দেরী সহ্য হয় না, পড়ুক বোমা, একটা হেস্তনেস্ত হইয়া যাক। প্রথম বোমা বর্ষণের পর যদি প্রাণে বাঁচি তাহা হইলে পলাইয়া যাইবার একটা কৈফিয়ৎ বড় সাহেবকে দিতে পারিব।

মোটা বেতন পাই। রাজনীতি লইয়া কোনদিন মাথা ঘামাই নাই। কিছুদিন হইল কংগ্রেস, লীগ, এমেরী, চার্চ্চিল, রুজভেল্ট মায় রাজাগোপালাচীর বক্তৃতা মনযোগ দিয়া পড়ি। স্বায়ত্তশাসন, স্বাধীনতা, দেশরক্ষার দায়ীত্ব লইবার জন্য বড় বড় কথা শুনিলে গায়ের রক্ত হিম হইয়া যায়, দায়ীত্ব এতদিন যাঁহাদের ছিল, তাঁহারাই যদি ঠেকাইতে না পারেন, তাহা হইলে নিধিরাম সর্দ্দারের দল যে কি দিয়া কি করিবেন, ঠাহর পাই না। ছেলেরা আবার জনযুদ্ধ জনযুদ্ধ বলিয়া রব তুলিয়াছে। গুণ্ডার ছুরি দেখিলে যাহারা দেয় চোঁচা দৌড়, আত্ম-রক্ষার জন্য যাহারা প্রথমেই গিয়া উঠে থানার বারান্দায়, যখন শিরে সংক্রান্তি, তখন তাহারা করিবে লড়াই,—এর চেয়ে নাটক নভেলের

বীরত্ব অনেক বেশী সত্য। বলিতে কি, এ, আর, পি, সিভিক্ গার্ড্স, পুলিশের উপরও আমার ভরসা নাই। তাই ভাবিয়া ভাবিয়া দিনে দিনে শরীর শুকাইয়া যাইতেছে।

কত ভাবি, ইংরাজ রাজত্বে কি সুখেই না ছিলাম। আমরা চার পুরুষ সরকারী বেসরকারী চাকুরী করিতেছি। আপিস আদালতের পুকুরে কল্মীলতার মত বসুবংশের শাখাপ্রশাখা ছড়াইয়া পড়িয়াছে। আমরা স্বদেশী করি না, মিটিংএ যাই না, ইনক্লাব জিন্দাবাদী দল হইতে ছেলেদের সাবধানে রাখি। দুঃখে সুখে আমার জীবনের একটানা স্রোত, যখন প্রৌঢ়ত্বের সীমায় আসিয়া পৌছিয়াছে এমন সময় আচম্বিতে উপর হইতে পড়িবে জাপানী বোমা! আমাদের জীবনের কামনা বাসনার চিরসম্বল, আপিস, আদালত, ব্যাঙ্ক গুড়া গুড়া হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িবে, শেয়ার ও কোম্পানীর কাগজের দাম পড়িয়া যাইবে, মাসের পহেলা তারিখ বেতন পাইব না, ইহা ভাবিতেও হৃদকম্প হয়। ইংরাজ রাজত্ব নাই, থানাপুলিশ নাই, ছোটলোকের দৌরাত্ম্য হইতে ভদ্রলোকদের রক্ষার কোন ব্যবস্থা নাই—কেবল কতকগুলা বেঁটে জাপানী সহরের পথে দাপাদাপি করিবে, ইহা ভাবিতে গেলে কপালের শিরা দপ্ দপ্ করিয়া জ্বলিতে থাকে। আমার সহকারী রাম চক্রবর্ত্তী টিট্কারী দিয়া বলে, বোমা পড়িয়া একটা পরিবর্ত্তন হোক ভয় কি? কাষ্ঠহাসি হাসিলে কি হয়, সকলেরই হাত পা পেটের মধ্যে ঢুকিতেছে।

কিছুদিন পূর্ব্বে আপিসে হিটলারের প্রশংসা চলিত। ইংরেজ বেকায়দায় পড়িয়াছে—বিরক্ত কেরাণীদের মধ্যে একটা পুলক ঝিলিক দিয়া উঠিত। হইবে না, হিটলার কি একটা নেচি-ফেচি-লোক। নিরামিষ খান, ব্রহ্মচারী—যুগাবতার, সাক্ষাৎ কল্কী অবতার, ভূভারহরণের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহার জয়ে সত্যযুগ আসিবে। আমি একটু

ধর্ম্মভীরু বলিয়া কিছু কিছু বিশ্বাসও করিতাম। রুশিয়ার কমিউনিস্টরা ঈশ্বর মানে না, ধর্ম্ম মানে না, ধর্ম্মশাস্ত্রের বিধি লঙ্ঘন করিয়া ছোটবড় ভেদ লুপ্ত করিয়াছে। তাই সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরের নির্দ্দেশে হিটলার তাহাদের কোতোল করিতে গেলেন। আমরা ধর্ম্মের জয় দেখিবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইলাম। কিন্তু এ কি দেখিতেছি? ঈশ্বরের বরপুত্র আর্য্যবংশধর ধার্ম্মিকেরাই অধার্ম্মিকদের ঠেঙ্গানী খাইয়া গুটি গুটি বাড়ী ফিরিতেছে। ইয়োরোপের কথা থাক,—এদিকে যে সূর্য্যপুত্রগণ হানা দিয়াছেন, শুনি সেই জাপানীদেরও নাকি ঈশ্বরে বিশ্বাস নাই, ধর্ম্মকর্ম্মে মতি নাই। উহারা যদি সত্যই বর্ম্মা ডিঙ্গাইয়া কলিকাতায় আসিয়া পড়ে, তাহা হইলে "বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি" বলিয়া পায়ে পড়িলে কি বাঁচিব! ইহার বেশী ভাবিতে পারি না।

আসল কথা বলিতে কি, এই অবস্থায় সুসম্বদ্ধভাবে চিন্তা করা অসম্ভব। মাঝে মাঝে সভায় গিয়া ডাক ছাড়িয়া বলিতে ইচ্ছা করে যে, হে ইংরাজ এতকাল তুমি আমাদের বাঁচাইয়াছ, এ সঙ্কটে তুমিই আমাদের বাঁচাও। দেশরক্ষার দায়ীত্ব লইয়া আমরা ফ্যাসাদে জড়াইতে চাহি না, যুদ্ধের মত জটিল ব্যাপার হইতে আমাদের দূরে রাখ। তুমি সেপাই শান্ত্রী কামান বিমান লইয়া লড়াই কর। আমাদের শুধু নিরাপদে প্রাণ বাঁচাইবার ব্যবস্থা করিয়া দাও। জানি একথা বলিলে লোকে কাপুরুষ বলিয়া আমাকে ধিক্কার দিবে। আমি কাপুরুষতার অপবাদ মাথা পাতিয়া লইতে রাজী আছি, কিন্তু নির্ব্বোধ হইতে প্রস্তুত নই। আমার স্ত্রী-পুত্র পরিবার, স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি এবং চাকুরিটী যদি নিরাপদ থাকে, তাহা হইলে আমি জাপানী বোমা হইতে হিটলারী হুঙ্কার কিছুই গ্রাহ্যের মধ্যে আনা আবশ্যক বোধ করি না। দুনিয়ার মালিক যাহারা তাহারা রাজ্যরক্ষা ও রাজ্য গ্রাসের জন্য যুদ্ধ করুক।

আমি শুধু কায়ক্লেশে দু'মুঠা খাইয়া বাঁচিতে চাই। আমি পরিবর্ত্তন, বিবর্ত্তন, আবর্ত্তন, সামাজিক উন্নতি, অর্থনৈতিক নয়া ব্যবস্থা, রাজনৈতিক স্বাধীনতা, কিছুই চাহি না, কিছুতেই বিশ্বাস করি না, ধার্ম্মিকদের মুখে শুনিয়াছি, এই পৃথিবীরূপ কুকুরের লেজ কখনই সিধা হইবে না। কাজেই হানাহানি হইতে দূরে থাকিয়া পৈত্রিক প্রাণ রক্ষা করাই বুদ্ধিমানের কাজ। এই ভাবে প্রবোধ দিয়া মনকে বাগাইয়া আনি, এমন সময় সাইরেন বাজিয়া উঠে। বয়সোচিত গাম্ভীর্য্য আর রাখিতে পারি না। পদমর্য্যাদা ভুলিয়া চাকরটার সম্মুখেই খাটের তলায় ঢুকি। আরও বিপদ হইয়াছে, পাড়ার ছেলেরা সাইরেনের নকল ডাক যখন তখন ডাকিয়া প্রাণ অস্থির করিয়া তোলে। রাত্রে একক শয্যায় ঘুম হয় না। যে গৃহিণীর অঞ্চল ধরিয়া ত্রিশবৎসর কাল নিরাপদে কাটাইয়াছি, আজ বোমা সেই আশ্রয়স্থল হইতে আমাকে বঞ্চিত করিয়াছে। আজ আমি অসহায়, নিরুপায়। এ হেন নিরীহ শ্রীকৃষ্ণের জীবকে মারিবার বা ভয় দেখাইবার জন্য কেন এ বোমা ফাটাফাটি !

৩০শে জানুয়ারী ১৯৪২

৩

মেঘলা প্রভাত। পাত্‌লা কুয়াশা বাতাসে ভাসিতেছে। চায়ের পেয়ালা ও সংবাদপত্র লইয়া বৈঠকখানায় বসিয়াছি। সিঙ্গাপুরের পতনের পূর্ব্বে এমন কি পরেও দিন কয়েক অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া পড়িয়াছিলাম। এখন একটু প্রকৃতিস্থ হইয়াছি। কয়েকটা দিন মনটা আর আশা-নিরাশায়

দোল খাইতেছে না। আচমকা বিপদের প্রথম আঘাতে মন মুহ্যমান হইয়া পড়িয়াছিল। ভূমিকম্পের মধ্যে মানুষ যেমন ঠিক হইয়া দাঁড়াইতে পারে না, অবস্থা অনেকটা সেইরূপ। এখন ভাগ্য ও নিয়তিকে বরণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছি। মধুপুরবাসিনী গৃহিণীর নিকট বীরত্বপূর্ণ বড় বড় চিঠি লিখিতেছি, বোমার ভয় আর রাখি না। গৃহের শূন্যতা সহিয়া গিয়াছে। যতদিন কলিকাতায় ট্রাম, বাস চলিবে, মুদীখানা ও খাবারের দোকান খোলা থাকিবে, বাজার বসিবে, ততদিন ভৃত্য ও পাচক পঞ্চুকে লইয়া কলিকাতার মাটি কামড়াইয়া পড়িয়া থাকিব। এবং বোমা পড়ার পর মুড়ি ও মিছরী, কুলি ও কৌসুলী, ভাড়াটে ও বাড়ীওয়ালা একাকার হইয়া গিয়াছে, সেই ভয়ার্ত্ত সাম্যবাদ দেখিবার জন্য আমি বাঁচিয়া থাকিব। জীবনযাত্রা প্রণালীটা আরও ভাল লাগিত যদি বিপদের জন্য দিনের পর দিন অনিশ্চিত প্রতীক্ষা করিতে না হইত।

কয়েকদিন খবরের কাগজগুলা অত্যন্ত একঘেঁয়ে হইয়া উঠিয়াছে। মার্শাল চিয়াংকাইশেকের বিবৃতিটা পড়িতে পড়িতে ভাবাবেগে তন্ময় হইয়া উঠিয়াছি, এমন সময়, "এই যে দাদা" বলিতে বলিতে নিতাই ঘরে ঢুকিতেই ; "আরে এস এস" বলিয়া অভ্যর্থনা করিলাম। নিতাই ফরোয়ার্ড ব্লকের পাণ্ডা, সম্প্রতি গা ঢাকা দিয়াছে ; তা দিক, ছেলেটি বড় অমায়িক। দেশ বিদেশের খবর ও গুজব ওর নখাগ্রে। ইংলণ্ডের রাজারাণী কলিকাতার কেল্লা হইতে কবে কানাডায় গিয়াছেন ; হিটলার ক্রীমলীনে খানা খাইতেছেন, ষ্টালিন পলাতক, এ সব খবরও নিতাই রাখে ; টোকিয়ো, বার্লিন, সাইগন, নিউইয়র্ক, রিও-ডি-জেনেরো আরও কত কি বেতারবার্ত্তা তাহার মুখে শুনিয়া কখনও আনন্দে রোমাঞ্চিত, কখনও ভয়ে অভিভূত হই। নিতাইএর সহিত যুদ্ধের আলোচনা করিব, এমন সময় পঞ্চু আসিয়া একটাকার নোটখানি দু'আঙ্গুলে ওরিয়েন্টাল

ভঙ্গীতে, তুলিয়া ধরিয়া বলিল, 'বাবু কয়লার দাম আজ চার আনা চড়েছে'। রাগে প্রায় লাফাইয়া উঠিলাম। পঞ্চুই চোর না কয়লাওয়ালাই মুনাফাখোর ঠাহর না পাইয়া ফুলিতেছি, নিতাই বাধা দিয়া বলিল, "ও চার আনা দিয়ে দিন দাদা, বরঞ্চ আরও মন কয়েক আনিয়ে রাখুন, কাল হয়তো, দেড়টাকা হয়ে যাবে।" চাকরের হাতে পয়সা তুলিয়া দিয়া নিতাইকে বলিলাম—"গভর্ণমেণ্ট দাম বেধে দিলে পনর আনা অথচ চড় চড় করে পাঁচ আনা বেড়ে গেল? এ যে অরাজক কাণ্ড! যাই বল নিতাই তোমাদের ফরোয়ার্ড ব্লক মন্ত্রীরা কিচ্ছু না।"

নিতাই বাধা দিয়া বলিল, "মন্ত্রীরা কি করবে শুনি। কেবল সৈন্য আর রসদ চলাচল; মালগাড়ী কই! এই দেখুন না, মফঃস্বলে ধানের দাম এই একমাসে তিনটাকা সাড়ে তিন টাকা থেকে, দু' টাকা সোয়া দু' টাকায় নেমে গেল। খুলনা, বরিশাল, মেদিনীপুরে চাল পাঁচ টাকা মণ আর কলকাতায় মণ ৮৲।৯৲ টাকা, গাড়ী চলাচলের পথ বন্ধ হওয়াতেই এই অবস্থা।"

"মালগাড়ী না হয় নেই, নৌকোগুলোও কি নদীতে ডুবেছে।"—নিতাই উত্তর দিতে দিতে ক্রমে রণনীতি ও অর্থনীতির জটিল গ্রন্থি খুলিয়া যে সকল তত্ত্বকথার অবতারণা করিল, তাহা হইতে মুক্তি পাওয়ার ফিকির দেখিতেছি, এমন সময় বসন্তবাবু খবরের কাগজ পাঠ ও আমাকে সঙ্গসুখ দিয়া ধন্য করিতে আসিলেন। নিতাইকে দেখিয়াই বসন্তবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হে নিতাই, তোমাদের বন্দীমুক্তি আন্দোলনের কি হল।" "সময় আসুক; দেখে নেবেন"—বলিয়া নিতাই গম্ভীর হইল। বসন্তবাবু খোঁচা দিয়া বলিলেন,—"মুরোদ দেখা গেছে। শরৎবাবুর জন্য তোমাদের ব্লকের মন্ত্রীরা কি চাকুরী ছাড়লো! তোমরাও তো আর চাপ দেওনা?" নিতাই অপ্রস্তুত হইবার পাত্র নহে। সে রুখিয়া বলিল,—"রাজনীতি

আপনি বোঝেন না ; সময় আসুক বন্দী মুক্তি তো ছার ; দেখবেন আমরা কি করি ?”—নিতাই তাহার প্ল্যান বলিতে বলিতে চ্যালেঞ্জের ভঙ্গীতে দুই হাত ঊর্দ্ধে তুলিয়া বলিল,—“বলুন সকলে দাই নিপ্পন, দাই নিপ্পন”।

বিস্ময়ে নিতাইর মুখের দিকে চাহিলাম, পেশোয়ার হইতে চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত একটা গণসংগ্রামের বিভীষিকা মন তোলপাড় করিয়া তুলিল। করুণ হইয়া বলিলাম ; “এই দেখ নিতাই, ষ্টেট্‌স্‌ম্যান লিখেছে যে, গঙ্গা, যমুনা ও ব্রহ্মপুত্রের পূর্ব্বতীরে আসাম ও পূর্ব্ববঙ্গ আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা ঘনিয়ে এসেছে। এমন সময় তোমরা—”

“এই তো চাই। চিয়াংকাইশেক্‌কে নিয়ে জওহরলালের নাচানাচি—ডিব্রুগড় থেকে চুংকিং রাস্তা—এ সব বেকুবীর খেসারত দিতে হবে না ? আমরা তো হাত মেলাবার জন্য প্রস্তুত।” এইবার বসন্তবাবু দস্তুরমত রাগিলেন,—“দেখ নিতাই আসলে তোমরা কিচ্ছুই করবে না। তোমরাই না বলেছিলে গ্রামে গ্রামে মিলিশিয়া গঠন করে শত্রুর আক্রমণ থেকে দেশরক্ষা করবে, এখন বলছো, হাত মেলাবার জন্য প্রস্তুত ; এর কোনটা সত্যি ?” “এই তো কূটনীতি”—বলিয়া নিতাই যাহা বলিতে লাগিল, তাহা শুনিয়া অধৈর্য্য হইয়া উঠিলাম, কিন্তু নিতাইর রসনা টঙ্কার দিয়া শরসন্ধান করিতে লাগিল ; “আপনাদের দোষেই দেশটা ডুবলো মশাই। বাঙ্গালী ভদ্রলোকের আত্মপরায়ণতা আর কেবল স্ত্রী-পুত্র, টাকাকড়ির ভাবনা। জাতীয় জীবনের এত বড় সুযোগের কথা ভাবছেন না। ভাবছেন না, সমগ্র এশিয়ার সহসমৃদ্ধি,—মিলিশিয়া—দেখে নেবেন ! এটা কেবল ইংরাজে জাপানে লড়াই নয়—আমাদের জাতীয় মুক্তি যুদ্ধের”—আর সহ্য করিতে পারিলাম না,—“থামো ভাই, আমরা গেরস্ত মানুষ, রুজী-রোজগারের ধান্দায় ফিরি—ও সব ব্যাপারে আমাদের জড়িয়ো না।” চা খাইতে খাইতে নিতাই বলিল, “বুঝ্‌বেন্, বুঝবেন !”

নিতাই ও বসন্তবাবু চলিয়া যাইবামাত্র, পঞ্চু আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বাবু, জাপানীরা কি রেঙ্গুনে এসেছে!" পঞ্চু নিতাইর বক্তৃতা বাহিরে দাঁড়াইয়া শুনিয়াছে। পঞ্চুর মনের ভাব আমি জানি, ঐ সংবাদটির জন্যই সে পোট্‌লা-পুটলী বাঁধিয়া প্রতীক্ষা করিতেছে। গৃহিণীর বিরহও সহিয়া গিয়াছে, কিন্তু পঞ্চু পালাইলে, আমি আমার ছোট নাতিটির মত অসহায় হইয়া পড়িব। পঞ্চুকে প্রবোধ দিয়া বলিলাম—"জাপানীরা রেঙ্গুনে আস্‌লে তোর কি? জানিস্, জাপানীরা রেঙ্গুন নিলেও আরও দু'হাজার মাইল জায়গা পড়ে থাক্‌বে, কত পাহাড় পর্ব্বত বন জঙ্গল—তারপর আছে লবণ সমুদ্র! কলকাতায় আসা কি চালাকী ব্যাপার!" কিন্তু পঞ্চু কেবল আমার কথা শোনে না, বাজারে ও ভৃত্যমহলে সে যে সকল কথা শুনিয়া আসে, তাহা আবার আমাকে শোনায়। এতদিন পরে বুঝিতেছি, আমরা অর্থাৎ চাকুরীজীবী ভদ্রলোকেরা কত অসহায়। পঞ্চু পলাইলে জাপানী আসিবার পূর্ব্বেই আমার পঞ্চত্ব প্রাপ্তি ঘটিবে। অথচ এই আমি, বসিয়া বসিয়া বড় বড় ভাবনা ভাবি—দেশরক্ষা জাতিরক্ষার প্ল্যান করি—এবং সঙ্কট আসিলে বিপদের বুকে বসিয়া আমিই আপিস চালাইব বড়সাহেব এমন ভরসাও রাখেন। সত্যই ইংরাজ শাসনের সুশীতল শান্তি আমাদের কত বড় ভণ্ড করিয়া তুলিয়াছে। আমাদের ও পঞ্চুর মত সে সব গো-বেচারাদের লইয়া, এ, আর, পি ও সিভিক্ গার্ড করা হইয়াছে. একটা বোমা ফাটিলেই পশ্চিমী হাওয়ায় শিমুল তুলার মত তাহারা যে কোথায় ভাসিয়া যাইবে, তাহার পাত্তাই পাওয়া যাইবে না।

২৭ শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪২

৪

মধুপুর হইতে গৃহিণী যে সকল পত্র লিখিতেছেন, তাহা সুখপাঠ্য নহে। আমি ঘন ঘন ভায়রার বাড়ীতে যাই কেন এবং শ্যালিকা ও তাহার বিধবা ননদসহ প্রায়ই সিনেমা দেখিতে যাই কিনা, এই সব প্রশ্ন তুলিয়া তিনি প্রত্যেক পত্রেই শ্লেষ ও বিদ্রূপ করিতেছেন। এই সাধারণ সংবাদগুলিকে অসাধারণ গুরুত্ব দিবার কোন হেতু নাই। কলিকাতায় আমার জীবনযাত্রা সম্পর্কে গৃহিণী গোপনে সংবাদ সংগ্রহ করিতেছেন, কথাটা ভাবিতেও মন বিরক্তিতে ভরিয়া উঠে। মনে মনে হাসিও পায়। বুঝিলাম, শ্যালিকা সরলভাবে বিরহিণী ভগ্নীর নিকট যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহারই মন্থনে ঈর্ষার হলাহল উঠিয়াছে। হুজুরের মোকাবেলায় সওয়াল জওয়াব করিতে হইবে—মধুপুর যাত্রার দিন স্থির করিলাম।

সামনে দোলের ছুটি, তার সঙ্গে আর দুটা দিন যোগ করিলে কয়েকদিন মধুপুরে থাকিয়া আসিতে পারিব মনে করিয়া বড়সাহেবের শরণাপন্ন হইলাম। তিনি বড় রাশভারী মানুষ। হোটেলে ক্লাবে স্বজাতিমহলে তাঁহার মেজাজ রাত্রে বড় দিলদরিয়া হয়; কিন্তু আপিসে একেবারে ধ্যানী বুদ্ধের মত গম্ভীরমূর্ত্তি—আপন অটল মহিমায় অটুট থাকিয়া ভারতীয়দের প্রতি কৃপাদৃষ্টিপাত করেন। কাজের কথা ছাড়া তিনি কস্মিনকালেও কোন কথা বলেন না, আজ অত্যন্ত হৃদ্যতার সহিত অন্তরঙ্গতা করিতে দেখিয়া অবাক হইয়া গেলাম। "তোমরা কি ভাবছো?" বলিয়া তিনি দৃষ্টি বিস্ফারিত করিলেন। বুঝিলাম, তোমরা অর্থাৎ দেশী লোকেরা, এবং বিষয়বস্তু হইল যুদ্ধ। আমি বলিলাম, "সিঙ্গাপুর ডিঙ্গিয়ে জাপানীরা বর্ম্মায় ঢুকেছে, এখন বোমা ছাড়া আর কোন কথা নেই—সকলেই ভাবছে, কলকাতায় জাপানীরা কবে আস্‌বে?" সাহেব চেয়ারে দেহ

প্রসারিত করিয়া বলিলেন, "শুনতে পাই, ইংরাজ বেকায়দায় পড়েছে বলে তোমাদের খুসীর সীমা নেই?" "কথাটা সত্যি, জাপান আসুক, এটা আমরা চাইনে; তবে ইংরাজের গর্ব্ব-খর্ব্ব হচ্ছে দেখে অনেকেই আনন্দিত।" "কেন আমরা কি তোমাদের কোন উপকার করিনি?" "উপকার এক কথা আর মর্য্যাদার সঙ্গে ব্যবহার আর এক কথা। হৃদয়ের সহিত সম্পর্কহীন দাক্ষিণ্যে মানুষের মন পীড়িত হয়। এদেশে তোমরা চাকরী কর, ব্যবসায় কর, কেবল কাজের খাতিরে দেশী লোকের সঙ্গে মেশ, কিন্তু কখনও আমাদের সঙ্গে হৃদ্যতা ও সামাজিকতার সম্পর্ক রাখ না। আপিসের পর ভারতীয় সমাজের ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে তোমরা ক্লাবে হোটেলে নিজেদের সঙ্গে মেলামেশা কর; ভারতীয় জীবনের কোন খোঁজখবর রাখ না। বয়, বেয়ারা, খানসামা, বাবুর্চ্চিদের আচার ব্যবহার দেখে ভারতীয় চরিত্র আন্দাজ কর। আয়া, মেথরাণীর জার ঘটিত কলঙ্কের কাহিনী ক্লাবে আলোচনা করে ভায়তীয় চরিত্র সম্পর্কে অশ্রদ্ধা প্রকাশ কর। পরস্পরের মধ্যে এই অপরিচয়ের ব্যবধান; অবিশ্বাস, অসন্তোষ সৃষ্টি করেছে দীর্ঘদিন ধরে"—সাহেব আমার কথা সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া স্বীকার করিলেন না, তিনি বলিলেন, "দোষ দুই পক্ষেরই। অতীত ইতিহাসের তিক্তস্মৃতি সত্ত্বেও, আমরা বুঝতে পারছি, ভারতের ও আমাদের স্বার্থ এক"—আলোচনা ক্রমে রাজনীতিতে আসিয়া পড়িল। উপসংহারে তিনি বলিলেন, "মিঃ ঘোষ, মাঝে মাঝে তোমার সঙ্গে এরূপ আলোচনার সুযোগ পেলে সুখী হব।" যুদ্ধের গরমে বড়সাহেবের কড়া মেজাজও নরম হইয়াছে,—ছুটিটা মঞ্জুর হইল।

সাহেবের কামরা হইতে নিজাসনে ফিরিবা মাত্র, কয়েকজন আগাইয়া আসিল। এতক্ষণ কি কথা হইল জানিবার জন্য সকলেই উদ্‌গ্রীব। গম্ভীরভাবে বলিলাম, "সিঙ্গাপুর বর্ম্মায় আমাদের অনেক ক্ষতি হয়ে গেল,

সাহেব বললেন, মিষ্টার বোস, আপিসের অর্দ্ধেক কেরাণী কমিয়ে দাও।” উৎসাহদীপ্ত মুখগুলি নিষ্প্রভ হইয়া গেল। কৃত্রিম সহানুভূতির সুরে বলিলাম, এখন তো দেশে যাও সব, পৈত্রিক প্রাণ বাঁচলে চাকরী অনেক মিলবে। তিনচারটি কণ্ঠ হইতে একই আর্ত্তস্বরে উঠিল—দেশে তো যাব ; খাব কি ; আর গাম্ভীর্য্য রক্ষা করিতে পারিলাম না ; হাসিয়া বলিলাম, “তোমরাও ভাল, শুনিয়ে দিয়ে এলাম কড়া কড়া কথা। এতদিন পর আমাদের ওপর দরদ হ'য়েছে ; স্পষ্টই বল্লাম, তোমরাই আমাদের দফা শেষ করেছ, এখন তোমরাই জাপানী ঠেলা সামলাও, আমাদের কি ?” চাকুরী যাইবে না আশা পাইয়া সকলেই যার যার কাজে ফিরিয়া গেল।

পরদিন সকালবেলা পঞ্চুকে লইয়া হাওড়ায় আসিয়া দেখি,—সমস্ত সহরবাসী পাগলের মত প্রত্যেকটি ট্রেন আক্রমণ করিতেছে—কামরায় কামরায় ধ্বস্তাধ্বস্তি, বচসা। অনেক কষ্টে দ্বিতীয় শ্রেণীর এক কামরায়, একটা ষ্টীল ট্রাঙ্কের উপর বসিবার ঠাঁই মিলিল। গাড়ী ছাড়িবার পর, সমবয়সী মুখোমুখী ভদ্রলোকটি অর্থপূর্ণ ভঙ্গীতে প্রশ্ন করিলেন, পালাচ্ছেন বুঝি ! বিরক্ত হইয়া বলিলাম, বুধবারই কলকাতা ফিরবো। ভদ্রলোক হাসিয়া বলিলেন, ও আপনারও আমার মত হাল দেখছি। আলাপ জমিয়া উঠিল। ইনি দেওঘরে পরিবারবর্গ স্থানান্তরিত করিয়াছেন, প্রতি সপ্তাহেই যাইতে হয়, খরচ বাড়িয়াছে, ইত্যাদি। বর্দ্ধমান পৌছিবার পূর্ব্বেই—গাড়ীতে যুদ্ধের আলোচনা মুখর হইয়া উঠিল। একজন প্রত্যক্ষদর্শীর ভঙ্গীতে সিঙ্গাপুর পতনের কাহিনী বর্ণনা করিতে লাগিলেন। জাপানের অস্ত্রবলকে মন্ত্রবলের ঐন্দ্রজালিক ভূমির উপর দাঁড় করাইয়া, তিনি যে সব আজগুবী কথা বলিতে লাগিলেন, তাহার সমর্থনের অভাব দেখিলাম না। জাপানীরা সুন্দরবনের জঙ্গল ও বালেশ্বরের বেলাভূমি হইতে দুমুখো আক্রমণ চালাইয়া কি ভাবে কলিকাতা দখল করিবে, তাহার নিখুঁত ও

নির্ভুল বিবরণ সকলে হাঁ করিয়া গিলিতেছেন,—আমি মৃদুভাবে সন্দেহ প্রকাশ করিতে, বক্তা বিজ্ঞজনোচিত অনুকম্পার ভঙ্গীতে আমার বুদ্ধি বিবেচনার উপর কটাক্ষপাত করিলেন। আলোচনা চলিতে লাগিল, মধুপুর ষ্টেশনে আসিয়া নিষ্কৃতি পাইলাম।

বাসায় পৌছিলাম, আশঙ্কা করিয়াছিলাম যে, গৃহিণী মুখভার করিয়া থাকিবেন, কিন্তু তাঁহার হাসিমুখ দেখিয়া আপাততঃ খুসী হইলাম। মনের কোণে আশঙ্কা থাকিল, ঝড়টা বুঝিবা রাত্রেই উঠিবে। কিন্তু সেরূপ কিছু হইল না। কলিকাতার গল্প ও সাধারণ ঘর সংসারের কথার ফাঁকে ঘুমাইয়া পড়িলাম। প্রভাতে "ভালমন্দ দ্রব্যের" ফর্দ্দ লইয়া বাজারে গেলাম। বাজারে চেনা মুখের অভাব নাই। এটর্নী বন্ধু অমিয় ঘেঁসিয়া আসিল এবং কতকগুলি স্থূল রসিকতা করিয়া বলিল, "বিকেলে চা-টা অন্ততঃ আমার ওখানেই খেয়ো। সকাল সকালই ছেড়ে দেবো বউদিদির ভয় নেই।"

চায়ের পর্ব্ব চলিতে চলিতে, সন্ধ্যা ঘনাইয়া চতুর্দ্দশীর চাঁদ উঠিল। সামনের বাগান হইতে ফুলের গন্ধ ঝিরঝিরে হাওয়ায় ভাসিয়া আসিতেছিল। কলিকাতার বদ্ধজীব আমি, প্রকৃতির স্নেহস্পর্শে উন্মনা হইয়া উঠিলাম। যৌবনের হারানো দিনের স্মৃতি ভাসিয়া উঠে, দুএকটা কবিতার ভগ্নাংশও মনে পড়িয়া যায়, গুণ গুণ করিয়া গাহিতে ইচ্ছা হয়, "এমন চাঁদের আলো, মরি যদি সেও ভাল।" এলো মেলো চিন্তায় বাধা পড়িল, ব্যারিষ্টার মিঃ ব্যানার্জ্জী কৌতুকের সঙ্গে বলিলেন, অমিয় আর দেরী কেন, দিব্বি চাঁদের আলো—। হুইস্কী সোডা গ্লাস আসিয়া হাজির হইল। আমি বিদায় লইবার ভঙ্গীতে বলিলাম, 'অমিয়, তোমরা আনন্দ কর, আমি উঠি।' অমিয় হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, আরে দাদা সে কি হয়? খাঁটি স্কচ হুইস্কী এর পর আর মিলবে না—কতদিন কে

জানে। মিঃ ব্যানার্জ্জী মিনতি করিয়া বলিলেন কবে জাপানী বোমায় মারা যাবেন, মিঃ বোস, বন্ধুর অনুরোধ রাখুন। এই বোমার হিড়িকে ভেবেই মরে যেতাম, এই হুইস্কীই বাঁচিয়ে রেখেছে। গৃহিণীর মুখারবিন্দ স্মরণ করিয়া বলিলাম,—তুমি তো জান অমিয়! মদ ও সোডা মিশাইতে মিশাইতে অমিয় হাসিয়া বলিল, 'জানি জানি, তুমি আড্ডা ছাড়বার পরও মদ ছাড়নি। প্রসবের পর বৌদিদিকে সবল করবার জন্য ব্র্যাণ্ডি কিনতে, তার বেশীর ভাগ যেতো তোমারই পেটে।' 'হ্যাঁ সে এক আধটু মাঝে মাঝে চলতো, এখন একেবারে ছেড়েছি।'—মিঃ ব্যানার্জ্জী রসিকতা করিয়া বলিলেন, 'তা হলেই বুঝুন মিঃ বোস, মাতাল সাসপেণ্ড হয়, ডিস্‌মিস্‌ হয় না, এও তো একদিনের মামলা।'

শেষ পর্যন্ত রেহাই পাইলাম না। সঙ্কল্প করিয়াছিলাম, দুই পাত্রের বেশী অগ্রসর হইব না কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত মাত্রাধিক্য ঘটিয়া গেল, আমার যৌবনের দুর্ব্বলতা অমিয় জানে। পুরাতন কথা টান দিয়া ভাবাবেগময় আলোচনার মধ্যে বোতল শেষ হইল।

আহারের সময় গৃহিণী হয়তো টের পাইলেন, কিছুই বলিলেন না। এ যাত্রা বাঁচিয়া গেলাম ভাবিয়া যখন শয্যায় গিয়াছি, দরজায় খিল দিয়া গৃহিণী প্রথম চোটেই রুখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিসের গন্ধ শুনি? আবার ছাই পাঁশ ধরেছ?" সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করিয়া বলিলাম,—'আজ কেবলমাত্র ভদ্রতার খাতিরে'—তিনি ঝঙ্কার দিয়া উঠিলেন, 'ভদ্রতার খতিরে না পড়লে এই বয়সে আর রেণুকাকে নিয়ে সিনেমায় যাবার সখ হবে কেন?' গৃহিণী খোঁচা মারিয়া যে সব কথা বলিলেন তাহা শুনিয়া দুই কর্ণে কনিষ্ঠাঙ্গুলী দিয়া বলিলাম, "নারায়ণ নার্‍য়ণ! তুমি আমাকে এতটা সন্দেহ করতে পারলে!" উদরস্থ পদার্থ তখন মস্তিষ্কে উঠিয়াছে। মাথায় হাত দিয়া শপথ করিলাম, হাতে হাত দিয়া মিনতি করিলাম, তাঁর রোষ

ক্রন্দনে ভাঙ্গিয়া পড়িল। আমার ভবিষ্যৎ ভাবিয়া এবং নিজের দগ্ধ দুর্ভাগ্যকে ধিক্কার দিয়া তিনি যে সব কথা বলিতে লাগিলেন, এই যুদ্ধকালীন জরুরী বিরহ ব্যতীত তাহা কিছুতেই সম্ভব হইত না। ত্রিশ বৎসরের একানুরক্ত স্বামীর চরিত্রে এত সন্দেহ এই কয়দিনেই মনের কোনে জমিয়া উঠিয়াছে! বুঝিলাম বোমা বাড়ীঘর ঘায়েল করিবার পূর্ব্বেই আমার মত হতভাগ্যের পরম নিশ্চিন্ত একান্ত নির্ভরপর দাম্পত্য জীবনের ভিত্তিতে ফাটল ধরাইয়াছে! নিরুপায়ের অশ্রু গড়াইয়া পড়িল, বালিশের কোন দিয়া মুছিতেছি দেখিয়া গৃহিণী যাহা করিলেন,—সে কথা এ বয়সে বলিতে লজ্জা করে।

১৩ই মার্চ্চ, ১৯৪২

বর্ষ শেষ

রাত্রি গভীর—আলস্যসুপ্ত ধরণীর মুখের উপর মেঘের ছায়া পড়িয়া অন্ধকার ঘনতর করিয়া তুলিয়াছে। বর্ষণক্লান্ত মেঘমালায় রহিয়া রহিয়া বিদ্যুৎদীপ্তি। সজল শীতল বাতাসে অবরুদ্ধ ক্রন্দনের ক্ষীণ স্বর। অনন্ত কালের নিস্তব্ধ পথে পুরাতন বর্ষ নিঃশব্দ পদে চলিয়া যাইতেছে।

দিবারাত্রির অবিশ্রান্ত আবর্ত্তিত গতির মধ্যে সমাপ্তি কোথায়? যেখানে শেষ সেইখানেই আরম্ভ। কি যেন ফুরাইয়া গেল, কি যেন হারাইয়া গেল—এমন শূন্যময় রিক্ততার মধ্যেও অফুরন্তের নিত্য আবির্ভাব। যে প্রতি পলে প্রতি দিনে নিজেকে তিলে তিলে ক্ষয় করিয়া চলিয়া গেল, সেই আজ পরিপূর্ণ সঞ্চয়রূপে অক্ষয়। রজনীর এই শান্ত মুহূর্ত্তে দেখি—এ সংসারে ক্ষয় আছে, ক্ষতি আছে, আছে অবিশ্রান্ত গতি—বস্তুপুঞ্জের উদ্ভব ও বিলয়! এবং তাহা আছে বলিয়াই অবকাশের মুহূর্ত্তে আমরা অনুভব করি, এক অপরিণামী চিরস্থির শাশ্বত সত্যকে—যাহা আপনাতে আপনি অটল।

এই সত্য মানুষের অনুভূতিতে প্রথম কবে ধরা দিয়াছিল? কোন্ সে স্মরণাতীত কালে মানুষের কর্ণে কে উচ্চারণ করিয়াছিল—হে অমৃতের পুত্রগণ, জাগরিত হও! তাহার পর হইতে অমৃতের সন্ধানে মানব চলিয়াছে। যুগ হইতে যুগান্তরে—জন্ম হইতে জন্মান্তরে—দেশ হইতে দেশান্তরে। এমনি কত বর্ষ গেল, কত শতাব্দী গেল, মানুষের অমৃতের ভাণ্ড পূর্ণ হইল না। জীবন মন্থন করিলে গরল উঠে। সত্য মিথ্যার নিকট যেন পরাহত হইয়া যায়। মানুষের সমস্ত দুঃসাধ্য উদ্যমকে ব্যঙ্গ করিয়া হিংসা ও লোভ প্রতিদিন অমৃত আহরণের চেষ্টা পণ্ড করিতেছে।

তবুও বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই। মানুষ তাহার মনুষ্যত্বের মহিমায় শোকহীন, ভয়হীন, সংযত শৌর্য্যে এই আপাতবিরুদ্ধ, অসামঞ্জস্য-ভরা সৃষ্টির মধ্যে তাহার আহৃত অমৃত প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প ত্যাগ করিল না। পরাভবকে আজিও মানুষ মানিল না। প্রতি ব্যর্থতার পর আরও কঠোর, আরও তীব্র সংগ্রামে জয়লক্ষ্মীর আশীর্ব্বাদ মানুষ কামনা করে। এই দুর্লভের কামনায় সুন্দর মানুষকে জীবনের বেদনার বহ্নিশিখার আলোকে কি অপরূপ করিয়া দেখিলাম! সমস্ত ব্যর্থ, সমস্ত নিস্ফল বলিয়া কে উপহাস করে? যে জীবনযুদ্ধে পলায়ন করিল না, মনুষ্যত্বের কঠোর কর্ম্ম-ভূমিতে যে দৃঢ়পদে দাঁড়াইয়া রহিল, তাহাকে লজ্জা দিতে চাহে কোন্ নির্লজ্জ?

এই চরাচর পরিব্যাপ্ত অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়াইয়া নিজের ক্ষুদ্রতার দৈন্য ভুলিলাম। আত্মাভিমান, জাতি-অভিমান ফুলিয়া ফুলিয়া ফেনিল হইয়া হৃদয় কানায় কানায় ভরিয়া উঠিল। এই ভারতবর্ষ—রোগ-শোক-মহামারী-অন্নাভাব যেখানে নিরুদ্বেগে মানুষের দুর্ভাগ্য রচনা করিতেছে—যেখানে লক্ষ কোটি মানুষ তাহার পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে প্রতিবাদ করে, অস্বীকার করিতে চায়, কিন্তু অতিক্রম করিতে পারে না—যেখানে এক দিকে চরম ভোগ, অন্যদিকে অনাহার—যেখানে একদিকে প্রচুর বিলাসায়োজন, ভোজ্য পানীয়ের স্তূপ, অন্যদিকে কঙ্কালসার ক্ষুধার্ত্ত দারিদ্র, একদিকে সিংহাসনে মণিমাণিক্যখচিত কুৎসিৎ ব্যাধিজীর্ণ-দেহ রাজ-পুত্তলিকা, অন্যদিকে শিলাসনে কৌপিনসম্বল মোক্ষান্বেষী—যেখানে মানব-সমাজ বিরুদ্ধতায়, বিরোধে অসামঞ্জস্যের চরম সীমায় পৌঁছিয়াছে, সেইখানেই আবার দেখি, সর্ব্বত্যাগী সাধকগণ অকাতরে মানবসেবায় সর্ব্বস্ব উৎসর্গ করিয়া সকল দুঃখ বরণ করিতেছেন। তাঁহাদের কর্ম্মক্ষেত্রে আরাম নাই, আয়েস নাই—আছে দুঃখ, নিন্দা ও ধিক্কার। পাপ ও

অমঙ্গলের সমস্ত অপবিত্র আয়োজনকে ব্যর্থ করিয়া মনুষ্যত্ব ও মাতৃভূমির সেবকগণ সত্যের প্রতি কি জ্বলন্ত বিশ্বাস লইয়া প্রতি নরনারীকে আহ্বান করিতেছেন !

বিংশ শতাব্দীর মানুষের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ তাহাদিগকে আহ্বান করিয়াছিল। এই আহ্বান আমরা প্রতি বর্ষে নূতন করিয়া শুনিয়াছি। আমরা দেখিয়াছি, অকম্পিত পদে নূতন পথের পথিকেরা চলিয়াছে—দৃষ্টি সম্মুখে সম্প্রসারিত !

মানুষের চক্ষু সম্মুখে, পশ্চাতে নহে। কেন তাহারা পশ্চাতে দেখিবে, কেন ফিরিবে ? যে খেলা শেষ হইয়াছে, সে খেলা কেন পুনরায় খেলিবে ? কেন অতীতকে নকল করিবে ? অতি দুর্দ্দম যৌবন কি শৈশবে ফিরিতে পারে ?

বিচার বিশ্লেষণ ? বিশ্লেষণ জাতিকে নূতন আশায় সঞ্জীবিত করিতে পারে না। উহা আত্মবঞ্চকের বিলাপধ্বনি। বিশ্লেষণ ধ্বংসমুখী, বন্ধ্যা। বিশ্লেষণ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, আদর্শকে বঞ্চনা করিবার অপকৌশল। এই বিশ্লেষকমণ্ডলী নৈরাশ্যের অস্ত্রে আত্মহত্যা করিয়া নরপ্রেত সাজিতেছে। আদর্শভ্রষ্টতায় অধঃপতনের মধ্যে স্বার্থান্ধ কাড়াকাড়ি, জনসেবার নামে অতি-কলুষিত আত্মপরায়ণতা, শাঠ্য ও প্রবঞ্চনার প্রতিক্রিয়ামুখে এক সংশয়সঙ্কুল চিন্তার দৈন্য।

পাশাপাশি এই দুই দৃশ্য—কিন্তু অনন্তকালের পটভূমিকায় আজিকার দিনের এই ইতিহাসটুকু কত সামান্য, কত তুচ্ছ। ইহা আবরণ—এইরূপ কত আবরণ বিদীর্ণ করিয়া সত্যের অভ্যুদয় ! এই অভ্যুদয়ের যাঁহারা উত্তরসাধক, মানবপ্রেমিক এই সকল নরকেশরীর নির্ম্মল ললাটের জয়-তিলক ঈশানের তৃতীয় নয়নের মত এই অন্ধকারেও জ্বলিতেছে ! কি দুঃসহ তার দাহ ! পুরাতন বর্ষের সমস্ত গ্লানি ভস্ম হইয়া গেল !

হে নবদেব, বর্ষশেষের এই রাত্রিতে চরাচরে তোমারই বন্দনাগীতি শুনিতেছি। তোমার পদস্পর্শে ধরণী রোমাঞ্চিত। তোমার দক্ষিণ হস্তের দৃঢ় মুষ্টিতে ধৃত উজ্জ্বল প্রভাময় সত্যের খড়্গ অন্ধকারেও ঝলসিয়া উঠিয়াছে ; তুমি আঘাত কর, ছিন্নভিন্ন হইয়া যাক অবসাদ, দ্বিধা আর আত্মঅবিশ্বাসের বন্ধন। তোমার ব্রত বীরের ব্রত। সেই দুঃখ-ব্রতে আমাদের দীক্ষা দাও।

১৩ই এপ্রিল ১৯৩৪

নববর্ষ

নববর্ষের প্রভাতে হে মহাকাল, তোমাকে বন্দনা করি।

তোমার আরম্ভ নাই, শেষ নাই, ক্ষয় নাই, বৃদ্ধি নাই, অনাদ্যন্ত সৃষ্টির প্রবাহ তুমিই ধারণ করিয়া আছ, মহাব্যোম যেমন করিয়া এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডকে ধারণ করিয়া আছে। তবুও আমরা যে তোমাকে বিচ্ছিন্ন, বিভক্ত, খণ্ডবিখণ্ড করিয়া দেখি সে কেবল আমাদের সীমাবদ্ধ মানব-জ্ঞানের অক্ষমতা। অনন্তকে সান্ত না করিয়া আমরা ধারণা করিতে পারি না, অরূপকে রূপের মধ্যে না দেখিলে আমাদের মন তৃপ্ত হয় না।

সেইজন্যই পুরাতনের এক অধ্যায় বিস্মৃতির গর্ভে বিসর্জ্জন দিয়া আমরা নূতনকে আবাহন করিতে চাই। সহস্র অভাব, দুঃখ, দৈন্য, রোগ-শোকের ভিতর দিয়া রক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষত চরণে যে পথ অতিক্রম করিয়া আসিয়াছি, কল্পনা করি, সে পথ বুঝি শেষ হইল—সম্মুখে অনন্ত আশা, অসীম উৎসাহ, অফুরন্ত কর্ম্মোদ্যম। জীবনের সেই নূতন অধ্যায়ে অতীতের সমস্ত পরাজয়ের গ্লানি মুছিয়া যাইবে, সমস্ত ব্যর্থতা সাফল্যের গৌরবে ভরিয়া উঠিবে, নৈরাশ্যের বেদনা নূতন স্বপ্নের মধ্যে সার্থকতা লাভ করিবে। এমনই মানুষের জীবন, নিষ্ঠুর বাস্তবের সঙ্গে এমনই ভাবে তাহার বিরোধ সংঘর্ষ চিরদিনই চলিয়াছে—জড়তার সঙ্গে, মৃত্যুর সঙ্গে, অশ্রান্ত ভাবে তাহাকে সংগ্রাম করিতে হইতেছে। এই সংগ্রামে যখনই সে ক্লান্তি অনুভব করে, চিত্তে শ্রান্তি দেহে অবসাদ ঘনাইয়া আসে, তখনই মৃত্যুর বিভীষিকা তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। তখন হে মহাকাল, তোমার নিয়ত ঘূর্ণ্যমান রথচক্র তাহাকে ক্ষমা করে না।

আজিকার এই সূর্য্যকরোজ্জ্বল প্রভাতে পরাজয় আমরা কিছুতেই মানিয়া লইব না, নৈরাশ্যকে হৃদয়ে স্থান দিব না, দুঃখের আঘাত অকুণ্ঠিত চিত্তে বরণ করিয়া লইব। জানি, এ দেশ দুঃখ দৈন্য দারিদ্র্যের ভারে পীড়িত—জানি, রোগ শোক ব্যাধির অন্ত নাই—পরাধীনতার শৃঙ্খল আমাদের চরণে কঠিন হইতে কঠিনতর হইয়া উঠিতেছে। একটা স্বাধীন জাতি যে আশা, যে আনন্দ, যে উৎসাহ লইয়া নববর্ষের উৎসব করে, আমরা তাহা করিতে পারি না—আমাদের চারিদিকে বাধার প্রাচীর, সংশয় ও সন্দেহে পদে পদে আমাদের মনুষ্যত্ব সঙ্কুচিত, গতি-পথ নিরুদ্ধ। তবু এই নৈরাশ্যের অন্ধকারের মধ্যেই আমরা জ্বালাইয়া তুলিব আশার আলোক, দুঃখের মধ্যেই হইবে আমাদের উৎসবের আয়োজন। রুদ্রের ভ্রূকুটি-কুটিল করাল মূর্ত্তিতে আমরা ভয় পাইব না, তাঁহার যে তৃতীয় নেত্র তাহারই মধ্যে আমরা বরাভয়ের সন্ধান করিব। কাল-বৈশাখীর প্রলয়-ঝঞ্চা যদিই বা আসে, তাহার বজ্রঝঙ্কৃত ভ্রূকুটি দেখিয়া আমরা অভিভূত হইব না। নিশ্চয় করিয়া জানিব, ঝড়ের প্রতিকূলেই আমাদের যাত্রা, সর্ব্ব-মানবের প্রতি প্রেম আমাদের পাথেয়। অনেক-দিনের পুরাতন বন্ধনপাশ ছিন্ন হইবে, বিচ্ছেদকে স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইব না। যাহা জরাজীর্ণ যাহা অসুস্থ চিন্তার বিকৃত সঞ্চয়, পুরাতন ও প্রাচীন বলিয়াই তাহার প্রতি মমত্ব দেখাইব না, উহা কালের আঘাতে খসিয়া ঝরিয়া ভাঙ্গিয়া চলিয়া যাইবে। লোকনিন্দায় ভীত হইব না, অপ্রিয় সত্য বলিতে দ্বিধা করিব না। আমাদের স্বদেশবাসীকে নির্ভয়ে ডাকিয়া বলিব, যাহারা স্বার্থ ও শাঠ্যকে স্বদেশপ্রেমের ছদ্মবেশ পরাইয়া তোমাদের সাধনাকে বারংবার ব্যর্থ করিয়াছে তাহাদের অস্বীকার ও অতিক্রম করিবার দিন আসিয়াছে। আজিকার নববর্ষের প্রভাতে একটা অতিক্রান্ত যুগের ধ্বংসের মহাশ্মশানে বসিয়া দেখিতেছি, দিগন্তপট

বিদীর্ণ করিয়া মহাকালের কত অভাবনীয় আবির্ভাব! হিংসা, হত্যা, লুণ্ঠন পীড়িত মানব-সমাজের কল্যাণ-সম্পদকে রক্ষা করিবার জন্য দেশে দেশে যে শুভবুদ্ধি জাগ্রত হইতেছে, তাহাকে জয়শঙ্খধ্বনিতে অভ্যর্থনা করিবার জন্য আজ আমরা নূতন করিয়া সঙ্কল্প গ্রহণ করিব।

আজিকার এই নির্ম্মল আকাশ, প্রশান্ত দিক, নদী-মেখলা বনরাজি-নীলা বাঙ্গলার শ্যামল কান্তি, আম্রবন-ঘেরা পল্লীর শান্ত সুষমা—ক্ষণকালের জন্য আর সব ভুলিয়া তাহারই মাধুর্য্য আমরা সমস্ত অন্তর দিয়া পান করি—কামনা করি, বাঙ্গালীর গৃহ শ্রী ও সম্পদে মণ্ডিত হোক, তাহার চিত্ত নূতন বীর্য্যে, নূতন উৎসাহে পূর্ণ হোক, মানবতার কল্যাণ-হস্ত তাহাকে আশীর্ব্বাদ করুক। ব্যক্তির জীবনের মত জাতির জীবনও জয়-পরাজয়, উত্থান-পতন, আশা-নিরাশা, সাফল্য-ব্যর্থতার মধ্য দিয়া তরঙ্গের গতিতে নিয়ত অগ্রসর হইতেছে। এই শাশ্বত গতিকে আজ যেন আমরা সমস্ত অন্তরের সঙ্গে অনুভব করি এবং যাত্রাপথে তাহাকে বরণ করিয়া লইতে পারি। নববর্ষ আমাদের সমস্ত কামনাকে পূর্ণ না করিতে পারে, ক্ষতি নাই, আমরা যেন কিছুতেই পরাভব স্বীকার না করি।

১লা বৈশাখ, ১৩৪১

পঞ্চাশৎ জন্মদিন

জন্মদিন। একালের ছেলেমেয়েরা জন্মদিন সম্বন্ধে বেশ কৌতূহলী। অতি সাধারণ ঘরেও ছোটদের জন্মদিনের অনুষ্ঠান হয়। ছেলেমেয়েরা উপহার পায়; পরিবারের আত্মীয়বন্ধুরাও পুতুল এবং ঐ শ্রেণীর উপহার দিয়া থাকেন। এই কারণে শিশুরা জন্মদিনটা স্মরণে রাখে। কিন্তু আমাদের আমলে এ রেওয়াজ ছিল না। পল্লীগ্রামে বৃহৎ একান্নবর্ত্তী পরিবারের পঁচিশ-ত্রিশটি নানা বয়সের ছেলেমেয়ের মধ্যে আমি এমন কিছু অসামান্য ছিলাম না যে আমার জন্মদিনে পারিবারিক একটা বিশেষ উৎসব হইবে। বড় হইয়া গান্ধিজী বা রবীন্দ্রনাথের মত বৃহৎ হইতে পারি নাই যে, বহুলোক জন্মদিনে শ্রদ্ধার অর্ঘ্য দিবে অথবা সংবাদপত্রে প্রশস্তি রচিত হইবে। জননীর নিকট শুনিয়াছিলাম, ফাল্গুনী-পূর্ণিমায় আমার জন্ম। ঐ বিশেষ দিনটায় জন্মিয়া তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুন হইতে শ্রীগৌরাঙ্গ পর্য্যন্ত অনেকেই মহাপুরুষ হইয়াছেন; কৈশোরে এই চিন্তা মনে একটু গৌরব ও গর্ব্বের উদ্রেক করিত। কিন্তু বড় হইয়া বুঝিয়াছি যে, জন্ম মৃত্যুর মতই অনিশ্চিত এবং কোন দিনের সহিত আর এক দিনের তফাৎ নাই। পঞ্জিকায় লিখিত গ্রহনক্ষত্রের ষড়যন্ত্রের সঙ্গে মানব-জীবনের নিগূঢ় সম্পর্কের মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া পরে আর জন্মদিনে কোন গুরুত্ব আরোপ করি নাই। বলিতে কি, জন্মদিন অপেক্ষা বাল্যকালে পূজা দোল এবং অন্যান্য ছুটির দিনগুলিই বিশেষ প্রার্থিত ছিল। বিদ্যালয়ের ছাত্র কি মোহময় ভাবাবেগ লইয়া ছুটির দিনের প্রত্যাশা করে, তাহা ভুলিবার নহে।

কিন্তু আজিকার কথা স্বতন্ত্র। এককালে ঘনিষ্ঠ পরে মাত্র পরিচিত ব্যক্তিকে অকস্মাৎ দেখিলে সামান্য শিষ্টাচার দেখাইয়া পর মুহূর্ত্তে লোকে

যেমন ভুলিয়া যায় তেমনি অনেক জন্মদিন আমার জীবনে আসিয়াছে, গিয়াছে। কিন্তু পঞ্চাশৎ জন্মদিনটিকে জীবনের একটা বিশেষ ঘটনা না মনে করিয়া পারিতেছি না। পঞ্চাশ! ইহার সহিত মাত্র বিশ বৎসর যোগ করিলে সত্তর—বাঙ্গালীদুর্লভ পরমায়ু। মাত্র আর বিশবার বসন্ত আসিবে, কোকিল ডাকিবে, কালবৈশাখীর ঝঞ্ঝা ও বৃষ্টি রুদ্রনৃত্য করিবে, বর্ষার পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ আকাশে ও মনে ঘনগম্ভীর মায়া রচনা করিবে! পিছনের বিশ বৎসরের দিকে চাহিয়া দেখি—উদ্দাম, উচ্ছৃঙ্খল অশান্ত জীবন কেমন অবলীলাক্রমে বহু বন্ধ অতিক্রম করিয়া খরস্রোতা তটিনীর মত বহিয়া আসিয়াছে। যাত্রার দিনে এই পঞ্চাশের বন্দর কতদূর ছিল! "সেই যৌবনবেদনারসে উচ্ছল দিনগুলি" যে পঞ্চাশে আসিয়া পৌছিবে, এমন চিন্তা করিবার সময়ও ছিল না। ফুল কুড়াইয়া, কাঁটায় আহত হইয়া, হাসি ছড়াইতে ছড়াইতে কেমন সহজে চলিয়া আসিলাম! এখন আর যুবা নাহি—এই জন্মদিন আমাকে বুড়োদের শ্রেণীতে উত্তীর্ণ করিয়া দিল। আজ হইতে আমি প্রাচীন এবং প্রবীণ।

লোকে যাহাই বলুক, পঞ্চাশ বৎসর বয়সে নিজেকে প্রাচীন বা প্রবীণ বলিয়া মনে হইতেছে না তো! যেমন যুবক ছিলাম তেমনি আছি। মনে আশঙ্কা ছিল, মধ্য বয়সে আসিয়া আমাদের দেশের সাধারণ প্রৌঢ় ভদ্রলোকদের মত গম্ভীর হইয়া পড়িব; হায়রে সেকাল বলিয়া বিলাপ করিব এবং গোপন-বিলাস ও পুরাতন খেলনাগুলির জন্য দীর্ঘশ্বাস ফেলিব। এই ভীতি যৌবনেই জাগাইয়াছিলেন দ্বিজেন্দ্রলাল,—

"এখন চোখে ঝাপ্‌সা দেখি
মনের মধ্যে করি বাস,
এখন শুধু চিন্তা আসে
ঘনিয়ে উঠে দীর্ঘশ্বাস!"

যে সুখ মিটে নাই, যাহা পাই নাই, এখনি সব কথা স্মরণ করিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলা তো দূরের কথা, এখনও পূরবীর চেয়ে ভৈরবীর সুরই মনে মনে ভাঁজিয়া চলিয়াছি! যুবারা একথা শুনিয়া হয়তো বিদ্যাসুন্দরী স্থূল রসিকতা করিয়া বলিবেন—

"আছিল বিস্তর রস প্রথম বয়সে,
এবে বুড়া, তবু কিছু গুড়া আছে শেষে!"

গুড়া নহে। সবই ঠিক আছে, তবে রুচি বদলাইয়াছে। তোমাদের মত সাঁতার দেই না, ঘোড়ায় চড়ি না; কারণ আমি আবিষ্কার করিয়াছি যৌবন কেবল ঐ শ্রেণীর কাজের উপর নির্ভর করে না। আমার পক্ষে যাহা করা সম্ভব আমি তাহা লইয়াই তৃপ্ত। অশ্বারোহণ করিবার ক্ষমতা অপেক্ষাও যৌবনের অনুভূতি অধিকতর গভীর। আঠারো বৎসরের অনুভূতি আশী বৎসরেও সমান তীব্র থাকে, কেবল উহার প্রকাশভঙ্গী বদলায় মাত্র—ইহা তো আমরা রবীন্দ্রনাথের মধ্যেই প্রত্যক্ষ করিলাম। গান্ধিজীর মত অতি বড় মহতের কথা ছাড়িয়া দিলেও, ৬৪ বৎসর বয়সের ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়কে কে বুড়া বলিতে সাহস করিবে? ষাটের কোঠায় আসিয়াও কর্ম্মব্যস্ত শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার যে কোন যুবককে লজ্জা দিতে পারেন। ৫৪ বৎসরে জওহরলালের ধূমলেশহীন দীপশিখার মত দীপ্ত যৌবন, ২৪ বৎসরের যুবার ঈর্ষা উদ্রেক করিতে পারে। বৌদিদির (দ্বিতীয়া) মনোরঞ্জনের জন্য প্রত্যহ সকাল-সন্ধ্যায় গণ্ডদেশ হইতে বিরক্তিকর শ্বেত কুশাঙ্কুর উৎপাটনকারী শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি বসুকে কেহ বুড়া বলিলে আমি তাহাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করিতে রাজী আছি। বিনয়ী ও বৈষ্ণব শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার সরকারের বিশ বৎসরের যৌবন দম-দেওয়া দামী ঘড়ির মত ৬০-এর কাছাকাছি আসিয়াও বেদান্তের

ব্রহ্মের মত আপনাতে আপনি অটল! দৃষ্টান্ত বাড়াইয়া লাভ নাই, বয়স মানুষকে বুড়ো করিতে পারে না।

আসলে 'যৌবন দৈহিক ব্যাপার নয়—একটা অনুভূতিময় মানসিক অবস্থা মাত্র। ইহা আমার নিজের কথা নহে, দস্তুরমত বঙ্গীয় যুব-সম্মেলনের অধিকাংশের ভোটে গৃহীত প্রস্তাব। বন্ধুবর ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত যখন বিদেশ হইতে ফিরিয়া (১৯২৭-২৮ ?) বাঙ্গলায় যুব-আন্দোলনের সূত্রপাত করিলেন, তখন একদা প্রভাতে কৃষ্ণনগর প্রাদেশিক যুব-সম্মেলনের বিষয়-নির্ব্বাচনী সমিতিতে প্রশ্ন উঠিল কোন্ বয়স পর্য্যন্ত সদস্য লওয়া হইবে? যৌবনের পূজারী শরৎচন্দ্র চ্যাটার্জ্জী আছেন, রসিক-চূড়ামণি শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আছেন। অবশেষে সেক্রেটারী বন্ধুবর নরেশ সেন নিয়মতন্ত্রে লিখিলেন, "তাঁহারাই সদস্য হইবেন যাঁহারা যুবক এবং যাঁহারা যৌবন অনুভব করেন (Those who feel young)"! মনের দিক দিয়া পঁচিশ বৎসর বয়সেই কেহ পক্ককেশ, আবার আশী বৎসর বয়সেও কেহ ভ্রমরকৃষ্ণ কুঞ্চিত কেশদামে শোভিত। চুলের উপমাটা মনে হইল বায়রণের ৩৪ বৎসর বয়সে লেখা একটি কবিতা স্মরণে,—

"ছিলাম আগুন, এখন হয়েছি ছাই,
মর্ম্মের মাঝে পরাণ মরণাহত;
প্রিয় ছিল যাহা তাহা শুধু লাগে ভাল,
চিত্ত আমার পাংশু কেশেরই মত!"

ইহা কবিসুলভ অত্যুক্তি—বায়রণের জীবনের নাটকীয় ভঙ্গী! তবুও বেদনার সহিত স্মরণ করিতে হয়, এই "জীর্ণ খাঁচার গড়ুড় মহান" মাত্র ৩৬ বৎসর বয়সেই চিরনিদ্রায় অভিভূত হইয়াছিলেন। দেবদুর্লভ রূপ আর নরদুর্লভ প্রতিভার অধিকারী হইয়াও বায়রণ নিজেকে ৩৪

বৎসর বয়সে বৃদ্ধ বলিয়া বিলাপ করিয়াছেন, আর আমাদের কবি রবীন্দ্রনাথ প্রথম পক্ককেশ দেখিয়া শুভ্র হাস্যরস বিকীর্ণ করিয়া বলিয়াছেন,—

"কেশে আমার পাক ধরেছে বটে,
তাহার পানে নজর এত কেন?
পাড়ার যত ছেলে এবং বুড়ো
সবার আমি এক বয়সী জেনো।"

বুড়া বয়স চিন্তা করিতে গিয়া অনেকেই ভুল করেন শরীরের সঙ্গে সঙ্গে প্রাণশক্তিও নিশ্চয়ই ক্ষয়িষ্ণু হয়! অবশ্য শরীর অবহেলা করিলে অথবা অমিতাচারে মানসিক শক্তি ক্ষয় হয়। কিন্তু স্বাভাবিক দৈহিক পরিণতির পরিবর্ত্তন-সঞ্জাত বয়োধর্ম্ম বলিষ্ঠ প্রাণশক্তির উপর রেখাপাত করিতে পারে না; বরং যে কামনা উগ্র আবেগে আলোয়ার মত জ্বলিয়া নিভিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিত, তাহা স্থিরভাতি বহ্নিশিখার মত দীপ্যমান হইয়া উঠে। যৌবনের এই রহস্য যে জানে সে চুলে কলপ দিয়া বা বিজ্ঞাপন দেখিয়া চব্বিশ ঘণ্টায় যৌবন-প্রাপ্তির বটিকা সেবন করিয়া নকল যৌবনের লোভে আত্মপ্রতারণা করে না। কথাটা উপদেশের মত শুনাইল, কিন্তু যে অর্দ্ধ শতাব্দী অতিক্রম করিয়াছে উপদেশ তাহার মুখে খুব বেমানান নয়। আমার সত্তর বৎসর বয়সের এক যুবা বন্ধু একদিন বলিয়াছিলেন, আমার হৃদয় এখনও যুবক এবং সজীব রাখিয়াছি, আমি অতীত লইয়া মাথা ঘামাই না; মনোরাজ্যে অতীতের মধ্যে বাস করি না; আমার চারিদিকে কল্লোলিত জীবনস্রোতের কলধ্বনির সহিত সুর মিলাইয়া চলি।

আসল কথা, জীবনের সব বয়সেরই একটা বিশেষ সার্থকতা আছে। জীবনের প্রত্যেক স্তরই উপভোগের; তুলনায় কোনটি মন্দ সে বিচার না করিয়া আমি যেখানে আসিয়াছি তাহার প্রতিই আমি অনুরাগী। বিশ

বৎসর বয়সে ভাবিতাম বিশ বৎসরই সুন্দর; আজ দেখিতেছি পঞ্চাশ বৎসর সুন্দরতর—জীবনকে নিরুদ্বেগে পরিপূর্ণভাবে উপভোগের মনোরম অবকাশ। যদি আমার বয়স কোনদিন পাড়ি দিয়া ষাটের বন্দরে উপস্থিত হয়, তবে ষাট বৎসরকেও বন্দনা করিয়া বলিব, তুমি সুন্দরতম! প্রভাতের সূর্য্য, রজনীর চন্দ্রমা, নবাগত তরুণ মানুষের বুদ্ধির দীপ্তিতে উজ্জ্বল মুখ চিরদিনই আমার জীবনকে আপ্লুত করিবে। পঞ্চাশ বৎসরের এই বিচিত্র জীবনের সঞ্চয়-সঞ্চিত হারাইয়া ক্ষয়ক্ষতির হিসাব না করিয়া আমার শুভ্র হাস্যকে অম্লান রাখিয়াছি; ইহাই আমার গৌরব। এই গৌরবেই কবির সহিত ঘোষণা করিতে পারি,—

নাই বা জান্‌লি হায়রে মূর্খ!
কি হবে তোর হিসাব সূক্ষ্ম!

* * *

যত পার ততই ভোল
বিফল সুখের বিরাট দুঃখ।
জীবনখানা খুল্লে তোমার
শূন্য দেখি শেষের পাতা;
কি হবে ভাই হিসেব নিয়ে,
তোমার নয়কো লাভের খাতা।

ফাল্গুনী পূর্ণিমা, ১৩৪৯।

বই

বাড়ী বদলাইয়া নূতন বাড়ীতে উঠিয়া আসিয়াছি, হরেক রকম লটবহরে ভরা ঠেলা গাড়ীগুলি রাস্তার উপর আসিয়া পড়িয়াছে। প্রতিবেশী এবং প্রতিবেশিনীরা কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টিতে নূতন ভাড়াটের আসবাবপত্র দেখিয়া ভাবী প্রতিবেশীর প্রতিষ্ঠা বা মর্য্যাদা বিচার করিতেছেন। সমস্ত আসবাব ছাপাইয়া উঠিয়াছে স্তূপাকৃতি বইএর গাদা। সাধারণ গৃহস্থ-পরিবারে এত বইএর প্রয়োজন কিসের—এমনি একটা প্রশ্নের ভঙ্গী লইয়া পাশের বাড়ীর একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক আগাইয়া আসিলেন। দু'একটি সাধারণ কথার পর ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করিলেন, "পুরোনো বইএর ব্যবসা আছে বুঝি?" একটু বিব্রত হইয়া বলিলাম, "আজ্ঞে না, চাকুরী করি।" যে চাকুরী করে তাহার যে এতগুলি বই থাকিতে পারে অথবা থাকা উচিত ভদ্রলোক ইহা কখনও চক্ষে দেখিবেন এমন প্রত্যাশা করেন নাই। অবশ্য আমার গ্রন্থ-সংগ্রহ এমন কিছু জাঁক করিয়া বলিবার নয়। কেনা ও উপহার পাওয়া বই—দীর্ঘ ২৫-৩০ বৎসরে ক্রমে জমিয়াছে। মাঝে মাঝে ঝাড়াই বাছাই করিয়া স্থানাভাবে বাজে বই ফেলিয়া দিয়াছি, অনেক বই চুরি গিয়াছে। কত বই বন্ধু ও পরিচিতরা পড়িতে লইয়া ফিরাইয়া দেন নাই। তবুও যাহা জমিয়াছে, তাহার পরিমাণ নিতান্ত কম নয়। অনেক সময় টাকার অভাবে অনেক ভাল বই কিনিতে পারি নাই। কিন্তু একথা কখনও ভাবি নাই যে সাধারণ মধ্যবিত্ত ভদ্রগৃহে এটা একটা বাহুল্য ব্যাপার। পরে দীর্ঘ অভিজ্ঞতা হইতে বুঝিয়াছি, বাঙ্গলার শিক্ষিত ভদ্র-সমাজের গৃহে এটা সচরাচর ঘটনা নয়।

কলিকাতা সহরের ধনী ও বড়লোকেরা এবং স্বচ্ছল গৃহস্থ, যাঁহারা নূতন নূতন ফ্যাসানের বাড়ীতে কলিকাতার সহরতলী উজ্জ্বল করিয়াছেন, বহু অর্থ ব্যয় করিয়া দেশী ও বিলাতী বিবিধ আসবাবে গৃহ সজ্জিত করিয়াছেন—যাঁহারা পরস্পরের সহিত পাল্লা দিয়া মার্জ্জিত রুচির পরিচয় দিয়া থাকেন তাঁহাদের মধ্যে শতকরা পাঁচজনেরও বই সংগ্রহ বা কয়েক আলমারী ভাল বই রাখিবার ইচ্ছা নাই। পিতলের টবে গাছ, চিনামাটির বাসন, হরেক রকমের মেহগনি কাঠের আসন, চেয়ার, টেবিল, কৌচ, নানা আকারের ঘড়ি, সবই আছে, নাই কেবল বই। কোন ঘরে কিছু ভাল বই সংগ্রহ করিয়া রাখা যে দরকার ইহা কাহারও মনে পড়ে না। কলিকাতা সহরে যাঁহারা বনিয়াদী বড়লোক —ব্যবসায়ী বা জমিদার—যাঁহাদের পিতামহ প্রপিতামহদের আমলে শাসক ও সওদাগর শ্রেণীর সাহেবদের পালপার্ব্বণে অথবা সামাজিক ব্যাপারে নিমন্ত্রণ-আমন্ত্রণ হইত—তাঁহাদের অনেকের বসিবার ঘরে কয়েক আলমারী বা তাকে সুসজ্জিত বই দেখা যায়। এগুলি পড়িবার বই নহে, দেখাইবার বই। সমান মাপের এনসাইক্লোপেডিয়া, ডিকেন্স বা স্কটের ভাল সংস্করণের বই সাজাইয়া রাখা হইয়াছে। ভৃত্যরা ধূলা ঝাড়িয়া উহা পরিষ্কার রাখে। গৃহস্বামী ভুলিয়াও কখনও উহা পাঠ করেন এমন প্রমাণ নাই। ইহাদের অনেকেরই কলিকাতার সহরতলীতে বড় বড় বাগানবাড়ী আছে। প্রমোদ অথবা বিশ্রামের জন্য এগুলি রাখা হয়। ইহার মধ্যে কতকগুলি নামকরা বাড়ী আমি দেখিয়াছি— দামী কার্পেট, বড় বড় আয়না, সোনালী বড় বড় ফ্রেমে ছবি— কত বিচিত্র উপকরণ ও সাজসজ্জা—কিন্তু ইহার আনাচ-কানাচ কোথাও এক আধ আলমারী বই মিলিবে না।

ব্যতিক্রম সব কিছুরই আছে। তবে সাধারণতঃ বাঙ্গালী ভদ্র

সমাজ বই সম্পর্কে উদাসীন। যাঁহারা হাজার দুই হাজার টাকা দিয়া বিলিয়র্ড-টেবিল কেনেন—পিয়ানো, অর্গ্যান, রেডিয়ো, গ্রামোফোন কিনিতে অজস্র অর্থব্যয় করেন, তাঁহারা জগতের শ্রেষ্ঠ কবি, সাহিত্যিক ও চিন্তাবীরদের রচনা সংগ্রহ করিতে সামান্য অর্থও ব্যয় করেন না। কলিকাতা সহরের পুস্তক-ব্যবসায়ীরা জানেন যে কোন্ শ্রেণীর লোক তাঁহাদের খরিদ্দার। শিশু-সাহিত্য ও স্ত্রী-পাঠ্য উপন্যাসের কিছু কাটতি আছে। এ দেশে সাহিত্যিক বলিতে গল্প ও উপন্যাস লেখকই বুঝায়। দর্শন, ইতিহাস, অর্থনীতি, রাজনীতি প্রভৃতি ভাল বই প্রকাশকেরা প্রকাশ করিতে চাহেন না; করিলেও তাহা যে বিকাইবে না, তাহা তাঁহারা জানেন। সহরে ও মফঃস্বলে কতকগুলি পাঠাগারের কল্যাণে যে শ্রেণীর বই বেশী বিকায়, তাহা আর যাহাই হউক, শিক্ষিত বাঙ্গালীর উচ্চশ্রেণীর রসবোধের পরিচায়ক নহে।

কলিকাতার বাহিরে মফঃস্বলের কোন ছোট-বড় সহরে ভাল বইএর দোকান নাই বলিলেই হয়। স্কুলপাঠ্য পুস্তকের জন্য দু'একখানা দোকান চলে মাত্র। একবার মফঃস্বলের কোন সহরে এক বড় উকীলের বাড়ীতে মধ্যাহ্নভোজনের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়াছিলাম,—রান্নার দেরী আছে দেখিয়া বাড়ীর একটি ছেলেকে একখানা পড়ার বই দিতে বলিলাম। সে কুণ্ঠিত ও বিব্রত হইয়া উঠিল। আমি উৎসাহ দিয়া বলিলাম, যা হোক একটা কিছু। সে কিছু ইতস্ততঃ করিয়া পাশের ঘর হইতে একখানা পঞ্জিকা আনিয়া সলজ্জ সঙ্কোচে আমার হাতে দিল। সামর্থ্যের অভাব নহে, আগ্রহ ও রুচির অভাবেই এই শ্রেণীর স্বচ্ছল ভদ্রলোকেরাও বই কেনেন না। স্ত্রীর গহনা হইতে মোটরগাড়ী ক্রয়ে যাঁহারা মুক্তহস্ত তাঁহারা নিশ্চয়ই বাজে খরচের অজুহাতে বইএর প্রতি উদাসীন নহেন। আসলে তাঁহাদের রস-পিপাসা ও জ্ঞান-পিপাসা জীবন্মৃত। বাঙ্গালী

তাহার দৈহিক লজ্জা নিবারণের জন্য বৎসরে ১৫।২০ কোটি টাকার কাপড় ক্রয় করে; কিন্তু তাহার মানসিক দীনতা ঢাকিবার জন্য কত টাকা বই এ খরচ করে!

গৃহ-সজ্জার আসবাব হিসাবে ধরিলেও,—বইএর সৌন্দর্য্যও কম নহে। দামী ও চটকদার আসবাবে গৃহস্বামীর অভিমান ও ঐশ্বর্য্যের দীপ্তি প্রকাশ পায়; কিন্তু পছন্দমত পুস্তক-সংগ্রহে তাঁহার রুচির একটা অনন্যসাধারণ আভিজাত্য প্রকাশ পায়। ধনী-শ্রেণীর নকলনবিশীর সস্তা নিদর্শন ইহাতে নাই। কোন কক্ষের এক কোণে যদি কয়েক থাক বই থাকে, তবে তাহা এক অনুপম বৈশিষ্ট্যে অনুরঞ্জিত হইয়া উঠে। দেখিবামাত্র গৃহস্বামীর একটা পরিচয় আগন্তুকের মনে অঙ্কিত হইয়া যায়। আমি নিজের অভিজ্ঞতা হইতেই ইহা বলিতেছি। অনেকের পাঠাগারে অপেক্ষা করিবার সময় আমি স্বাভাবিক কৌতূহলেই সর্ব্বাগ্রে উঠিয়া বইগুলি পরীক্ষা করি, নাড়িয়া চাড়িয়া দেখি এবং সঙ্গে সঙ্গে যাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছি, তাঁহার চরিত্র ও মানসিক অবস্থা সম্বন্ধে মনে একটা ধারণা জন্মিয়া যায়। সাক্ষাতের সময় তাঁহাকে খুব বেশী অপরিচিত বলিয়া মনে হয় না। আলাপ করাও সহজ হইয়া উঠে। গৃহিণীহীন গৃহ যদি শ্মশান হয়, তাহা হইলে গ্রন্থাগারহীন গৃহ মরুভূমি। আসবাসপত্র দেখিয়া কে কত ধনী তাহা অনুমান করা যাইতে পারে—কিন্তু সংগৃহীত পুস্তক হইতেই কেবল তাহার মনের পরিচয় পাওয়া যায়। একবার দক্ষিণ কলিকাতার কোন ধনী তাঁহার নবনির্ম্মিত ভবন দেখিবার জন্য কয়েকজন বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। সমস্ত কক্ষ ঘুরিয়া লাইব্রেরীর কোন সন্ধান পাইলাম না। গত বিশ বৎসর কারবার করিয়া ইনি বিপুল বিত্ত সঞ্চয় করিয়াছেন—সমাজে প্রতিষ্ঠা প্রতিপত্তিও অল্প নহে। এহেন আধুনিক ভদ্রলোক

নিতান্ত নির্লজ্জের মত বলিলেন, ও সব বাজে জিনিষ…! নিজের দারিদ্র্যকে তিনি নিজেই স্থূল অহঙ্কারে প্রকাশ করিলেন।

প্রশ্নটা টাকা নহে। গৃহসজ্জায় পুস্তকই হইল সর্ব্বাপেক্ষা সুলভ এবং সর্ব্বাধিক সুন্দর। মাসে দুই টাকা হইতে ২০৷২৫ টাকা খরচ করিলেই ক্রমে একটি ভাল গ্রন্থাগার গড়িয়া উঠিতে পারে। আজকাল জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্য-সম্পদের সস্তা সংস্করণ আট আনা হইতে এক টাকা দু' টাকায় সংগ্রহ করা যায়। একশ' টাকা খরচ করিলে যে কেহ অনেক ভাল ভাল বই সংগ্রহ করিতে পারেন। যদি আপনার নিজের পড়িবার রুচি ও প্রবৃত্তি না-ও থাকে, তাহা হইলেও উহা আপনার সন্তানদের উপকারে আসিবে। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতেই এ-কথা বলিতেছি। শৈশবে পিতৃহীন হইয়া উত্তরাধিকারসূত্রে পাইলাম—আমার পিতার সংগৃহীত দুই আলমারী বই। ডারুইন, নিউটন, স্পেন্সার, স্পিনোজা, কাণ্ট, হেগেল প্রভৃতি পণ্ডিতগণের মোটা মোটা ইংরাজী বই-এর সহিত বাঙ্গলা মহাভারত, রামায়ণ, পুরাণ এবং সাপ্তাহিক সংবাদপত্রের উপহার গ্রন্থাবলী। 'হিতবাদী'র রবীন্দ্র-গ্রন্থাবলী, 'বসুমতী'র বঙ্কিম-সাহিত্য, মাইকেল, হেমচন্দ্র, নবীন সেনের কাব্য কিশোর বয়সেই মনকে গভীরভাবে আপ্লুত করিয়াছিল। শিক্ষা-সংস্কৃতির আলো-হাওয়া হইতে বঞ্চিত সেই দূর পল্লীভবনে আমার মহানুভব পিতা আর কিছুই দেন নাই, কিন্তু তিনি আমার জন্য জগতের দ্বারবাতায়ন উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন।

তথাকথিত শিশু-সাহিত্যের উপর আমার আশৈশব একটা বিরাগ আছে। শিশুরা অবোধ, নির্ব্বোধ, চঞ্চল—তাহাদিগকে ছবি, রং আর আজগুবী গল্প দিয়া ভুলাইবার প্রয়াস তাহাদের বুদ্ধি ও কল্পনাবৃত্তিকে অপমান করা। রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প, বাল্মিকী-প্রতিভা, সন্ধ্যাসঙ্গীত প্রভৃতি কাব্যগুলি যে বয়সে আমি তন্ময় হইয়া উপভোগ করিয়াছি,

তাহাতে আমার বদ্ধমূল ধারণা এই যে, যে কোন বুদ্ধিমান কিশোর অতি সহজেই রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও গল্প, বঙ্কিম-বিবেকানন্দের অপূর্ব্ব রচনা হইতে ভাব ও আনন্দরস সংগ্রহ করিতে পারে। পরবর্ত্তী জীবনে ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাইয়াছি। জাতীয় সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য্যই শিশুদের সম্মুখে সাজাইয়া রাখিতে হয়। ইহা তাহাদের উপর চাপাইয়া দিতে নাই; ইচ্ছামত বাছিয়া লইবার স্বাধীনতা ও সুযোগ দিতে হয়। ঘরে লাইব্রেরী থাকিলে বালক-বালিকারা এই সুযোগ পায় এবং শৈশব হইতেই ভাল বই পড়িবার অভ্যাস ও অনুরাগ আয়ত্ত করিতে পারে। রবীন্দ্রনাথের সোনার তরী হইতে পূরবী বা বলাকা হয়তো সাত আট বৎসরের শিশু সমস্ত বুঝিবে না; কিন্তু পদলালিত্য ও শব্দ-ঝঙ্কার তাহার মনকে উচ্চাঙ্গের সৌন্দর্য্যবোধের দিকে জাগ্রত করিবে। নাটক, নভেল পড়িলে ছেলেরা নষ্ট হইয়া যাইবে—অনেকে এই ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া ছেলেদের উপর গোয়েন্দাগিরি করিয়া থাকেন। কিন্তু অভিভাবককে লুকাইয়া নাটক-নভেল-পড়া 'বাঘা ছেলেরাই' বাঙ্গলায় স্মরণীয় ও বরণীয় হইয়াছে, এমন দৃষ্টান্তের অভাব নাই। আর যে সকল মন্দভাগ্য বালক কেবল স্কুলপাঠ্য পুস্তক পড়িয়াছে—প্রথম বয়সে বাড়ীতে কাব্য সাহিত্য ইতিহাসের স্বাদ গ্রহণ করিতে শিখে নাই, মহৎ জীবনী-পাঠ করে নাই তাঁহাদের অনেকে সাধারণ মাপের ধনী ও স্বচ্ছল মানুষ হইয়াছেন; ভাল ডাক্তার, উকীল, হাকিম হইয়াছেন, সন্তানসন্ততির ভবিষ্যৎ নিরাপদ করিবার জন্য বিত্ত ও ঐশ্বর্য্য সঞ্চয় করিয়াও উত্তরাধিকারসূত্রে তাহাদিগকে মানসিক দারিদ্র্যই দিয়া যান। মহৎ প্রতিভার আলোকে কিশোরজীবনের দীপ জ্বালিয়া লইবার দুর্লভ সৌভাগ্য হইতে সন্তানকে বঞ্চিত করা যে কত বড় অপরাধ, মধ্যশ্রেণীর শিক্ষাভিমানী বাঙ্গালী তাহা কবে বুঝিবে?

আশ্বিন, ১৩৪৯

প্রাতরুত্থান

ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে গাত্রোত্থান করিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিবে—শাস্ত্রের অমোঘ নির্দ্দেশ। কেবল আমাদের দেশে নহে, সকল দেশের জ্ঞানীগুণী ধার্ম্মিক ব্যক্তিরা এই উপদেশ দিয়াছেন। বাল্যকালে স্কুলপাঠ্য বিলাতী কেতাবেও দেখিয়াছি,—তাড়াতাড়ি শয্যায় যাইবে এবং সকলের আগে শয্যাত্যাগ করিবে—সুখী ধনী এবং জ্ঞানী হইবার ইহাই রাজপথ। হাজার হাজার বৎসর পূর্ব্বে বন্য ও বর্ব্বর মানুষকে, অন্যান্য পশু পক্ষীর মতই খাদ্যান্বেষণে অধিকাংশ সময় ব্যয় করিতে হইত এবং সন্ধ্যার পূর্ব্বেই নিশাচর হিংস্র প্রাণীদের ভয়ে বৃক্ষশাখা বা গুহায় আশ্রয় লইতে হইত—তাহাদের সূর্য্যোদয়ের কিঞ্চিৎ পূর্ব্ব হইতে নেহাৎ ক্ষুধার তাগিদেই জাগিতে হইত। মানুষের এই যুগযুগান্তের অভ্যাস এবং শাস্ত্রের নির্দ্দেশ ও জ্ঞানীদের উপদেশ অধিকাংশ মানুষ নির্ব্বিবাদে মানিয়া চলে। ভোরে উঠিতে না পারিলে বালকদের অভিভাবকরা তাড়না করেন, যুবকেরা বন্ধুমহলে বিদ্রুপভাজন হয়, কাজের লোকেরা কার্য্যহানির আশঙ্কায় লজ্জিত হন।

কিন্তু অতিশয় মন্দভাগ্য আমি, শাস্ত্র ও মহাজনবাক্য আমার চিত্তে কোন রেখাপাত করে নাই। বাল্যে প্রত্যুষে জাগাইবার চেষ্টা করিলে রুষ্ট হইয়াছি। যৌবনে সূর্য্যোদয়ের এক আধ ঘণ্টা পরে ছাড়া পূর্ব্বে শয্যাত্যাগ করিয়াছি, এমন দিন আঙ্গুলে গণা যায়। প্রতিদিন পাখীর প্রভাত-কাকলী শুনিবার বা প্রথম উষার উদ্ভিন্ন নবারুণ রাগ দেখিবার অথবা ভোরের হাওয়ায় বেড়াইয়া স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য প্রভাতে শয্যাত্যাগ

আমি দেহ ও মনের উপর অত্যাচার বলিয়াই মনে করি। ভোরে শয্যাত্যাগ করিতে আমার ইচ্ছাও করে না, ভালও লাগে না। স্বপ্নহীন গাঢ় নিদ্রার পর যখন ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়, তন্দ্রা ও জাগরণের সেই অবকাশ আমি অর্দ্ধচেতন মন দিয়া গভীরভাবে উপভোগ করি। সেই অবসরে আমার আমিত্ব নিজেকে অল্পে অল্পে আবিষ্কার করে, সঙ্কল্প, কামনা ও আবেগের একটা ভাঙ্গাগড়া চলিতে থাকে; পাথর হইতে মূর্ত্তি গড়ার সতর্ক একাগ্রতা নয়, সহজ নমনীয় কাদার তাল লইয়া বহু মূর্ত্তির দ্রুত রূপান্তর। কল্পনার এই বিলাস মগ্ন-চৈতন্যের উপর উঠিয়া ভাসিয়া ডুবিয়া মিলাইয়া যায়—স্রোতের উপর ভাসমান বুদ্‌বুদের মত! ঠিক ঠিক ভাষায় ব্যক্ত করিতে পারিতেছি না। বেদান্তের ভাষায় ইহা—"মুকাস্বাদনবৎ" বিবেকানন্দের ভাষায়—"বোঝে প্রাণ বোঝে যার।"

দশজনের মত আমিও অভ্যাসের দাস। ঐ অবস্থার ফাঁকে ফাঁকে গৃহস্থালীর নিত্যকর্ম্মের শব্দ কানে আসে। ঝি বাসন্‌ মাজিতেছে, ভৃত্য ঘরের মেঝে মুছিতেছে, নাতি আসিয়া তাগাদা দিতেছে, দাদু ওঠ, চা যে জুড়িয়ে গেল! চোখ বুঁজিয়া নাতির গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলি, খবরের কাগজ! অতি রূঢ় বাস্তব জগতে আবার দৈনন্দিন নব জন্মলাভ করি। বৈরাগী মনের উপর নিমেষে হিংস্র লুব্ধ, ক্ষুব্ধ জগত ঝাঁপাইয়া পড়ে, মনে পড়ে বিরস কর্ত্তব্যের নীরস আহ্বানগুলি—অল্পক্ষণ পূর্ব্বের সঙ্কল্পগুলি তালগোল পাকাইয়া যায়, বক্ষকুহর হইতে এক নিরাসক্ত আত্মা, "ভাল লাগে না, ভাল লাগে না" বলিতে বলিতে অনিচ্ছুক বলদের মত ঘানি গাছের জোয়াল কাঁধে তুলিয়া লয়!

প্রভাতের সৌন্দর্য্যের প্রতি আমার আকর্ষণ নাই বা কোনকালে ছিল না, এমন কথা বলিব না। পদ্মার বিশাল বিস্তারে সলিল-সিক্ত সূর্য্যোদয়ের স্মৃতি ভুলিবার নহে। পর্ব্বত শিখরে সূর্য্যোদয় দেখিবার

জন্য রাত্রি জাগিয়া, শীতে আড়ষ্ট হইয়া সিঞ্চলে উঠিয়াছি, মেঘের দৌরাত্ম্যে তিনবার ব্যর্থকাম হইয়া, শরৎকালে দারজিলিংএ গিয়া সে আশা পূর্ণ করিয়াছি। অতি প্রত্যুষে মেঘমুক্ত ধবলগিরি ও কাঞ্চনজঙ্ঘার তুষারমৌলী শিখরে গলিত স্বর্ণের বন্যা দুই চক্ষু ভরিয়া পান করিয়াছি। ভারতসমুদ্রের বালুকাবেলায় দাঁড়াইয়া লবনাম্বুস্নাত রক্তিম সবিতাকে বন্দনা করিয়াছি। বাঙ্গলার শ্যামল প্রান্তরে বসিয়া উজ্জ্বল শুভ্র শুকতারার দিকে চাহিয়া অরুণোদয়ের প্রতীক্ষা করিয়াছি, স্নিগ্ধ মন্দ সমীরণ, বিহগ-কুলের ক্রমস্ফুট কাকলী, তরুপল্লবের শিহরিত আগমনী সঙ্গীতের অর্ঘ্য গ্রহণ করিতে, পূর্ব্বদিগন্ত রক্তিমহাস্যে উদ্ভাষিত করিয়া দিনদেব দেখা দিয়াছেন—ঋতুতে ঋতুতে, কতদিন কতভাবে! কিন্তু ইহার পশ্চাতে কর্ত্তব্য নামক প্রভুর কশাঘাত ছিল না বলিয়াই স্বেচ্ছায় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য উপভোগ করিয়াছি।

কিন্তু অধিকাংশ মানুষের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য উপভোগ করিবার মত মানসিক গঠন নয়; তাহারা পূণ্যার্জ্জন, স্বাস্থ্যলাভ কিম্বা জ্ঞানী ও ধনি হইবার জন্য প্রভাতে শয্যাত্যাগ করে না। জীবনযাত্রার প্রয়োজনেই তাহা করিতে হয়। হাজার হাজার বৎসর নিশাচর ছাড়া অন্যান্য পশু-পক্ষীর সহিত মানুষের জীবনযাত্রার বিশেষ পার্থক্য ছিল না। দিবস আহার সংগ্রহ এবং আনুসঙ্গিক জীবধর্ম্ম পালনের, রজনী বিশ্রামের। বন্য মানুষ যখন বর্ব্বরতার সর্ব্বশেষ স্তর অতিক্রম করিয়া সভ্যতার প্রথম সোপানে আসিল, যখন শস্য উৎপাদন ও সঞ্চয় করিতে শিখিল, পশু পাল ও দাসদাসীরূপ বিত্ত সঞ্চয় করিয়া গোষ্ঠীপতি হইয়া উঠিল—তখন হইতেই অভ্যস্ত জীবনযাত্রার ছন্দ ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিল। তারপর ধর্ম্ম, সঙ্গীত, শিল্পকলা, দর্শন, কাব্য প্রভৃতি বৈচিত্র্য মানুষের রুচি ও প্রকৃতিতে আনিল পরিবর্ত্তন—সমাজে দেখা দিল একশ্রেণীর "যামিনীর জাগরুক দল", যাহাদের জীবিকা অন্বেষণের কোন ব্যস্ততা নাই। অতএব প্রভাতে শয্যাত্যাগেরও কোন তাড়া নাই।

কিন্তু প্রভু ও দাসের ব্যবধানের উপর প্রতিষ্ঠিত সমাজ-ব্যবস্থায়, অধিকাংশ লোককে উদয়াস্ত পরিশ্রম করিতে হয়, তথাপি সাবধানতার জন্য ধর্ম্ম ও নীতি-শাস্ত্রের চাবুক উদ্যত রাখিতে হয়। ধর্ম্মবিধান না থাকিলেও অধিকাংশ মানুষ প্রত্যুষেই কাজ আরম্ভ করিত, আজিও করে। কৃষক ও পশুপালককে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই কাজ আরম্ভ করিতে হয়। রৌদ্র-তাপ বাড়িয়া উঠিবার পূর্ব্বেই তাহারা কাজ সমাপ্ত করে, অন্যথা অপরাহ্ণের জন্য অপেক্ষা করিতে হয়, সূক্ষ্ম কারুশিল্পীদেরও প্রভাতে কাজে প্রবৃত্ত হওয়া সুবিধা ও লাভজনক। শুনিয়াছি, মসলীনের সূক্ষ্ম সুতা কাটিবার জন্য সেকালে বার তের হইতে ষোল বৎসরের বালিকা-দিগকে সূর্য্যোদয়ের এক প্রহর পূর্ব্বে চরকা লইয়া বসিতে হইত। কেন না, রৌদ্র উঠিলে বাতাসের আর্দ্রতা কমিয়া যায়, সুতা সূক্ষ্ম হয় না। দৃষ্টান্ত বাড়াইয়া লাভ নাই, যাযাবর যুগ হইতে সামন্ততান্ত্রিক যুগ অর্থাৎ প্রাক্-যন্ত্রযুগ পর্য্যন্ত সমাজ ব্যবস্থায় সুপ্রভাতে উঠিয়া কাজে লাগাই ছিল অধিকাংশ মানুষের পক্ষে নিয়ম ও বিধি। সূর্য্যের গতিবিধির সহিত মানুষের কর্ম্মজীবনের সামঞ্জস্য বিধান করিয়া লওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। ব্যতিক্রম যাহা ছিল, তাহা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নহে। সম্রাট, রাজা, সামন্ত, বণিক, সন্ন্যাসী, রোগী, যোগী ও গণিকা ছাড়া সর্ব্বসাধারণ নরনারীর প্রভাত-শয্যায় আলস্যমন্থর কল্পনা-বিলাসের অবসর ছিল না।

হাজার হাজার বৎসরের অভ্যাস, প্রাতরুত্থানের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক মহিমা ধূলিসাৎ করিয়া দিল, বিজ্ঞান ও যন্ত্রযুগ। ঋতুচক্রের পরিবর্ত্তন—সূর্য্যের উদয়াস্তের সহিত মানুষের কর্ম্মজীবনের কোন যোগ, কোন সামঞ্জস্য রহিল না। আজিকার পৃথিবীতে, পশুপক্ষীর বিশ্রাম আছে মানুষের কাজ অষ্টপ্রহর। এখন কর্ম্মচক্র নিত্য আবর্ত্তিত—বিরামহীন, ক্ষমাহীন, অব্যাহত ; অশান্ত অশ্রান্ত তাহার গতি। মহাকাল সূর্য্য ছাড়িয়া

ঘটিকাযন্ত্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতেছেন। কলের লাঙ্গল ও বৈজ্ঞানিক কৃষি ব্যবস্থার পত্তন হইলে হয়তো কৃষককেও আর প্রভাতে শয্যাত্যাগ করিতে হইবে না। কৃষি ব্যবস্থায় আজ যাহাই থাকুক, তুমি শ্রমিক, কেরানী, পুলিশ, রেল ও ডাক বিভাগের কর্ম্মচারী, খণির মজুর, সাংবাদিক, প্রহরী, সৈনিক,—তোমাকে ঘণ্টা মাপিয়া কাজ করিতে হইবে। প্রাতরুত্থানের পবিত্র নিয়মের সহিত ইহার কোন সম্পর্ক নাই, তোমার শ্রম ও বিশ্রাম অতীতের প্রাকৃতিক ও ধর্ম্ম অনুশাসনের নিয়মের ব্যতিক্রম। অহোরাত্রের যে কোন সময়ে তোমার কর্ম্ম, বিশ্রাম ও নিদ্রা। পুরাতন ব্যবস্থা আর ফিরিয়া আসিবে না। রজনীর প্রথম প্রহরে সুখ শয্যায় গিয়া; বিহগ কুলের কলকাকলীতে আনন্দময় জাগরণ আর তোমার জীবনের প্রত্যেকটি দিনকে নন্দিত করিবে না। কুলায় প্রত্যাশী সন্ধ্যার পাখীর মত তুমি পত্নী পুত্রের সহিত গৃহে মিলিত হইতে পারিবে না—আধুনিক সমাজের জটিল জীবনযাত্রার দাবী মিটাইবার জন্য তোমাকে শাস্ত্রবাক্য, নীতিকথা মহাজনের উপদেশ লঙ্ঘণ করিতেই হইবে। অতএব পাখীর কলরব আরম্ভ এবং কাননের কুসুমকলি ফুটিবার সঙ্গে সঙ্গে শিশুকে শয্যাত্যাগ করিতে শিক্ষা দেওয়া আজিকার দিনে নিরর্থক। তাহাকে শিখাইতে হইবে, দিনরাত্রির যে কোন সময় শুইয়া থাক ক্ষতি নাই, কিন্তু কারখানা ও আপিসে, নির্দ্দিষ্ট সময় মত গাত্রোত্থান করিয়া নিয়মিত হাজীরা দিয়ো। এই পরিবর্ত্তিত জগতে বহু নরনারীর পক্ষে, সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে শয্যাত্যাগের কোন প্রয়োজন নাই। কেননা, বহু যুগের বহু মানবের সমর্থন স্বীকৃতি ও অঙ্গীকারের উপর প্রতিষ্ঠিত এমন একটা সর্ব্বজনীন নীতিবাক্য আমাদের কালের বহু মানবের জীবনে বহু পূর্ব্বেই নিস্ফল হইয়া গিয়াছে।

১৬ই মার্চ্চ, ১৯৪৪

আলোক

নিষ্প্রদীপ নগরের অন্ধকার মন এত দিনেও স্বাভাবিক অবস্থা বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিল না। মহাযুদ্ধের অবসান হইয়া আবার আলো আসিবে, আমার মত লক্ষ লক্ষ নরনারীর প্রতি রাত্রির ইহাই প্রার্থনা। শীত রজনীতে ভবন শিখরে দাঁড়াইয়া ধূম ও বাষ্পাবরণে আবৃত নগরীর দিকে চাহিলে মনে হয়, সে যেন মহাধ্বংসের প্রতীক্ষায় দাঁতে দাঁত চাপিয়া অন্ধকারে লুকাইয়া আছে। উর্দ্ধে ধূসর আকাশে মৃদুভাতি "নক্ষত্রের পাখার স্পন্দনে, চমকিছে অন্ধকার আলোর ক্রন্দনে।"

মানব সভ্যতার শৈশবে, সূচীভেদ্য অন্ধকার, বেদান্তের ভাষায় অন্ধকারকে আবৃত করিয়া যে অন্ধকার, সেই ভয়াল তামসী নিশায় ভয়ার্ত্ত ঋষির কণ্ঠ হইতে উদ্গীত হইল, "তমসো মা জ্যোতির্গময়"—আমাকে অন্ধকার হইতে আলোকে লইয়া যাও। বাইবেলে আছে, সৃষ্টির আদি বাণী—"আলোক উদ্ভাষিত হউক।" বেদে সূর্য্য ও অগ্নি আদি দেবতা। সবিতা জগৎ প্রসবিতা বিপুল রহস্যে ভরা। অগ্নি জাতবেদা সব কিছুই দগ্ধ করিতে পারেন—তেজ ও জ্যোতির প্রত্যক্ষ দেবতা।

"হিরন্ময়েন পাত্রেন সত্যস্যাপি হিতম মুখম্,
তত্ত্ব পুষণ নপাবৃণু সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে"।

ঐ হিরন্ময় পাত্রের (সূর্য্য) মধ্যে সত্য আবৃত রহিয়াছে। হে পুষণ (সূর্য্যের অধিষ্ঠাতৃ বৈদিক দেবতা) তুমি আবরণ উন্মোচন করিয়া সত্যধর্ম্ম দেখাও।"

বন্য ও বর্ব্বর যুগে সূর্য্যই মানুষের আলোর সম্বল। দিনে সূর্য্য, রাত্রিতে চন্দ্রতারা। অন্ধকাররূপ অসুরকে যিনি খর রশ্মিমালার শর

বর্ষণে বধ করিয়া ভীতি হরণ কিরণমালা বিস্তার করেন, তিনি উপাস্য ইষ্ট দেবতা—প্রভাতের প্রার্থনা তাঁহারই উদ্দেশ্যে ঋক্‌মন্ত্রে ধ্বনিত হইত। উর্দ্ধে তারকাপুঞ্জ দেবলোক—নিত্য আলোকিত স্বর্গভূমি, যেখানে অন্ধকার নাই। সেই দিব্য ধামের বার্ত্তা বিশ্বের অমৃতের সন্তানদিগকে শুনাইয়া ঋষি বলিতেছেন,—

"বেদাহমেতম পুরুষ মহান্তম্
আদিত্যবর্ণম, তমসা পরস্তাৎ"

সেই আদিত্যবর্ণ পুরুষ তমসার পরপারে রহিয়াছেন, তাঁহাকে জানিলেই মৃত্যুর পরপারে যাওয়া যায়।

দেবযুগ অতিক্রম করিয়া, 'ব্রহ্মের' পরিকল্পনায় উপনিষদও অপূর্ব্ব কবিত্বপূর্ণ ভাষায় বলিয়াছেন—

"ন তত্র সূর্য্য ভাতি ন চন্দ্র তারকম্,
নে মা বিদ্যুতোভান্তি কুতময় অগ্নি
তমেব ভান্ত মনুভাতি সর্ব্বং
তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি"

"সেখানে সূর্য্য চন্দ্রের দীপ্তি পৌঁছায় না, বিদ্যুৎ ও প্রকাশ পায় না, অগ্নির তো কথাই নাই। তাঁহারই আলোকে সমস্ত আলোকিত, তাঁহারই জ্যোতি সকলের মধ্যে উদ্ভাষিত।"

দেবতারা জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি, তাঁহাদের ছায়া নাই, তাঁহাদের মস্তকে উৎসারিত জ্যোতির্ম্মণ্ডল। দেবাদিদেব মহাদেবের ললাটে শশীকলা—মহাদেবীর ত্রিনয়নে শত সূর্য্যের দীপ্তি। চন্দ্র সূর্য্য ছানিয়া মানুষ উপাস্য দেবদেবী গড়িয়াছে।

অন্যদিকে এই সূর্য্য চন্দ্র মানুষকে দিক শিক্ষা দিয়াছে, উদয়াস্তের গতির ছন্দ হইতে সে সময়ের জ্ঞানলাভ করিয়াছে, যাযাবর মানুষকে দূর

দূরান্তরে যাইবার পথ দেখাইয়াছে। চন্দ্রহীন রজনীতে উত্তরে ধ্রুবতারা ; ছয় মাস প্রভাতে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে পূর্ব্বাকাশে, ছয় মাস অস্তসূর্য্যের অনুচর শুকতারা অন্ধকার রজনীতেও দিগ্‌ভ্রান্ত পথিকদের দিশাহারা হইতে দিত না।

কিন্তু এ আলোও প্রচুর নয়। বন্য পশু, শীত ঋতু ও বিরুদ্ধ প্রকৃতির সহিত যুদ্ধ করিয়া বাঁচিবার জন্য আরও আলো চাই। স্বর্গের আলো মর্ত্ত্যে ধরিয়া রাখিবার কৌশল মানুষ জানে না। সময় সময় রজনীর অন্ধকার পট বিদীর্ণ করিয়া দাবানল জ্বলিয়া উঠিয়াছে, প্রজ্জ্বলিত অরণ্যাণীর আর্ত্ত ক্রন্দনে ভীত ও বিহ্বল মানুষ অন্যান্য পশু পক্ষীর মতই পলায়ন করিয়াছে। দূরে দাঁড়াইয়া সভয়ে দেখিয়াছে, কি প্রচণ্ড দাহজ্বালা, কি রক্তিম দ্যুতি! এ-কোন দেবতার ধ্বংসলীলা!

আলোক-পিপাসু অতৃপ্ত মানুষ সুখী নয়। দিবারাত্রিতে সূর্য্য চন্দ্র তারকার আলোয় তাহার দুরাকাঙ্ক্ষা তাড়িত দুর্দ্দমনীয় কামনা চরিতার্থ হয় না। সূর্য্য চার প্রহর আলো দিয়া সন্ধ্যা না হইতেই ক্লান্ত শিশুর মত ঘুমাইয়া পড়ে। চন্দ্রকলার হ্রাস বৃদ্ধি আছে, প্রতি পক্ষের প্রতি রাত্রিতে সে পূর্ণ আলোক দেয় না। তাহার উপর মেঘ আসিয়া কখনো কখনো চন্দ্র তারা মুছিয়া ফেলে। আয়ত্তের মধ্যে এমন আলোক চাই যে তাহাকে পথ দেখাইবে, তাহার গৃহ আলোকিত করিবে। আগ্নেয়গিরি ও দাবানল তাহার কৌতূহল আকর্ষণ করিল। স্বাভাবিক অগ্নিকে কাষ্ঠে রক্ষার ব্যবস্থা প্রথম না কাষ্ঠে কাষ্ঠে ঘর্ষণ করিয়া অগ্নি উৎপাদন এবং তাহা রক্ষার ব্যবস্থা প্রথম, তাহার কোন ইতিহাস নাই। তবে বিজ্ঞানীরা বলেন এই আগুনকে বশে আনিবার পর মানব সভ্যতা দ্রুত অগ্রসর হইয়াছে। আগুনকে বশে আনিয়া মানুষ আবিষ্কার করিল, আগুণে ঝলসাইয়া লইলে ফল শস্য এবং পশু মাংস কোমল সুপাচ্য ও সুস্বাদু হয়। তারপর মানুষ অগ্নির

তাপসাম্য রক্ষা করিয়া জলপূর্ণ পাত্রে খাদ্য সিদ্ধ করিবার কৌশল আবিষ্কার করিয়াছে। প্রথম কোন ভাগ্যবতী নারীই (নিশ্চয়ই নারী) প্রথম অগ্নিপক্ক খাদ্য স্বামী পুত্রকে দিয়াছিল। প্রচুর অনিয়মিত ভোজন এবং পরিপাক করিবার জন্য পাকস্থলীর কঠোর শ্রম হইতে মানুষ মুক্তি পাইল—তাহার অবয়বের বন্য আকৃতি ক্রমে পরিবর্ত্তন হইল।

সেই স্মরণাতীত কালে আদিম মানুষ অগ্নিকুণ্ড ও মশালের আলোয় নৈশ উৎসব সভার আয়োজন করিত, সোমরস পান করিয়া নৃত্যগীতে উন্মত্ত হইত। প্রথমে সাধারণ কাষ্ঠে পরে সহজদাহ্য কাষ্ঠের মশালে, তারপর ঘৃত, মোম ও তৈলে দীপ জ্বালিবার ব্যবস্থা রূপান্তরিত হইয়াছে। এই বিবর্ত্তনের পথে কত সহস্র বৎসর লাগিয়াছে কে জানে। এই অগ্নি উপাসক মানুষই প্রথম পশুরাজ এবং এই অগ্নিই তাহাকে পৃথিবীর অধীশ্বর করিয়াছে।

অগ্নির প্রতি মানুষের কৃতজ্ঞতার অন্ত নাই। আর্য্যরা অগ্নিকে গৃহে রক্ষা করিয়া উপাসনা করিতে লাগিলেন। অগ্নি সর্ব্ব দেবতার মুখ, যজ্ঞে নিবেদিত হব্য তিনি দেবতাদের নিকট বহন করিয়া লইয়া যান, বন্য পশুর ভীতি হইতে মানব ঘর রক্ষা করেন। রজনীর অন্ধকার ভীতি দূর হইল, পল্লীজনপদ নগরী আলোকিত হইল। সভ্যতার গতিপথে আসিল কত বিচিত্র দীপাধার। মঠে, মন্দিরে, উৎসব সভায় আলোকিত দীপাবলী। নৃপতিদের কক্ষে সুরভি তৈলপূর্ণ স্বর্ণদীপের আলোকই তখন বিলাসের পরাকাষ্ঠা।

রাত্রিকে মানুষ মশালের আলোকে জয় করিল—যে বন্যপশু ও অন্ধকার তাহার ভীতির স্থল ছিল সেই বন্য পশুর নিকট মানুষ ভীতিপ্রদ হইয়া উঠিল। প্রদীপের আলোয় কেবল গৃহকোণ নহে, মানুষের চিত্তলোকও উদ্ভাষিত হইয়া উঠিল। রসপিপাসু কবি, গায়ক, দার্শনিক প্রভৃতি

"যামিনীর জাগরূক দল" দেখা দিল। বাল্মিকী হইতে কালীদাস, চণ্ডীদাস এমন কি মাইকেল মধুসূদন পর্য্যন্ত তাঁহাদের মহাকাব্য, কাব্য, মধ্য নিশায় তৈল দীপের মৃদু আলোকেই রচনা করিয়াছেন।

ইহার পর হইতে আলোক উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইয়াছে। পল্লীতে প্রথম কেরোসিন ও হ্যারিকেন লণ্ঠনের আবির্ভাবের সর্ব্বব্যাপী আনন্দোচ্ছ্বাসের গল্প আমরা প্রাচীনদের মুখে শুনিয়াছি। গ্যাস ও বিজলী বাতি আসিয়া নগরের অন্ধকার দূর করিয়াছে, পেট্রোল আসিয়া, মোমবাতীর ঝাড়-লণ্ঠন সরাইয়া "ডে-লাইট" দিয়া পল্লীর নৈশ আলোককেও উগ্র করিয়াছে। বিদ্যুতের পর আলোকের কি বিস্ময়কর উন্নতি! রঞ্জন রশ্মি নরদেহের চির আবৃত অংশকে মানুষের স্থূলদৃষ্টির সম্মুখে প্রকাশিত করিয়াছে। আলট্রা ভায়োলেট রশ্মি দ্বারা সূক্ষ্মতম জীবাণুর আকৃতি প্রকৃতি ধরা পড়িতেছে। শোনা যায়, বিজ্ঞানীরা মৃত্যুরশ্মি আবিষ্কারের চেষ্টায় আছেন। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আলোকের বৈজ্ঞানিক প্রয়োগ অবশ্য স্বতন্ত্র কথা, আমাদের ব্যবহারিক জগতের আলোক উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইয়া অন্ধকারকে সম্পূর্ণরূপে বিদায় দিবে। মধ্যরাত্রি ও মধ্যাহ্নে কোন পার্থক্য থাকিবে না। অন্ধকার হইবে মানুষের দাস।

আলোকের ক্রমবর্দ্ধমান দীপ্তি ও বিস্ময়কর বিবর্ত্তনের সহিত তুলনা করিলে ভারতের উন্নতির গতি এখনও মন্থর। ভারতের সর্ব্ব বৃহৎ মহানগরী কলিকাতার রাজপথে এখনও গ্যাসের আলো আছে। কলিকাতার ও সহরতলীর শতকরা ৪০ জন বাসিন্দাকে এখনও কেরোসিনের আলোতেই তৃপ্ত থাকিতে হয়। ভারতের মুষ্টিমেয় নগরীর রাজপথ ও বিপনী এবং ততোধিক স্বল্পসংখ্যক ধনীর পল্লীপ্রাসাদ বিজলী বাতিতে আলোকিত হয়। পল্লী-ভারত কেরোসিন, মোমবাতী ও তৈল দীপ লইয়াই জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে। পথে আলো দেওয়া আধুনিক

পৌরব্যবস্থার একটা প্রধান অঙ্গ। আমাদের দেশের মফঃস্বলের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মিউনিসিপ্যাল এলাকায় কৃষ্ণপক্ষে পথে আলো দিবার যে ব্যবস্থা আছে, তাহাকে আলো না বলিয়া অন্ধকারে "আলোর গর্ত্ত" বলাই সঙ্গত।

আলোকিত কলিকাতার একটা রূপ ছিল, বর্ষার রাত্রে পিচের সিক্ত পথে জলের উপর আলোর ঝলকানি দেখিতে সুন্দর। আলো ও জলের লাস্যলীলা কত কবি ললিত ছন্দে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। অন্ধকারে সহসা প্রকাশমান রেল ষ্টেশনের আলো অপেক্ষা নদীবক্ষে ষ্টিমার হইতে ষ্টেশনের আলোর দীর্ঘায়ত প্রতিফলিত রশ্মির নৃত্য অধিকতর নয়নানন্দকর। পূর্ব্ববঙ্গে বর্ষাকালে কোন গঞ্জের হাটে সূর্য্যাস্তের পর ইতস্ততঃ ধাবিত নৌকাগুলির জলের উপর অপস্রিয়মান আলোর নৃত্যের স্মৃতি ভোলা কঠিন।

মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর অন্ধকার নগরীর বাসিন্দাদের চক্ষুর সম্মুখে যদি সহসা কোন সন্ধ্যায় পূর্ব্বের মত দীপমালা বিকশিত হইয়া উঠে, তাহা হইলে বহ্নিকামী পতঙ্গের মত দলে দলে স্ত্রীপুরুষ রাজপথে বাহির হইয়া আনন্দে হাস্য করিবে। অন্ধকার রাত্রে অসংস্কৃত সর্পিল গলি এবং কর্দ্দম আবিল বস্তীগুলি কি ভয়াবহ! এত দিনেও অন্ধকারে পথ চলা মানুষের অভ্যাস হইল না। মাতাল না হইয়াও মানুষ বালির বস্তায় প্রতিহত হইয়া গড়াইতেছে, ব্যাফেলওয়ালে মাথা ঠুকিতেছে, রাস্তার গর্ত্তে পা মচকাইতেছে, ইহার মধ্যে কোন কোন সাবধানী পথিক টর্চ্চ লাইট জ্বালাইয়া নিভাইয়া প্রেতভীতি ও অন্ধকারের আতঙ্ক বৃদ্ধি করেন। কোন দিক হইতে কে আসিয়া মাণিব্যাগ ফাউণ্টেনপেন, হাত ঘড়ী ছিনাইয়া লইবে—চলিতে গা ছমছম করে। গভীর রাত্রে ট্যাক্সীতে করিয়া গৃহে গমন, পুলিশ কোর্ট হইতে ঢাকা কালো গাড়ীতে চড়িয়া আলীপুর সেণ্ট্রাল জেলে গমনের স্মৃতি জাগ্রত করে। নিষ্প্রদীপের ফলে রাত্রির রাত্রিত্ব দ্বিগুণ বাড়িয়া গিয়াছে—প্রতি রাত্রি কালরাত্রি। পল্লীর

নিশা চিরদিনই নিশা। তবুও পল্লী-পথে চলিতে দৈবাৎ কুটিরের জানালা দিয়া আলোকরশ্মি দেখা যাইত, কোথাও বা আলোকিত প্রাঙ্গনে সঙ্কীর্ত্তন ও সঙ্গীতের মজলিস বসিত। আজকালের কড়া শাসনে পল্লীর দীপও আবৃত অথবা নিভিয়া গিয়াছে। মাসে আধ বোতল বরাদ্দ কেরোসিন তেলে আলোর বিলাস চলে না। পরীক্ষার্থী ছাত্ররা কেরোসিন তৈলের জন্য সংবাদপত্র মারফৎ রোদন করিতেছে, ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্টরা পক্ষপাতীত্বের চরম দৃষ্টান্ত দেখাইতেছে এবং চোরাবাজার জাকাইতেছে। পল্লীবাসীরা আর্ত্তস্বরে গাহিতেছে,—

"রয়েছে দীপ না জ্বলে শিখা
এই কি ভালে ছিলরে লিখা—"

সভ্যতার শৈশবে সহস্র সহস্র বৎসর অন্ধকারে কাটাইবার পর যে আলো আসিয়াছিল, সে আলোও মহাযুদ্ধের প্রলয় ফুৎকারে নিভিয়া গিয়াছে; অন্ধকার "বাধ্যতামূলক" হইয়াছে! তবুও প্রত্যাশা করিব, শীঘ্রই এই নরমেধ যজ্ঞের অবসান হইবে। মেঘমুক্ত আকাশে নির্ম্মল সূর্য্যোদয়ের মত আলোক কৃষ্ণ আচ্ছাদন হইতে মুক্তি পাইবে। কারাগার হইতে মুক্তিপ্রাপ্ত বন্দী যেমন ভাবে বাহিরের আলোককে সমস্ত প্রাণ দিয়া অভিনন্দন জানায়, তেমনি ভাবে দেশে দেশে কোটি কোটি নরনারী অবিমুক্ত আলোককে বন্দনা করিবে। মানুষের দুর্ব্বুদ্ধি ও লোভ যদি যুদ্ধোত্তর জগতের ভাবী সমাজ সংযত করিতে পারে, তাহা হইলে বর্ত্তমান শতাব্দীতে হয়তো আর নিষ্প্রদীপ রজনী ফিরিয়া আসিবে না।

২৪শে নভেম্বর, ১৯৪৪

গতির আবেগ

নির্ম্মল নীলাকাশে দিক মুখরিত করিয়া বিমানপোত ছুটিয়া যায়—ঊর্দ্ধলোকের অনাদি কালের নিস্তব্ধতা রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। মানুষের সহস্র সহস্র বৎসরের কল্পনার কামনার সাধনার ধন বিংশ শতাব্দীর মানুষ বাস্তবে পরিণত করিয়াছে। মহাশূন্যের অনন্ত বিস্তার, যেখানে অগণিত গ্রহনক্ষত্রের চক্রাকারে অশ্রান্ত ভ্রমণ, যেখানে জ্যোতির্ম্ময় দেবদেবীগণের এবং বিদেহী আত্মার ভ্রমণপথ,—দেবযান ও পিতৃযান; যেখানে বিহঙ্গম লীলায়িত ভঙ্গীতে উড়িয়া বেড়ায়, সেই শূন্যপথে পক্ষহীন মানুষ ভ্রমণ করিতে চাহিয়াছে। মানুষ কল্পনা করিয়াছে, বিশ্বাস করিয়াছে, সত্যযুগে কেবল দেবতারা নহেন, যোগবলে মুনিঋষিরাও শিবলোক, ব্রহ্মলোক, বিষ্ণুলোক ও স্বর্গে যাতায়াত করিতেন। কিন্তু সাধারণ মানুষ লোকসাধ্য উপায়ে ভূতল ছাড়িয়া আকাশে উঠিতে পারে নাই।

চীন, ভারত, গ্রীক প্রভৃতি প্রাচীন সভ্য জাতির পুরাণ কাব্য গাথায় অতিমানবদের পাখার সাহায্যে, পশুপৃষ্ঠে অথবা রথে ও বিমানে আকাশ-পথে ভ্রমণের কাহিনী আছে। রামায়ণে দশরথের রথ দশদিকে চলিত, রাবণের পুষ্পকরথ স্বর্গমর্ত্তের ব্যবধান ঘুচাইয়াছিল। কিন্তু ইহার কোন পারম্পর্য্য নাই। মহাশূন্যের রহস্য আবিষ্কারের উদগ্র কামনায় কল্পনাবিলাস কাব্যের রূপান্তরে শতাব্দীর পর শতাব্দী মানুষের মনকে দুর্লভের সাধনায় আকর্ষণ করিয়াছে। বাহ্য প্রকৃতিকে জয় করিবার ইতিহাসের বহু স্তর অতিক্রম করিয়া মানুষের কল্পনা ও কামনা আজ বাস্তবে পরিণত হইয়াছে। যোগবলে নহে, দেবগণের বরে নহে—জড় বিজ্ঞানের সাধনায় যন্ত্রবলে আজ মানুষ আকাশচারী।

জলে স্থলে অন্তরীক্ষে গতির ছন্দে সৃষ্টি লীলায়িত। সূর্য্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্র উদয়াস্তের অমোঘ নিয়মে নিঃশব্দে চলিয়াছে—দিনের পর রাত্রি। গিরিনির্ঝরিণী কলধ্বনি তুলিয়া দ্রুত নামিয়া আসে, সলিলবিপুলা উচ্ছ্বাসময়ী নদী স্রোতাবর্ত্তে বহিয়া যায়, ঝঞ্ঝাঝড়ে প্রভঞ্জনের দুর্ব্বার গতিবেগ, বিদ্যুতঝলকে আকাশের বজ্রের চকিতে অবতরণ—মানুষ বিস্ময়ে ভয়ে চাহিয়া দেখে। অরণ্যের পশুপক্ষীর গতি, মন্দগতি মানুষের ঈর্ষার ন। দ্বিপদ পক্ষী আকাশে উড়িতে পারে, দ্বিপদ মানুষ ধাবিত হইলে সহজেই ক্লান্ত হইয়া পড়ে, তাহার স্বাভাবিক গতি ঘণ্টায় ৪।৫ মাইলের বেশি নহে। চতুষ্পদ পশুর দেহের সহিত নিজেকে যোজনা করিয়া মানুষ ভ্রমণক্লেশ ও ভারবহন হইতে অব্যাহৃতি পাইল, কিন্তু গর্দ্দভ (প্রথম গৃহপালিত জীব), বৃষভ বা মহিষ হস্তী তাহার গতি বৃদ্ধি করিতে পারিল না। মানুষের দৃষ্টি পড়িল অশ্বের উপর। এই অশ্বকে আয়ত্তে আনিয়া রশ্মিবল্গা সাহায্যে তাহার পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া মানুষ প্রথম দ্রুত ধাবিত হইবার আনন্দ লাভ করিল। মানুষের আবিষ্কৃত চক্র ক্রমে কুম্ভকারের গৃহ হইতে রথে যোজিত হইল—সভ্যতার গতিপথে ৪।৫ হাজার বৎসর মানুষ ইহাতেই সন্তুষ্ট হইয়াছে।

গিরিগাত্রচ্যুত বনস্পতি নদীতে দ্রুত ভাসিয়া যায়,—নদীর তীরে তীরে প্রথম সভ্যতা বিস্তার। মাটির পথের সহিত জলের পথকে মিলাইতে হইবে। কত শতাব্দীর সাধনায় মানুষ শূন্যগর্ভ বৃক্ষকাণ্ড হইতে নৌকা নির্ম্মাণ করিয়াছে, তারপর অর্ণবপোত নির্ম্মাণ করিয়াছে, কে জানে। জলে স্থলে দ্রুতগতি আয়ত্তের ইতিহাস মানুষের সভ্যতার ইতিহাস। অর্ণবপোত ও অশ্বযান মানুষকে দেশ হইতে দেশান্তরে, দ্বীপ হইতে দ্বীপান্তরে লইয়া গিয়াছে—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠীকে বৃহৎ মানব পরিবারের সহিত মিলিত করিয়াছে।

শীতাতপ হইতে রক্ষার জন্ম পশুচর্ম্ম চাই—ক্ষুধার খাদ্য পশুর মাংস। অরণ্যচারী মানুষের পশুর উদ্দেশ্যে প্রথম লোষ্ট্রনিক্ষেপ ক্রমে তীক্ষ্ণ কাষ্ঠ খণ্ড হইতে শূল ভল্ল, অবশেষে তীর ধনুকে আসিয়াছে। অস্ত্র ও শস্ত্র লৌহ ও বারুদের আবিষ্কার—কামান ও বন্দুক। যাহা পশুবধের জন্ম কল্পিত হইয়াছিল, সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার রূপান্তরে তাহা মানুষ পরস্পরকে বধ করিবার জন্ম নিয়োগ করিল। অস্ত্র ও শস্ত্রের সহিত ক্ষাত্রবলের সমন্বয়, মানুষের মধ্যে আবার অভিনব ব্যবধান আনিল। জাতিবিদ্বেষ, ধর্ম্মবিদ্বেষ মানুষকে গণ্ডীবদ্ধ করিল, এবং এই গণ্ডীর মধ্যে শিল্পবাণিজ্য, রাজ্যবিস্তার, সাহিত্য, দর্শন, বিবিধ শিল্পকলার বিকাশ ঘটিল। ঐশ্বর্য্য সংগ্রহ, সাম্রাজ্য বিস্তার—প্রভুজাতি দাস-জাতির ব্যবধানের উপর প্রতিষ্ঠিত মনুষ্যসমাজের দুই তিন সহস্র বৎসরের উত্থান-পতনের পর আর এক রূপান্তরে আমরা দেখিলাম, বাণিজ্যতরী লইয়া পশ্চিম ইয়োরোপের স্পেন, পর্ত্তুগাল, ওলন্দাজ, বেলজিয়ম ও ইংলণ্ডের দিগ্বিজয় ও উপনিবেশ বিস্তার। কলের জাহাজ নহে, পালের জাহাজই আমেরিকা আবিষ্কার করিয়াছে, আফ্রিকা ঘুরিয়া ভারতে আসিয়াছে, সপ্তসমুদ্রের দ্বীপমালায় এবং এশিয়ায় বাণিজ্য ও সাম্রাজ্যের পত্তন হইয়াছে।

তারপর আসিল ভূগর্ভ হইতে বহু লক্ষ বর্ষের প্রোথিত কয়লা। কাঠের আগুন অপেক্ষা ইহার দাহিকাশক্তি শতগুণ অধিক। এই নূতন অগ্নিকুণ্ডে নূতন সৃষ্টিযজ্ঞের সূচনা হইল—গিরিদেহ গলিয়া আসিল লৌহ ও ইস্পাত, আসিল বাষ্পচালিত কলকারখানা ও রেলপথ ও বাষ্পীয় জলযান। এই অভিনব শক্তিবলে ক্ষুদ্র ইংলণ্ড সমুদ্রপথের একচ্ছত্র অধিপতি হইয়া সাম্রাজ্য ও বাণিজ্য বিস্তার করিল—সগর্ব্বে ঘোষণা করিল, আমার সাম্রাজ্যে সূর্য্য অস্ত যায় না।

মানুষের মানসিক উন্নতি ও সভ্যতার গতি অপেক্ষাও যন্ত্রের গতি দ্রুত। যন্ত্রের উৎপাদনের গতির সহিত প্রয়োজনের সামঞ্জস্য বিধান করিতে মানুষ পারিল না! উনবিংশ শতাব্দীর গৌরবময় আবিষ্কার বিংশ শতাব্দীর মানুষের বিভীষিকার স্থল হইয়া উঠিল। কাঁচামাল ও বাণিজ্যের প্রতিদ্বন্দ্বিতা তীব্র হইয়া উঠিল। অর্থনীতি ও রাজনীতির পণ্ডিতেরা ধনিক ও শাসকশ্রেণীর দালালি করিয়া পীড়িত, পরাধীন, ক্ষুব্ধ মানুষকে "ক্রমোন্নতির" নামে ভাঁওতা দিতে লাগিলেন। জাতিতে জাতিতে প্রতিযোগিতা—শিল্পে বাণিজ্যে আরও দ্রুতগতি চাই—দ্রুত গুলীগোলা নিক্ষেপে সক্ষম কলের বন্দুক ও কামানও চাই।

আবিষ্কার হইল—তৈলচালিত ইঞ্জিন, আসিল মোটরকার, অতিকায় ট্যাঙ্ক এবং অবশেষে বিমানপোত। মহাযুদ্ধের প্রয়োজন ও তাগিদে আজ বিমানের গতি ঘণ্টায় ৪।৫ শত মাইল। অল্পদিনের মধ্যেই অভিনব রকেট-চালিত বিমানের গতি ঘণ্টায় ৮ শত মাইল হইবে। মানুষের সর্ব্বাধিক আশ্চর্য্য এই আবিষ্কার আজ দেশে দেশে মহাত্রাসের সঞ্চার করিয়াছে। নগর জনপদ উৎসন্ন দিতে, আবালবৃদ্ধবণিতাকে নির্ব্বিচারে হত্যা করিতে, ব্যাপক খণ্ডপ্রলয় ঘটাইতে এই যন্ত্রের বিস্ময়কর কার্য্যকারিতা ভীত ও আর্ত্ত মানব অসহায়ভাবে নিরীক্ষণ করিতেছে। মহাশক্তি এই ছিন্নমস্তা মূর্ত্তি সম্বরণ করিয়া যেদিন কল্যাণময়ী ভুবনেশ্বরী মূর্ত্তিতে দেখা দিবেন, সেদিন কি বেশি দূর?

গতির বিবর্ত্তনে সভ্যতার রূপান্তর, নবসভ্যতার পত্তন। বৃটেনের নৌশক্তি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করিয়াছিল। অজ্ঞাতসারে ইহা শাসন ও শোষণের বাহন হইলেও সভ্যতা ও সংস্কৃতিও বহন করিয়া লইয়া গিয়াছে। রেলপথ ইয়োরোপে জাতিতে জাতিতে অপরিচয়ের ব্যবধান লুপ্ত করিয়াছে, বিভিন্ন জাতি অধ্যুষিত মার্কিন

আমেরিকাকে 'ইয়াঙ্কি' জাতিতে পরিণত করিয়াছে। ভারতেও আমরা যে আসমুদ্রহিমাচল একজাতীয়তার কল্পনা করিয়া নিখিল-ভারত রাষ্ট্র-মহাসভা গড়িতে পারিয়াছি, এই রেলপথই তাহা সম্ভব করিয়াছে।

জলযান, রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন এ সকলই আন্তর্জাতিকতার বাহন। মানুষের প্রথম আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান পোস্টাপিস বা ডাকঘর। ডাকঘরের মত আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান যদি সততা ও সাধুতার সহিত চলিতে পারে—তাহা হইলে আইন-আদালত হইতে ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি কেন কেবলমাত্র মানুষের কল্যাণে পরিচালিত হইতে পারিবে না? বেতারযন্ত্র ও বিমানপোত এই প্রশ্নের উত্তর দিবে। মানুষের গতির আবেগ কেবল ধ্বংস ও উন্মাদনাতেই সীমাবদ্ধ থাকিবে না। দ্রুত দ্রুততর গতির এই যুগল বাহন বিশ্বমানবের ব্যবধান দূর করিয়া মহামৈত্রীর সূচনা করিবে। আজ যে মহাবিহঙ্গম ধ্বংস ও মৃত্যুর কাল কাল ডিমগুলি বুকে করিয়া প্রলয়বিষাণ বাজাইতেছে, কাল সে দেশে দেশে নব নব আবিষ্ক্রিয়ার সৃজনানন্দ বহন করিয়া লইয়া যাইবে। আজ যে ধ্বংসের যুদ্ধে প্রথম শ্রেণীর মারণাস্ত্র, কাল সে প্রত্যেক রণপিপাসুর হস্ত হইতে তরবারী কাড়িয়া লইবে। বিমান হইবে বিশ্বশান্তির প্রতীক। বিমান কেবল এক মহাদেশকে অপর মহাদেশের নিকটতর করিবে না, সমস্ত মানবজাতিকে করিবে পরস্পরের প্রতিবেশী। বহু ক্ষয় ও ধ্বংসের মূল্যে মানুষ আবিষ্কার করিয়াছে তাহার অধিকতর উন্নত সভ্যতা প্রতিষ্ঠার যন্ত্র—বিমানপোত; তাহার গতির আবেগ চরিতার্থ হইবার আর বিলম্ব নাই।

৩০শে মার্চ, ১৯৪৫

শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের আদর্শ

শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের সপ্তাহকালব্যাপী প্রথম মহাসম্মেলন আরম্ভ হইয়াছে। মহাসম্মেলনের মিলিত সিদ্ধান্ত সঙ্ঘের ভবিষ্যৎ ইতিহাস নিয়ন্ত্রিত করিবে, অতএব এই পবিত্র অনুষ্ঠানের দায়িত্ব ও গুরুত্ব আমরা শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ ও অনুভব করিব।

"বারংবার এই ভারতভূমি মূর্চ্ছাপন্না হইয়াছিলেন এবং ভারতের ভগবান আত্মাভিব্যক্তির দ্বারা ইহাকে পুনরুজ্জীবিতা করিয়াছেন—" ভারতবর্ষের ইতিহাস স্বামী বিবেকানন্দকে এই রহস্যের বার্ত্তা দিয়াছিল। তাই শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনা ও সিদ্ধির মধ্যে তিনি পুনরুত্থানের মহাবীর্য্য প্রত্যক্ষ করিলেন। তিনি দেখিলেন, মানবসভ্যতাকে এক স্তর হইতে আর এক উন্নততর স্তরে লইয়া যাইবার জন্য "সর্ব্বযুগাপেক্ষা সমধিক সম্পূর্ণ, সর্ব্বভাব সমন্বিত, সর্ব্ববিদ্যাসহায়, যুগাবতার" আসিয়াছেন! বেদান্ত-ভেরী-নিনাদে যুগ-প্রবর্ত্তক আচার্য্য আমাদের ডাকিয়া কহিলেন, "হে মানব, মৃতের পূজা হইতে আমরা তোমাদিগকে জীবন্তের পূজাতে আহ্বান করিতেছি * * * বৃথা সন্দেহ, দুর্ব্বলতা ও দাসজাতিসুলভ ঈর্ষ-দ্বেষ ত্যাগ করিয়া এই মহাযুগচক্র পরিবর্ত্তনের সহায়তা কর।"

"মৃতের পূজা নহে—জীবন্তের পূজা" এই কথাটুকুর মধ্যেই রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের মহান উদ্দেশ্য নিহিত রহিয়াছে! শ্রীরামকৃষ্ণের পূজাকে কেন্দ্র করিয়া, প্রাচীন যুগের ন্যায় দেবায়তন তুলিয়া, বিশিষ্ট পদ্ধতির অবতারণা করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ন্যাসী শিষ্যগণ অনায়াসেই একটি বৃহৎ সম্প্রদায় গড়িয়া তুলিতে পারিতেন। সাধারণ মানুষের সীমাবদ্ধ মনকে বাঁধিয়া

রাখিবার এই সহজ প্রাচীন-পদ্ধতির কুফল তাঁহারা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। তাই তাঁহারা কোন বিশিষ্ট পদ্ধতি দিলেন না, দিলেন মহান আদর্শ এবং সেই আদর্শের পূর্ণ অভিব্যক্তি। সেই কারণে জাতীয় জীবনের পুনরুত্থানের ভাব আজ নানাকেন্দ্র হইতে বিঘোষিত হইতেছে। শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবরাশি জাগ্রত ভারত-ভারতীর চিত্তে নবযুগের প্রতি কর্ত্তব্য বোধ জাগ্রত করিতেছে। সাম্প্রদায়িক অতি-নির্দ্দিষ্টতার যে সাংঘাতিক অকল্যাণ, তাহা সঙ্ঘে কোনদিনই স্থান পায় নাই। এক উদার অসাম্প্রদায়িক সার্ব্বভৌমিক আদর্শকে জীবন্ত রাখিবার জন্যই শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা। সকল দেশের সকল ধর্ম্মের সকল মতের মানুষই এখানে মনুষ্যত্বের দাবীতে মিলিবার সুযোগ পাইয়াছেন।

কিন্তু বাহিরের এই অনির্দ্দিষ্টতার পশ্চাতে একটা নির্দ্দিষ্ট স্থিরভূমি রহিয়াছে। সেটি হইতেছে নবযুগের নূতন সন্ন্যাস। এই সন্ন্যাস অতীত যুগের সংসার বা ইহলোক নিন্দুক আত্মপরায়ণ মোক্ষ সাধনাকে নহে, সমগ্র জাতির কল্যাণ-সাধনার মধ্যেই ব্রহ্মের প্রত্যক্ষানুভূতি লাভ করিবার জন্য, গার্হস্থ্যের সহিত সঙ্ঘের মধ্যে সমান আসন গ্রহণ করিয়াছে। তাই আজ আমরা এতগুলি মানুষ একত্র হইয়া আদর্শ মনুষ্যত্বের সাধক, সংরক্ষক ও প্রচারক সঙ্ঘরূপী শ্রীরামকৃষ্ণের চরণে শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সমগ্র মানবজাতির কল্যাণের জন্যই আসিয়াছিলেন, সন্দেহ নাই। তথাপি তাঁহারা যে জাতির মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, বিশেষভাবে সেই জাতির অধঃপতন ও দুর্গতি দূর করিবার জন্যই আসিয়াছিলেন, সেই কথাটা আমাদের সর্ব্বাগ্রে চিন্তা করিতে হইবে। জগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা পতিত, অসহায়, দুর্ব্বল হিন্দু-সংজ্ঞায়

অভিহিত নানা সম্প্রদায় ও শ্রেণীতে বিভক্ত মনুষ্যসমষ্টির মধ্যে এই যে সার্ব্বভৌমিক মনুষ্যত্বের স্বরূপ সগৌরবে বিকশিত হইল, ইহার কি নিগূঢ় রহস্য তাহা আজ পর্য্যন্তও আমরা কি সম্যক্‌রূপে বুঝিয়াছি? স্বামী বিবেকানন্দ 'রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘ' প্রতিষ্ঠা করিয়া ত্যাগ ও সেবার ভিত্তির উপর সজীব ও সক্রিয় প্রচারশীল হিন্দুধর্ম্মকে যেদিন স্থাপন করিলেন;—সেদিনের সেই শুভসঙ্কল্পটিকে বীর্য্যের দ্বারা প্রবল, পুণ্যকর্ম্মের দ্বারা নির্ম্মল করিয়া তুলিবার জন্য একাল পর্য্যন্ত আমরা কি করিয়াছি, আজ তাহা বিচার করিবার দিন!

সঙ্ঘ স্থাপনের পূর্ব্বে, শ্রীরামকৃষ্ণ গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, একটি সন্ন্যাসী পরিচালিত শক্তিকেন্দ্র! বাহিরের সমস্ত কর্ম্মপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে এই শক্তি-কেন্দ্র হইতে জ্ঞান-কর্ম্মে ত্যাগে ধর্ম্মে বিবিধ কল্যাণসম্পদ ছড়াইয়া পড়িবে, এই মহতী কল্পনা কতদূর সিদ্ধ হইয়াছে, আজ তাহা হিসাব করিয়া দেখিবার দিন!

পুণ্যস্মৃতি স্বামী প্রজ্ঞানন্দজী "ভারতের সাধনায়" বলিয়াছিলেন, "গৃহী ও সন্ন্যাসী উভয়েই ঠাকুরের আশ্রয় পাইয়াছে, তাঁহার করুণা উভয়ত্রই সমভাবে বর্ষিত,—কেহ কম পাইবার কেহ বেশী পাইবার দাবী রাখে না। কিন্তু তিনি যাহাকে সংসার ছাড়াইয়া, গৃহসমাজ ছাড়াইয়া সন্ন্যাসী করেন, তাহার একটা বিশেষ ভার, বিশেষ দায় আছে, সে দায় দেশের জন্য, জগতের জন্য স্ব-প্রতিষ্ঠিত আদর্শের সংরক্ষণ ও প্রচার। এই দায় পূরণের যোগ্যতা যতদিন থাকিবে, ততদিন তৎপ্রবর্ত্তিত সন্ন্যাসের বিলোপ নাই, বিনাশ নাই। আবার যতদিন এই দায় পূরণে তাঁহার প্রত্যক্ষ ইঙ্গিত সন্ন্যাসী-জীবনে প্রকটিত হইবে, ততদিন যোগ্যতারও অভাব হইবে না।"

নবযুগের সন্ন্যাসের এই আদর্শ স্বামী বিবেকানন্দ স্বীয় জীবনে

দেখাইয়া গিয়াছেন এবং সেই আদর্শ অব্যাহত রাখিবার জন্যই বেলুড় মঠ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। 'এই মঠ কোনমতেই বাবাজীদের ঠাকুর-বাড়ীতে পরিণত না হইয়া' যাহাতে মানুষ-গঠনোপযোগী একটি সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর বিশ্ব-বিদ্যালয়রূপে জ্ঞান, ধর্ম্ম, লৌকিক ও আধ্যাত্মিক বিদ্যাচর্চ্চার কেন্দ্ররূপে গড়িয়া উঠে এবং এখান হইতে সর্ব্বত্যাগী দেশসেবক ব্রতধারীগণ ভারতের প্রতি পল্লী-নগরীতে উপনিষদের বীর্য্যপ্রদ বলপ্রদ ভাবনিচয় বহন করিয়া লইয়া যান, মুক্তি, সেবা, সামাজিক উন্নয়ণ ও সাম্যের উদারবাণী প্রচার করেন;—এই আদর্শ কতটা সফল হইয়াছে এবং যোগ্য কর্ম্মী ও উপযুক্ত অর্থের অভাবে কতটা সফল হইতে পারে নাই, সে বিচারের আমি অধিকারী নহি। যাঁহারা মানবসেবব্রতে সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়া সঙ্ঘের কার্য্যে সর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়াছেন, তাঁহারাই এ প্রশ্নের মীমাংসা করিবেন!

আমরা আজ সঙ্ঘকে কয়েকজন সন্ন্যাসীর জীবনের মধ্য দিয়া দেখিব না, তাহা হইলে উহা আমাদের নিকট সীমাবদ্ধ হইয়া প্রকাশিত হইবে। ভবিষ্যৎ ইতিহাসের সামগ্রীরূপে ইহাকে দেখিলেই যথার্থরূপে দেখা হইবে। তখন আমরা দেখিব ভারতবর্ষ তাহার গভীরতম পতন হইতে উঠিয়া আসিবার জন্য প্রতিনিয়ত গূঢ় চেষ্টা করিতেছে, এই সঙ্ঘের সৃষ্টির মধ্যে তাহার পরিচয় রহিয়াছে। কোন অট্টালিকা সম্বন্ধে একথা বলা চলে যে ইহা যেমন দেখিতেছ, তেমনি, প্রয়োজনের সমস্ত তাগিদ পূরণ করিয়া আপন সম্পূর্ণতায় ইহা স্পষ্টভাবেই প্রকাশিত, কিন্তু একটী বীজ সম্বন্ধে একথা বলা যায় না। তাহার মধ্যে সচেতন প্রাণশক্তির যে মহিমময় রহস্য আছে, তাহার ইতি বা ইয়ত্তা করিবে কে? ভবিষ্যতের সেই বিপুল সম্ভাবনাকে আজ আমরা সাধকের ধ্যাননেত্রে সঙ্ঘের মধ্যে উপলব্ধি করিতে চাই—যুগান্তের অন্ধকারপট বিদীর্ণ করিয়া

যে আলোক আজ আসিয়াছে, আমাদের মনের সমস্ত দ্বার-বাতায়ন তাহার সম্মুখে অসঙ্কোচে উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিতে চাই ;—এখানে আগত ও অনাগত মানবমহত্ত্বের পুরোহিতগণ জয়শঙ্খধ্বনিতে যে কল্যাণবার্ত্তা ঘোষণা করিয়া ম্রিয়মাণ জাতিকে, শ্রেয়লাভের পথে পরিচালিত করিতেছেন ও করিবেন, সেই বিজয়যাত্রায় নির্ভয়ে যোগদান করিতে চাই।

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দ হইতে একাল পর্য্যন্ত রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের কার্য্য যেভাবে চলিয়া আসিতেছে, তাহা যে পর্য্যাপ্ত নহে, এই মহা-সম্মেলন সেই কথাই আজ আমাদের স্মরণ করাইয়া দিতেছে। সঙ্ঘ-নায়কগণ এই মহা সম্মেলন আহ্বান করিয়া সঙ্ঘের সন্ন্যাসী ও গৃহী উভয় শ্রেণীর কর্ম্মীকেই তাঁহাদের দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য একাগ্রচিত্তে স্মরণ করিতে উপদেশ দিতেছেন এবং ব্যাপকভাবে সমগ্র দেশবাসীর নিকট এই অশেষ কল্যাণের নিদান জাতীয়-প্রতিষ্ঠানের পরিপুষ্টি ও বিকাশের সহায়তার আবেদন উপস্থিত করিয়াছেন। কর্ম্মীর অস্বচ্ছন্দতা-প্রযুক্ত অথবা যোগ্য কর্ম্মীর অভাবে সঙ্ঘ এ পর্য্যন্ত যে সকল নির্দ্দিষ্টকর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন নাই, সেগুলি কোথায় কিভাবে আরম্ভ করা যাইতে পারে, সেজন্য সঙ্ঘের ছোটবড় সকল কর্ম্মীকেই স্ব স্ব মতামত ব্যক্ত করিয়া মিলিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার সুযোগ প্রদান করিয়াছেন। অতএব এই শুভ-অবসরে সঙ্ঘের যিনি প্রতিষ্ঠাতা যিনি আমাদের আচার্য্য ও গুরু, তাঁহার নিকট হইতে দায়স্বরূপ আমরা কি কার্য্যভার প্রাপ্ত হইয়াছি এবং তাহার সাফল্যের জন্য মানবকল্যাণব্রতী বর্ত্তমান সঙ্ঘ-নায়কগণের উপদেশানুসারে কার্য্য করিতে আমরা প্রস্তুত হইয়াছি কিনা, তাহা ভাবিয়া দেখা কর্ত্তব্য।

আপনারা সকলেই জানেন, আচার্য্যদেব পুনঃপুনঃ কহিয়াছেন,—এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ। "তমোহ্রদে নিমজ্জমান লক্ষ কোটি নরনারীর

উদ্ধার সাধনের ব্রত গ্রহণ" করিয়া নবীন ভারত গঠন করিবেন যাঁহারা —তাঁহাদিগকেই তিনি বারম্বার আহ্বান করিয়াছেন। মহত্ব ও পৌরুষের অবতার বিবেকানন্দ সমগ্র জাতিটাকে হীনতার পঙ্ক হইতে টানিয়া তুলিবার জন্য যে একদা তাঁহার বলিষ্ঠ বাহুদ্বয় নিয়োজিত করিয়াছিলেন, তাহার নিগূঢ় রহস্য আজ সাধকের ধ্যাননেত্রে আমাদিগকে উপলব্ধি করিতে হইবে। বেদান্ত প্রতিপাদ্য সত্য ধর্ম্ম বা আত্মতত্ত্ব প্রচার করিয়া, উপধর্ম্মের উৎপাতে কুসংস্কারগ্রস্ত সমাজ-জীবনের পঙ্গুত্ব ঘুচাইয়া, অগ্রসরগতি সঞ্চারের যে পথ স্বামিজী নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, আশঙ্কা হয় আমরা যে তাহা ঠিক ঠিক বুঝিয়াছি, এখনো তাহা আচরণ দ্বারা প্রমাণ করিতে পারি নাই! সমাজ সংস্কারকরূপে নহে, বিধানদাতারূপে নহে, কেবল "বীর্য্যপ্রদ উপনিষদের তত্ত্বগুলি ছাত্রের অধ্যয়নাগার হইতে মৎস্যজীবীর কুটীর পর্য্যন্ত" সমভাবে প্রচার করিবার জন্য, সমাজের সর্ব্বনিম্নস্তরে মুক্তির বার্ত্তা বহন করিয়া লইয়া যাইবার জন্য সঙ্ঘের নিকট স্বামী বিবেকানন্দ চাহিয়াছিলেন, একদল ব্রতধারী চরিত্রবান যুবক; আর তাহাদিগকে উপদেশ দিয়াছিলেন, "মূলদেশে অগ্নি সংযোগ কর, ক্রমশঃ অগ্নি উর্দ্ধদেশে উঠিতে থাকুক, একটি অখণ্ড ভারতীয় জাতি গঠন করুক।"

স্বামিজী আমাদিগকে তথাকথিত সমাজ সংস্কার হইতে বিরত থাকিতে আদেশ দিয়াছেন। স্বামিজীর এই অভিপ্রায়টি সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে না পারিয়া অনেকে সামাজিক কুসংস্কারের আনুগত্য স্বীকারই বুঝিয়া থাকেন। তখন তাঁহারা বিস্মৃত হন যে, সত্য ও লোকাচারের সহিত আপোষ করিবার কাপুরুষোচিত মনোবৃত্তি স্বামিজী সর্ব্বদা বর্জ্জন করিবার পরামর্শ দিয়াছেন। সঙ্ঘের যাঁহারা গৃহীসেবক তাঁহাদের অধিকাংশই গতানুগতিকতার মধ্যেই আত্মসমর্পন করেন। ছুঁৎমার্গ পরিহার, সর্ব্ব-বর্ণীয়ের আধ্যাত্মিক সত্যে সমান অধিকার স্বীকার ও সমর্থন, এক

বর্ণের বিভিন্ন শাখার মধ্যে বৈবাহিক আদান প্রদান ইত্যাদি সামাজিক সমুন্নতি সাধনের কার্য্য কেবল সন্ন্যাসীর নহে—সঙ্ঘের গৃহীভক্তগণেরই সর্ব্বাগ্রে পালনীয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহারা স্বামিজীকে যে পরিমাণ ভক্তি করেন, তাঁহার উপদেশ পালনে সে পরিমাণে আগ্রহ প্রদর্শন করেন না। অনেকে অনাবশ্যক দৈন্যবশতঃ মনে করেন, স্বামিজীর উদার আবেগময়ী উপদেশ,—দীন-দরিদ্র পদদলিতের উদ্ধার সাধনের সকাতর মিনতি কেবল সন্ন্যাসীর জন্য, গৃহীর জন্য নহে। এই ভ্রান্ত ধারণা দূর করিবার আবশ্যক হইয়াছে। গৃহীদিগের স্মরণ রাখা উচিত যে তাঁহাদিগকেই দেশাচার লোকাচারের ক্ষুদ্র গণ্ডীর বাহিরে আসিয়া স্বামিজীর ঈপ্সিত 'এক মহাবলশালী সমাজের সৃষ্টি' করিতে হইবে, 'যাহা আচণ্ডাল সর্ব্বজাতি এমন কি ম্লেচ্ছাদি বাহ্যজাতিকেও কুক্ষিগত করিয়া,' সনাতন ধর্ম্মের আদর্শ রক্ষার জন্য সমষ্টি শক্তির পীঠভূমিতে পরিণত হইবে।

বহু শতাব্দীর সুপ্তিশয্যা হইতে পুনরুত্থিত ভারতবর্ষের সেবা সজ্ঞানে ও সচেতন ভাবে কে বা কাহারা করিবেন?—"যে কেহ ইহাতে বিশ্বাস করিবে সেই প্রভুর কৃপায় মহাবীর্য্য ও ওজস্বিতা লাভ করিবে"—স্বামিজীর এই আশীর্ব্বাণী যে উচ্চ-নীচ গৃহী-সন্ন্যাসী নির্ব্বিশেষে সকলকেই আহ্বান করিতেছে! বন্ধুগণ, আসুন আমরা সকলে প্রস্তুত হই। মূহূর্ত্তের ইন্দ্রজাল দ্বারা সহজে এই কার্য্য সাধিত হইবে না। দীর্ঘকাল ধরিয়া এই দুঃসাধ্য উদ্যম, নিষ্ঠাপূত শ্রদ্ধার সহিত বহন করিবার যে শক্তি, ত্যাগ ও তপস্যার দ্বারা গুরু-নির্দ্দিষ্ট উপায়ে আমরা তাহা অর্জ্জন করিব। এই মহাসম্মেলন আমাদের সমস্ত বিভক্ত ও বিক্ষিপ্ত সামর্থ্য ও অধ্যবসায়কে যে ঐক্যের মধ্যে ডাক দিয়াছে, সে অহ্বান আজ যদি আমাদের অন্তঃকরণকে স্পর্শ করিয়া থাকে, তবে আমরা ধন্য হইলাম। ধন্য হইলাম, কেননা

নিজের অপূর্ণতার দুঃখ, তুচ্ছতার গ্লানি সকলের মিলন-সলিলে ধুইয়া নির্ম্মল হইলাম। সেই নির্ম্মল হৃদয় মন ও বুদ্ধিকে শ্রীরামকৃষ্ণের চরণে নিবেদন করিয়া দিয়া, আমরা যদি একত্রে নর-নারায়ণের মন্দির দ্বারে জীবনের অর্ঘ্যহস্তে দাঁড়াই, তবেই শুনিব "নবীন ভারতের ত্রৈলক্য-কম্পনকারী উদ্বোধনধ্বনি—ওয়াহ গুরুজিকী ফতে।" *

* শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রথম মহা-সম্মেলনে ১৯২৬ এর ৫ই এপ্রিল প্রদত্ত বক্তৃতা।

স্বদেশী যুগের স্মৃতি

বাঙ্গলার যে আন্দোলন পরবর্ত্তী কালে নিখিল-ভারত স্বাধীনতা আন্দোলনের মধ্যে ব্যাপক রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে,—সেই স্বদেশী আন্দোলনের সাফল্য ও ব্যর্থতা লইয়া আলোচনা খুব অল্পই হইয়াছে। চল্লিশ বৎসরের জাতীয় আন্দোলনের অভিজ্ঞতার ব্যবধান হইতে যদি আমরা অতীতের দিকে দৃষ্টিপাত করি, তাহা হইলে দেখিব, স্বদেশী আন্দোলন নিছক রাজনৈতিক আন্দোলন নহে—বাঙ্গালীর আত্মসম্বিৎ ফিরিয়া পাইবার আন্দোলন। দীর্ঘ এক শতাব্দীর ধর্ম্ম ও সমাজ-সংস্কার আন্দোলন,—ইংরেজী শিক্ষার মধ্য দিয়া পাশ্চাত্য সাহিত্য, দর্শন ও রাজনীতির ভাবধারা; মাইকেল, হেমচন্দ্র, নবীন, দীনবন্ধু, বঙ্কিম-অনুপ্রাণিত নবীন সাহিত্য,—শতাব্দীর শেষভাগে জমিয়া ভরিয়া উঠিল এবং এই সমগ্র যুগের ভাবধারাকে গ্রাস করিয়া—নব্য ভারতের দুই বিগ্রহ বাঙ্গলা দেশে দেখা দিলেন—বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ। বিবেকানন্দ সন্ন্যাসী অদ্বৈতবাদী—বেদান্ত দর্শনকে পারমার্থিকতার পরিবর্ত্তে বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করিয়া স্বদেশবাসীকে গোঁড়ামি, কুসংস্কার ও সামাজিক হীনতা হইতে টানিয়া তুলিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যোদ্ধা। রবীন্দ্রনাথ উপনিষদের ভাব-রস-পুষ্ট কবি, ভারতের শিক্ষা-সংস্কৃতিতে আধুনিক যুগোপযোগী সংস্কারের পক্ষপাতী। উভয়ের মধ্যে চিন্তা ও চরিত্রের পার্থক্য প্রচুর, দৃষ্টিভঙ্গীর স্বাতন্ত্র্যও সুস্পষ্ট। স্বদেশী আন্দোলনের পূর্ব্বেই বিবেকানন্দ মাত্র ৩৯ বৎসর বয়সে লোকান্তরিত,—পক্ষান্তরে, রবীন্দ্রনাথ স্বদেশী আন্দোলনের অন্যতম নেতা, জাতীয় ও আন্তর্জ্জাতিক ভাবধারার বাহক—

এবং তাঁহার দীর্ঘজীবনে তাঁহার স্বাধীন চিন্তা স্বচ্ছন্দে মত হইতে মতান্তরে—পথ হইতে পথান্তরে পরিভ্রমণ করিয়াছে। বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে তুলনামূলক বিচার করিবার স্থান ইহা নহে। বহু পার্থক্য সত্ত্বেও যে একই সাধনা তাঁহারা যুগধর্ম্মের নির্দ্দেশে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা হইল প্রাচ্যের সহিত পাশ্চাত্যের সমন্বয় ও সামঞ্জস্য বিধানের সাধনা। ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির উপর দৃঢ়পদে দাঁড়াইয়া—পূর্ব্ব ও পশ্চিমের ভাবধারার আদান-প্রদান, আধুনিক বিজ্ঞানকে বরণ, পাশ্চাত্যের বেগবান্ সামাজিক আদর্শবাদের প্লাবনে আত্মহারা না হইয়া, পরানুকরণপ্রিয় না হইয়াও উহাকে বিচারপূর্ব্বক গ্রহণ ছিল উভয়েই আদর্শ। স্বদেশী আন্দোলনের উপর এই দুই জীবন্ত প্রতিভার প্রভাব সর্ব্বাধিক।

সমস্ত দেশের প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করিয়া, লর্ড কার্জ্জন বঙ্গ ভঙ্গ করায় প্রতিক্রিয়ামুখে স্বদেশী আন্দোলন দেখা দিল, ইহা সম্পূর্ণ সত্য নহে। এই রকম একটা জাতীয় আন্দোলনের জন্য বাঙ্গলা দেশ বিগত শতাব্দীর শেষ দু শতক হইতেই প্রস্তুত হইতেছিল। ধর্ম্ম ও সমাজ-সংস্কার আন্দোলনের ব্যর্থতা ও বিকৃতির পণ্ডশ্রমে বিভ্রান্ত শিক্ষিত বাঙ্গালী সমাজ ক্রমে পাশ্চাত্য উগ্র জাতীয়তাবাদের দিকে ঝুঁকিতেছিল। মাৎসিনী, গারিবল্ডী, অনুপ্রাণীত ইতালীর জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের ভাবধারা ইয়োরোপ-প্রত্যাগত নব্যবাঙ্গালী স্বদেশে লইয়া আসিল। দক্ষিণ-আফ্রিকার বুয়োর যুদ্ধে মুষ্টিমেয় ঔপনিবেশিকের হস্তে প্রবল প্রতাপ বৃটিশ সাম্রাজ্যের অভূতপূর্ব্ব লাঞ্ছনা—বিজয়ী হইয়াও বৃটেনের দক্ষিণ আফ্রিকায় স্বায়ত্তশাসন দান ; রুশ-জাপান যুদ্ধে এশিয়াবাসীর হস্তে ইয়োরোপের প্রথম পরাজয় , পরাধীন এবং শ্বেতাঙ্গ-প্রভাবিত সমস্ত প্রাচ্য ভূখণ্ডে এক নূতন আশার সঞ্চার করিল। জাতীয় মুক্তির একটা অস্পষ্ট আকাঙ্ক্ষা—সমাজের শিক্ষিত ও সচেতন অংশকে দেশে দেশে আলোড়িত করিতে লাগিল।

এই আলোড়নের অন্যতম কেন্দ্র হইল, ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের রাজধানী কলিকাতা নগরী। সে কালের সরকারী ও বেসরকারী ইংরেজেরা, শিক্ষিত ও অশিক্ষিত ভারতবাসীর প্রতি অত্যন্ত উদ্ধত ও অবজ্ঞাপূর্ণ ব্যবহার করিত। পাঙ্খাকুলী ও চা'বাগানের কুলীর শ্বেতাঙ্গপদস্পর্শে প্লীহা ফাটিয়া মৃত্যু এবং বিচারে শ্বেতাঙ্গের হয় মুক্তি, নয় সামান্য জরিমানা, রেলগাড়ীতে পথে ঘাটে ইংরেজ ও গোরার গুণ্ডামীর সংবাদ সে কালের সংবাদপত্রে খুব বেশী আলোচিত হইত—শিক্ষিত যুবকেরাও আহত আত্মাভিমান লইয়া উহা আলোচনা করিতেন। বিদেশী ঘুসির বদলে স্বদেশী কিল ফিরাইয়া দিবার জন্য কলিকাতার তরুণ ব্যারিষ্টারেরা অখড়া তৈয়ারী করিলেন। এই আন্দোলনের অন্যতম উৎসাহদাত্রী ছিলেন, বিবেকানন্দ-শিষ্যা ভগিনী নিবেদিতা ও 'ভারতী' সম্পাদিকা সরলা দেবী। নিবেদিতা ঐ সকল আখড়ার যুবকদিগকে বলিতেন—,If you see oppression before your eyes and don't try to prevent it, you betray your duty"—তোমার চক্ষুর সম্মুখে অত্যাচার দেখিয়াও যদি প্রতিবিধানের চেষ্টা না কর, তাহা হইলে তুমি কর্ত্তব্যপালন না করিবার অপরাধে অপরাধী।

ইহা ছাড়াও সরকারী উচ্চপদ, ইংরেজ ও ভারতীয়ের বেতন বৈষম্য স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রভৃতি লইয়া শিক্ষিত ভারতবাসীর ক্ষোভ বাড়িতেছিল, নিখিল ভারত কংগ্রেসের অধিবেশনে বাৎসরিক যথানিয়মে এই 'আবেদন নিবেদনের থালি' রাজসরকারে পেশ করা হইত। নিরুপদ্রব বৃটিশ সাম্রাজ্যের শক্তি ও ঐশ্বর্য্যের মার্ত্তণ্ড তখন মধ্যাহ্ন-গগনে—নখদন্তহীন নিরস্ত্র ভারতবাসীর কাতর অনুনয় শাসকশ্রেণীর শুনিবার মত মানসিক অবস্থা নহে। বরং অনেকে অকৃতজ্ঞ ক্ষুদ্রের স্পর্দ্ধা দেখিয়া বিরক্তি ও ক্রোধ প্রকাশ করিতেন।

অতএব বারুদ প্রস্তুত ছিল—কেবল দীপশলাকার অভাব। লর্ড কার্জ্জন সেই শলাকা নিক্ষেপ করিলেন। দেখিতে দেখিতে দাবানলের মত সে আগুন সমস্ত দেশে ছড়াইয়া পড়িল। স্বদেশী ও বয়কট হইল নূতন আন্দোলনের বাণী। বিদেশী বর্জ্জন ও স্বদেশী গ্রহণের উৎসাহ কেবল শিল্পবাণিজ্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিল না। ছাত্র-সমাজ চঞ্চল হইয়া উঠিল—বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সর্ব্বনিম্ন শিক্ষায়তন পর্য্যন্ত 'গোলাম-খানা'রূপে অভিহিত হইল। স্কুল-কলেজের শিক্ষা দাস তৈয়ারীর শিক্ষা, অতএব জাতীয় বিদ্যালয় চাহি। বিদেশী শিক্ষা ও বিদেশীচালিত শিক্ষায়তনের বিরুদ্ধে আন্দোলন বৃটিশ শাসকদিগকে চঞ্চল করিয়া তুলিল—সংবাদপত্রে জাতীয় ভাব প্রচার ও বিদেশী শাসনের তীব্র সমালোচনা দেখিয়া তাঁহারা ভীত হইলেন।

১৯০৫—০৮; এই তিন বৎসরের মধ্যে বাঙ্গলা দেশের শিক্ষিত ও সচেতন অংশে ইহা এক অভিনব সামাজিক আলোড়ন। শিক্ষিত মধ্যশ্রেণীর উনবিংশ শতাব্দীর জমিদার ও ব্রাহ্মণ-শাসিত সমাজের রক্ষণ শীলতা শিথিল হইল, গণ্ডীবদ্ধ পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের অনেক কিছু ভাঙ্গিয়া চুরিয়া এক নূতন 'স্বদেশী সমাজের, উদ্বোধনের সূচনা হইল। সরকারী খেতাবধারী ও সরকারী চাকুরিয়া এত কাল যে মর্য্যাদা ভোগ করিতেন, তাহা বিলুপ্ত হইল। ইঁহারা দেশবাসীর ঘৃণা ও উপহাসের পাত্র হইয়া উঠিলেন। জাতীয় নেতা, কর্ম্মী ও শিল্পবাণিজ্যে অগ্রসর ব্যক্তিরা দেশবাসীর অভিনন্দন লাভ করিতে লাগিলেন। এই নবীন দেশাত্মবোধ; জাতি-অভিমান বাঙ্গালী-চরিত্রে এক আমূল পরিবর্ত্তন আনিল। বঙ্কিম-সাহিত্যে আমরা নব জাতীয়তাবাদ নূতন করিয়া আবিষ্কার করিলাম,—বিবেকানন্দের কণ্ঠে ভারতের জন্য আত্মোৎসর্গের আবেদন বাঙ্গালী যুবককে ঘরছাড়া করিল। কিন্তু স্বদেশী

আন্দোলন সমগ্র বাঙ্গালীর আন্দোলন নহে—শিক্ষিত সমাজের নেতৃত্বে বিশেষ ভাবে স্বাধীন উপজীবিকাসম্পন্ন আইনব্যবসায়ীদের নেতৃত্বে, ইহা বাঙ্গলার উচ্চশ্রেণীতে আবদ্ধ রহিল। হিন্দু-মুসলমান মিলনের জন্য বাহু বিস্তার করিয়া আমরা ফিরিয়া আসিলাম। কতক আন্দোলনের অন্তর্নিহিত দৌর্ব্বল্যে কতক রাজশক্তির ভেদনীতির কৌশলে মুসলমানেরা বিমুখ হইল। তথাপি এই আন্দোলন বাঙ্গলার সীমা অতিক্রম করিয়া মান্দ্রাজ, মহারাষ্ট্র ও পাঞ্জাবে প্রতিধ্বনি তুলিল। এই আন্দোলনের নেতারা জাতীয় উচ্ছ্বাসের দুর্দ্দমনীয় গতিবেগ লইয়া কংগ্রেসে প্রবেশ করিলেন —নিরীহ মিষ্টভাষী, মৃদুস্বভাব মডারেটদের দুশ্চিন্তার অবধি রহিল না।

বিদেশী বস্ত্র বয়কট ও স্বদেশী বস্ত্রের সমাদর—ভাবাবেগ বর্জ্জিত দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে অর্থ-নৈতিক কার্য্যক্রম। বিদেশী বস্ত্র, লবণ বয়কট করিতে গিয়া, ছাত্রসমাজ কিছুটা বলপ্রয়োগ করে, গভর্ণমেণ্ট উত্তরে পুলিশী বলপ্রয়োগ করিলেন। এই সরকারী দমন-নীতির সম্মুখীন হইবার মত কোন কার্য্যক্রম স্বদেশী নেতারা উপস্থিত করিতে পারেন নাই। বিপিনচন্দ্র যদিও এই কালে সংবাদপত্রে ও বক্তৃতামঞ্চ হইতে Passive resistance বা নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতেন, তথাপি কোন নেতা ব্যাপক ভাবে উহা বাস্তব আন্দোলনে পরিণত করিতে পারেন নাই। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে গান্ধীজী কার্য্যতঃ দক্ষিণ-আফ্রিকায় নিরুপদ্রব প্রতিরোধ আন্দোলন করিতেছিলেন,—কিন্তু বাঙ্গলার আন্দোলনে তাহা গৃহীত হয় নাই। কাজেই প্রচুর ভাবাবেগবহুল অথচ রাজনৈতিক কর্ম্মনির্দ্দেশহীন এই আন্দোলন রাজশক্তির বিরোধিতায়, পুনরুত্থানবাদী হিন্দু আন্দোলনরূপে বিবর্ত্তিত হইল।

অথচ আশ্চর্য্য এই, এই আন্দোলনের যাঁহারা নেতা, তাঁহাদের মধ্যে এক হীরেন্দ্রনাথ ব্যতীত কেহই আনুষ্ঠানিক হিন্দু নহেন। কেহ ব্রাহ্ম,

কেহ ব্রাহ্ম-সন্তান, কেহ বা গোস্বামী বিজয়কৃষ্ণের প্রেরণায় ব্রাহ্ম হইতে সত্ত বৈষ্ণব হইয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ, বিপিনচন্দ্র, অরবিন্দ, ব্রহ্মবান্ধব সকলেরই বিশিষ্ট ধর্ম্মসাধনা ও মত ছিল। রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম সমাজের গণ্ডীর মধ্য হইতে "স্বদেশী সমাজে" আসিলেন, বিপিনচন্দ্র ব্রাহ্ম-সমাজ ত্যাগ করিয়া বৈষ্ণব হইলেন, ব্রাহ্ম-সন্তান অরবিন্দ বেদান্তবাদী হইলেন। ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম, খৃষ্টান-ধর্ম্ম প্রভৃতি ধর্ম্ম হইতে ধর্ম্মান্তরে পরিভ্রমণ করিয়া রোমান ক্যাথলিক বেদান্তবাদী সন্ন্যাসী ব্রহ্মবান্ধব বর্ণাশ্রমের মহিমা কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। এই সকল নেতার রচনা ও বক্তৃতায় রাজনীতি ধর্ম্মোন্মাদনায় পর্য্যবসিত হইল। বিগত শতাব্দীর শিক্ষিত হিন্দুরা যে ভাবে হিন্দুত্ব ও হিন্দুয়ানীর মধ্যে সবই মন্দ দেখিতেন, স্বদেশী যুগের হিন্দুরা তেমনি হিন্দুয়ানীর গোঁড়া হইয়া উঠিলেন, হাঁচি, টিকৃটিকি হইতে উপবীত ও শিখার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বাহির হইতে লাগিল। গীতাপাঠ ও ব্রহ্মচর্য্যের ধুম পড়িয়া গেল। রাজনৈতিক সভায় আর্য্যধর্ম্ম ও প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার মহিমা কীর্ত্তন চলিল। গীতা ও চণ্ডীর মধ্যে আমরা ধর্ম্মযুদ্ধ ও অসুর নিপাতের বাণীতে অনুপ্রাণিত হইলাম। এই পুনরুত্থান বাদী হিন্দু আন্দোলনের প্রভাবে রবীন্দ্রনাথের গঙ্গাস্নান ও রাখীবন্ধনের ব্যবস্থা দান, বিপিনচন্দ্র-প্রমুখ নেতাদের শিবাজীর ইষ্টদেবী ভবানীপূজার আয়োজন—বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। স্বদেশী আন্দোলন বৃটিশ-বিরোধী আন্দোলন হইয়াও—ঘটনার ও রাজশক্তির চাপে একটা আধ্যাত্মিক আন্দোলন হইয়া উঠিল।

নেতারা যখন পথনির্দ্দেশ করিতে পারিলেন না এবং দমননীতির উগ্রতায় একে একে আন্দোলন হইতে সরিয়া গিয়া অধ্যাত্ম-সাধনার কথা বলিতে লাগিলেন, তখন অধীর যুবকশক্তি তলে তলে প্রলয় কাণ্ড বাধাইবার জন্ত প্রস্তুত হইল—ইতালীর কার্ব্বোনারী দলের অনুকরণে

গুপ্ত সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইল—বোমা পিস্তল লইয়া শাসকশ্রেণীকে হত্যার ভীতি দেখাইয়া দেশ স্বাধীন করিবার দুঃসাহসী সঙ্কল্প অন্ধকার পথে জীবন মরণ-তুচ্ছকারী অভিসারে বাহির হইল। ১৯০৮এর বিখ্যাত আলীপুর ষড়যন্ত্র মামলায় ইহার আরম্ভ এবং ১৯৩০এ চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পর এই অধ্যায়ের শেষ। বাঙ্গলার বৈপ্লবিক গুপ্ত আন্দোলনের এই ইতিহাস এক স্বতন্ত্র অধ্যায়।

স্বদেশী নেতাদের ভীরুতা এবং শেষরক্ষা করিবার অক্ষমতা এক দিকে,—অন্যদিকে তীব্র দমননীতি এবং মডারেটগণের জাতীয় আন্দোলনের বিরোধিতা, এই সকল মিলিয়া বাঙ্গলার যুবশক্তিকে বিহ্বল করিয়া তুলিল। নব জাতীয়তাবাদ ও দেশাত্মবোধ তাহাদিগকে সহজেই গুপ্ত আন্দোলনের দিকে আকর্ষণ করিল, আর একটা অংশকে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-প্রবর্ত্তিত সেবাধর্ম্মের দিকে লইয়া গেল।

স্বদেশী আন্দোলনে জাতীয় ঐক্যের বাণী ছিল, হিন্দু-মুসলমান মিলনের কথাও ছিল। কিন্তু পুনরুত্থানবাদী হিন্দুত্ব স্বদেশী আন্দোলনের অঙ্গীভূত হওয়ায়, উহা দ্বারা হিন্দুভাবাবেগ চরিতার্থ হইলেও মুসলমানদের মনে আর্য্য-বিভূতি ঘোষণা কোন রেখাপাত করে নাই। বহু বর্ষ পরে খিলাফৎ আন্দোলনে মহাত্মা গান্ধী মুসলিম ধর্ম্মের ভাবাবেগ জাগ্রত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। যে বৃটিশ রাজশক্তি ভেদনীতির চাতুর্য্যে মুসলমানদিগকে স্বদেশী আন্দোলনের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তাহা ব্যর্থ করিয়া ১৯২০-২১এ গান্ধীজী সেই শক্তিকে অসহযোগ আন্দোলনে বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

বহু শতাব্দীর চেষ্টায় ইয়োরোপ তাহার রাজনীতিকে ধর্ম্ম হইতে পৃথক করিয়াছে, লৌকিক ব্যাপারে পারলৌকিক প্রশ্ন জড়িত করিবার অভ্যাস হইতে ইয়োরোপ মুক্ত হইলেও,—আমরা এখনও মুক্ত হইতে পারি নাই।

বাঙ্গলার স্বদেশী আন্দোলন হিন্দু সমাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ হওয়ায়, স্বাভাবিক ভাবেই জাতীয় উন্নতির জন্য আর্য্য জাতির অতীত মহিমা দ্বারা ভাবাবেগ সৃষ্টির চেষ্টা করিয়াছিল। পরবর্ত্তী কালে অসহযোগ আন্দোলনেও গান্ধীজীর আধ্যাত্মিক জীবন ও সত্যাগ্রহের নৈতিক আদর্শের মিলিত প্রভাব রাজনৈতিক আন্দোলনে দেখা গিয়াছে। কংগ্রেসে, রাজনৈতিক সভায়,—মৌলানা ও স্বামীজীদের ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধর্ম্মের ব্যাখ্যার প্রতিক্রিয়ায় পরবর্ত্তী কালে জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনকে,—সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মোন্মাদনা অভিভূত করিয়াছে। মুসলিম লীগ ও হিন্দু-মহাসভা এই দুই সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান তাহার সাক্ষ্য। বহুতর ধর্ম্মমত এবং উপসম্প্রদায়-প্লাবিত ভারতে—ধর্ম্মকে রাজনীতি হইতে পৃথক্ করা কঠিন। এখন পর্য্যন্ত আমাদের নেতা গান্ধীজী উপবাসের আধ্যাত্মিক শক্তি, ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ প্রভৃতি রাজনৈতিক ব্যাপারে প্রয়োগ করিয়া দেশবাসীকে বিমূঢ় ও বিহ্বল করিয়া ফেলেন। ইন্দ্রিয়-পীড়ন, নিরামিষ আহার, বিবিধ আধ্যাত্মিক ব্যায়াম গান্ধীজীর দৃষ্টান্তে অনেক দেশকর্ম্মী অনুকরণ করেন। ধর্ম্মাচারণ ব্যাক্তিগত ব্যাপার এবং অনেকাংশে সামাজিকও বটে। কিন্তু সর্ব্বভারতীয় নিছক রাজনৈতিক স্বাধীনতা আন্দোলনের সহিত উহার মিলন মিশ্রণের ফল শুভ হয় নাই। পরাধীন জাতির মধ্যে প্রবল ধর্ম্মানুরাগ অথবা মৌখিক আনুগত্য,—আত্মাবমাননা হইতে নিষ্কৃতি পাইবার অথবা হীনতা ভুলিবার এক প্রধান অবলম্বন। সম্ভবতঃ এই কারণেই স্বদেশী যুগ হইতে আজ পর্য্যন্ত আমরা এমন বহু দৃষ্টান্ত দেখিয়াছি—যেখানে চাপে পড়িয়া অনেকেই আধ্যাত্মিকতার পথে রাজনীতি হইতে সরিয়া পড়িয়াছেন। কেবল কংগ্রেসে নহে মুসলিম লীগে ইহা অতিমাত্রায় অধিক প্রকট। স্বদেশকে দেবী মূর্ত্তিতে ধ্যান করিয়া ভাবানন্দে বিগলিত হওয়া, আর

"বিপন্ন ইসলাম"কে তাহার অতীত মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করার স্বপ্ন দেখা—একই মানসিক অবস্থা হইতে উদ্ভূত ; এবং এ দুই-ই রাজনৈতিক স্বাধীনতা আন্দোলনের অনুকূল নহে।

ধর্ম্ম নিজের অন্তর্নিহিত শক্তিবলে টিকিয়া আছে। ধর্ম্মের নামে পরস্পরের প্রতি বৈরতা প্রকাশকে ধর্ম্মানুরাগ বলিয়া বা ধর্ম্মরক্ষার, প্রতিষ্ঠার বা বিস্তারের উপায়-স্বরূপ গ্রহণ করিয়া রাজনীতি ক্ষেত্রে মাতামাতি করিলে চরিত্রের দুর্ব্বলতা প্রকাশ পায়, ইহা আমরা বুঝিতে পারি না। অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যাগুলি কৌশলে এড়াইয়া যাইবার উপায় হিসাবে ধর্ম্মকে রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিবার অপকৌশল প্রতিক্রিয়াশীলদের ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির কাজে লাগিয়াছে, কিন্তু বৃহত্তর সমাজ-মনকে ইহা প্রচুর বিদ্বেষ ও অন্ধ-গোঁড়ামী দিয়া অভিভূত করিয়াছে। ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনে ধর্ম্মকে যথাস্থানে রাখিয়া, জনসাধারণের লৌকিক স্বার্থ ও অধিকারের দিক্ ইহতে জাতীয় সমস্যা সমাধানের যাঁহারা পক্ষপাতী—তাঁহারা এ পর্য্যন্ত, ধর্ম্মের আবরণে প্রকাশিত প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলিকে ব্যর্থ করিতে পারেন নাই। বৈদেশিক শাসকশ্রেণীর পৃষ্ঠপোষকতা ও প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উৎসাহও ইহার পশ্চাতে রহিয়াছে। বাঙ্গালীর স্বদেশী আন্দোলনে হিন্দুর পুনরুত্থানবাদী ধর্ম্মভাব জাগ্রত হইয়াছিল স্বাভাবিক কারণে ; কোন নেতা বা নেতৃবৃন্দ উহা সৃষ্টি করেন নাই ; বরং তাঁহারাই উহা দ্বারা অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু অসহযোগ আন্দোলনে সচেতন ও সক্রিয় ভাবে গান্ধীজী হিন্দু-মুসলমানের ধর্ম্মানুরাগ রাজনৈতিক অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করিয়াছিলেন। হিন্দু-মুসলমান মিলিত হইয়া ধর্ম্মযুদ্ধের নৈতিক শক্তির কথা শুনিল—স্বরাজ, রামরাজ্য, তুর্কী-সুলতানকে খলিফার পদে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করাই ইস্লামের পুনঃপ্রতিষ্ঠা, অতএব হিন্দু-মুসলমান এক হও। কিন্তু অসহযোগ

আন্দোলনের ভাটার মুখে দেখা গেল, হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য তাসের ঘরের মত ভাঙ্গিয়া পড়িল। গান্ধীজী তিন সপ্তাহ উপবাস করিয়া ধর্ম্মান্দোলন-সঞ্জাত সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ঠেকাইতে পারিলেন না। সমস্ত বিংশ-দশক উত্তর-ভারতের বৃহৎ নগরগুলি হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গাহাঙ্গামায় অশান্তি-সঙ্কুল হইয়া উঠিল,—জাতীয় স্বাধীনতা অপেক্ষা আরতি, নামাজ, মসজিদের সম্মুখে বাদ্য প্রভৃতিই মুখ্য হইয়া উঠিল। এই সুযোগে বৃটিশ কায়েমী স্বার্থের উপর নির্ভরশীল দালালেরা আবার রাজনীতির আসরে জাঁকিয়া বসিল। আজ পর্য্যন্ত আমরা এই দুর্ব্বুদ্ধির জের টানিয়া চলিয়াছি।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ঝড়-ঝঞ্ঝায় বিপর্য্যস্ত পৃথিবী পুনরায় আত্মস্থ হইতে চলিয়াছে। ভারতের জাতীয় স্বাধীনতা-কামীরা আন্তর্জ্জাতিক মিলনের মধ্যে পরস্পরের উপর নির্ভরশীল মানব-স্বাধীনতার মধ্যে জাতীয়-স্বাধীনতা লাভের কামনায় অধীর। এই অবস্থার মধ্যে ভারতে জাতীয় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ সম্পূর্ণ বিপরীত পন্থায় কেন্দ্র-বিশ্লিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। ধর্ম্মের ভিত্তিতে দেশকে খণ্ড-বিখণ্ড করিবার প্রস্তাবও কড়া সুরে শুনান হইতেছে। হিন্দু-মুসলমান সকলেই বিহ্বল। গত মহাযুদ্ধে পরাজিত সাম্রাজ্যহীন তুর্কী-জাতি কামাল আতা-তুর্কের নেতৃত্বে—ধর্ম্ম হইতে রাষ্ট্রকে পৃথক্ করিয়াই, আজ শক্তিমান্ জাতিরূপে বিশ্বের দরবারে আসন করিয়া লইয়াছে। বৃটিশ অধিকৃত মিশরেও, একদা ভারতের মতই ভেদনীতি প্রয়োগ করা হইয়াছিল। ১৮৮২ সালে বৃটেন সামরিক শক্তি লইয়া মিশরে প্রবেশ করে এবং ১৯১৪ সালের ১৮ই ডিসেম্বর মিশর আশ্রিত রাজ্যরূপে ঘোষিত হয়। জাতীয় স্বাধীনতা অন্দোলনের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদীরা সংখ্যা লঘিষ্ট সম্প্রদায়ের রক্ষাকর্ত্তার ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। সংখ্যালঘিষ্ট কোপ্তদের (খৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী প্রাচীন মিশরীদের বংশধর) অভিভাবক সাজিয়া

বৃটিশ শাসকগণ সাম্প্রদায়িক ভেদবাদকে প্রবল করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু জগ্‌লুল পাশার নেতৃত্বে ওয়াফদ দল জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯২২ এর ফেব্রুয়ারী মাসে "আশ্রিত রাজ্যের" পরিবর্ত্তে মিশর স্বাধীন বলিয়া ঘোষিত হয়। এই ভিত্তিতে ইঙ্গ মিশরীয় সন্ধির পর হইতে আর কেহ সংখ্যা লঘিষ্ঠের দাবীর কথা শুনে নাই। মিশরের জনসংখ্যার শতকরা ৯৯'৪০ জন মুসলমানের সহিত শতকরা ৮'১৯ ভাগ খৃষ্টান আজ একই মিশরীয়রূপে পরিচিত। মিশরের জাতীয় দল জগলুলের নেতৃত্বে যে ভাবে সাম্রাজ্যবাদীদের ছলনা জাল ছিন্ন করিয়া জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, ভারতেও আমরা তেমনি নেতৃত্বের প্রত্যাশা করিতেছি, যাহা ধর্ম্মকে রাষ্ট্রীয় ব্যাপার হইতে পৃথক্ করিয়া জাতীয় স্বাধীনতার সমস্যা সমাধান করিবে।

১লা জুন, ১৯৪৫

নামকরণ

নাতির মুখ দেখিবার আনন্দে ডগমগ হইয়া আছি, এমন সময় কানে আসিল, 'দাদু'র ভাল নাম কি রাখা যায়, তাহা লইয়া জল্পনা-কল্পনা চলিতেছে। আমার সিদ্ধান্তই চরম না'ও হইতে পারে তবুও পারিবারিক মর্য্যাদার দিক হইতে আমার পরামর্শ একেবারে বাদ দেওয়া চলে না। হাজার হউক, আমি ঠাকুরদাদা।

এমনি একটা অবস্থায় কুণাল নামটার অনুকূলে সকলেই ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে।

"কুণাল? দু'হাজার বছর পূর্ব্বের সেই ঐতিহাসিক দুর্ঘটনা—তিষ্যরক্ষিতার বিয়োগান্তক স্মৃতি—সাম্রাজ্যবাদের কূটনীতির কাণ্ড-কারখানা, এই ক্ষুদ্র পরিবারের মধ্যে—"

"অত কথা আমাদের মনে পড়েনি। প্রাচীন যুগের কোন ঐতিহাসিক পুরুষের স্মৃতি রক্ষার সঙ্কল্প আমাদের নেই। ভেবে দেখুন, কুণাল নামটা···কেবল নামটা,—ঝরঝরে, অথচ একটা ঋজু আভিজাত্যের আমেজ দেয়। একেবারে অভূতপূর্ব্ব নয়, অথচ সচরাচর শুন্‌তে পাওয়া যায় না। সাদাসিধে অথচ একেবারে সাধারণ নয়। কুণাল শব্দটা একটা মোহ আনে, অথচ অভিভূত করে না।"

"বুঝলাম কাব্যের সুষমা থাক্‌বে অথচ একেবারে বাজারচলন হবে না। তাহলে মৃণাল নামটা মন্দ কি?"

"মৃণাল! মৃণাল! কই অমিয়া তুমি তো মৃণাল নামটা কখনো বলনি! তোমার কি মনে হয় না মৃণালের সঙ্গে ওর চেহারা আর গড়নের একটা

সাদৃশ্য আছে। বেশ নামটি, সরল অথচ কঠিন। খদ্দরের মত অমসৃণ কিন্তু শুভ্রতার মাহাত্ম্যে ভরা। প্রাচীন কবিরা ঐ নামটিতে কত মাধুর্য্য ঢেলে দিয়েছেন—প্রভাতের নবারুণ রাগ, নির্মেঘ আকাশ, আর নির্ম্মল সমীরণের স্মৃতিভরা মৃণাল !—"

পরের বৈঠকে আলোচনা সুরু হইবামাত্র বুঝিলাম মৃণাল বাতিল হইয়াছে। প্রতিকূলে যুক্তি অনেক। একেতো "কণ্টকে গড়িল বিধি মৃণাল অধমে" তাহার উপর বাগবাজার-গন্ধী। প্রফুল্ল ঢের ভাল নাম। প্রফুল্ল—যেন বসন্তের আভাষ, আনন্দ ও গন্ধে ভরা। অধরোষ্ঠের মনোহর ভঙ্গীর অন্তরাল হইতে রসনায় চটুল নৃত্য করিয়া যেন গড়াইয়া গলিয়া পড়ে—প্রফুল্ল ! আর এর পারম্পর্য্যও অফুরন্ত—আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের কৃপায় কাপড়ের কল, বীমা কোম্পানী, ব্যাঙ্ক হইতে খঁটি সরিষার তৈল মায় ঢেকী ছাঁটা চাউল পর্য্যন্ত ইহার বিস্তৃতি।

আলোচনায় বাধা দিয়া আমি বলিলাম, "এই পারম্পর্য্যের ধারায় "সর্ব্বাধিক" প্রচারিত দৈনিকের 'প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক', প্রফুল্ল সরকারের অবদানও কম নয়।"

"অবিশ্যি ভাল মন্দ বিচার কর্ত্তে গেলে কোন দিকেই কূল পাওয়া যাবে না। নামটাই হচ্ছে আসল কথা"—উৎসুক জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে অমিয়া চাহিল।

"আচ্ছা রবীন্দ্র নামটা তোমার মনে পড়েনি ?"

"পড়েনি ? বলেন কি ? একদিন সারা সকালবেলা ঐ নিয়ে কাটলো, ওটা যে কেমন করে কথার ফাঁক দিয়ে তলিয়ে গেল, তা ভাল করে মনে পড়ছে না। অমিয়া, তোমার মনে আছে ?"

"তুমিই তো বল্লে 'ন্দ্র'-অন্তক নাম ভিক্টোরিয়া যুগের সাবেকী চাল।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ—ও ছাড়াও 'নাথের' বদলে 'শঙ্কর' 'গোবিন্দ' 'নারায়ণ' যোগ করে অনেক নাম নিয়ে আলোচনা হ'ল। কিন্তু এই গণতন্ত্রের যুগে ও সব জমিদারী লম্বা চওড়া নাম একেবারেই অচল।"

"হাল কায়দায় মধ্যপদলোপী নামই যদি রাখতে চাও, শশাঙ্ক, মৃগাঙ্ক···চার অক্ষরে চন্দ্রমৌলী, বৃকোদর, হিরণ্ময় ইত্যাদি। লোকের কানে তালা লাগাতে চাও, ধূর্জ্জটি, বিরূপাক্ষ, বুদ্ধদেব। যুঁই ফুলের মত ছোট অথচ ভাবে ভরা—"

"আপনি থামুন মাথা গুলিয়ে যাচ্ছে।"

এমন সময় টেলিফোনের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। মাতুল—ফরোয়ার্ডব্লক পন্থী মাতুল অপর প্রান্ত হইতে বলিলেন, "শুনছেন আমরা ঠিক করে ফেলেছি। ভাগ্নের নাম হবে সুভাষ। সুভাষ—ব' নয়।

আমি ইতস্ততঃ করিয়া বলিলাম, "জানতো অনেক রাজনৈতিক দলের কর্ম্মীদের সঙ্গে মিশতে হয়। ত্রিপুরীর পর যা সব ঘটলো তাতে ঐ কংগ্রেসী কোন্দলের স্মৃতিভরা···শ্রদ্ধা সত্ত্বেও···জানকি, হাঙ্গামায় জড়াতে চাইনে"—

"এই ভাঙ্গা গড়ার যুগে···ও সব ধরতে গেলে চলে না···সকলে মিলে আবার···অর্থাৎ কিনা এ ব্যাপারে সকলেই···কার তারা কখন ওঠে··· কে জানে···

"তা'হলে ললিত নামই রাখা যাক, সময় বুঝে ললিতকে লেনিন করতে কতক্ষণ।"

"আপনি···হাসির কথা নয়···আমি সিরিয়াস ··"

"তুমি বুঝছো না···সুভাষ···মানে"—কড়া জবাব আসিল, "তবে গান্ধী প্রসাদ নাম রাখুন, বেহার গভর্ণমেণ্টে চাকরী মিলতে পারে।"

নরম হইয়া বলিলাম—"এ সব খ্যাতিমান লোকের নাম···সে ঠিক—এতবড় একটা দেশজোড়া নাম খ্যাতি বাদ দিয়ে ভাবা যায় না।"

"তবুও এর সরল নির্ম্মল, অথচ তপস্বী সুলভ কাঠিন্যের আভাষটাও ভেবে দেখবেন।"

"ভাবতে ভাবতে তো বাপু অনিদ্রা ও অজীর্ণ রোগ হবার উপক্রম··· একটা আধুনিক অথচ মানানসই···উগ্রও নয় আবার মেয়েলীও না হয়···"

ক্রুদ্ধ উত্তর আসিল,—"তা'হলে দুর্গা বলে ঝুলে পড়ুন। সনাতন অথচ শক্তির প্রতীক···দুর্গামোহন, দুর্গাকিঙ্কর, দুর্গাদাস···।" টেলিফোনের হ্যাতল পড়িল।

"আপনার সুভাষ নামটা বুঝি পছন্দ হয় না।"

"আমি কি বলেছি যে, সুভাষ নামটা আমার আদৌ ভাল লাগে না?"

মাস খানেক আলোচনাটা ঘন মেঘের মত স্তব্ধ হইয়া রহিল। সকলের মুখেই চিন্তার গাম্ভীর্য্য অথচ কেহ মুখ ফুটিয়া কিছু বলে না। সংসারের উপর একটা চাপা অস্বস্তি। এমন সময় দাদুর মাসী আসিয়া লঘুহাস্যে থমথমে ভাবটা কাটাইয়া দিল।

সেদিন পারিবারিক সান্ধ্য বৈঠকে কথাটা যখন উঠিল তখন দেখি, মৃণাল, প্রফুল্ল প্রভৃতি বহু নামের মত সুভাষও চাপা পড়িয়া পুনরায় কুণাল আবির্ভূত হইয়াছে, কুণাল শান্তি করুণা ও মৈত্রীর আভাষ দেয় অথচ আধুনিকতার মসৃণ ঔজ্জ্বল্যে চিত্তাকর্ষক। যাহার নাম কুণাল হইবে সে লোকের একটা ভালবাসা ও সম্ভ্রম না পাইয়া যায় না।

আমি টাকে হাত দিয়া উদাসভাবে বলিলাম, "ভাল যদি তোমাদের লাগেই আমি আপত্তি করবো কেন? যে নামই রাখ আর যে নামেই ডাক আমার তো সর্ব্বজনীন 'দাদু' বলেই ডাক্‌তে চিরদিন ভাল লাগবে, তবে কি না ও 'কু'এর বদলে সু,ই ভাল। এই ধর 'সুন্দর'।"

"না না—ও অশ্লীল—একেবারে বিদ্যেসুন্দর।"

"তা' হলে দক্ষিণে যাও—'সুব্রহ্মণ্যম', বাঙ্গলায় একেবারে নূতন।"

"আপনি আবার বক্‌তে স্থরু কর্‌লেন! সুভাষ নামটা কি আর আমরা ভাল করে ভেবে দেখিনি? স্বীকার করি, রোমান্স না থাকলেও নামটা রোমান্টিক। তবুও আমরা পছন্দ করতে পারলাম না—এই নিরুদ্দেশ ও নিমাই সন্ন্যাস। গণ-সংগ্রামের পরিচালক, গণতান্ত্রিক দলের নেতা, শ্রদ্ধানন্দ পার্কে ভোট না নিয়ে নিরুদ্দেশ হলেন; এ থেকে যে একটা নাৎসী স্বৈরাচার মেশানো আধ্যাত্মিকতার আমেজ পাওয়া যায়···এমন নাম···ছেলেটার···"

আমি বলিলাম,—"আবার তোমরা নামটিকে ব্যক্তির সঙ্গে জড়িয়ে ভাবছো। জীবন যুদ্ধে রাজনৈতিক সংঘর্ষের ধূলিজালের উর্দ্ধে উঠে দেখ—নামটি কি সুন্দর কবিত্বময়!"

উহারা অপ্রসন্ন মুখে উঠিয়া গেল। অন্নপ্রাশন আসন্ন আর জল্পনা কল্পনা নয়। দাম্পত্য যুদ্ধের হেড কোয়াটার হইতে সর্ব্বশেষ বুলেটিন বাহির হইল কুণালই ঠিক!

অন্নপ্রাশনের আয়োজন স্থরু হইয়াছে। বাজার হইতে ফিরিতে দেরী হইল। একটু বিশ্রাম করিয়া অনুষ্ঠানক্ষেত্রে উপস্থিত হইলাম। দু'চার জন সখীর সহিত অমিয়া হাস্য পরিহাস করিতেছে এমন সময় গম্ভীর কণ্ঠে পুরোহিত জিজ্ঞাসা করিলেন—"জাতকের নাম কি ঠিক করিয়াছেন?" স্তম্ভিত হইয়া শুনিলাম অমিয়া অম্লানবদনে কহিল, চণ্ডী দাস। চণ্ডীদাস! মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলাম না কেন?

চেয়ারে বসিয়া চুরুট টানিতে টানিতে পূর্ব্বাপর ভাবিতেছি এমন সময় অমিয়া আসিয়া আবদারের ভঙ্গীতে চেয়ারের হাতলের উপর বসিল, গদগদ কণ্ঠে বলিল,—"তা দেখুন নাম বাছাই করতে করতে ধৈর্য্য আর রইল না—মরিয়া হয়ে উঠলাম। হঠাৎ কালরাত্রে স্বপ্ন দেখলাম, গাঁয়ের চণ্ডীতলা···মা যেন রক্তমাংসের···খোকনের দিকে চেয়ে হাসছেন। ঘুম

ভেঙ্গে দেখি ভোরের আলো···অমনি মনে ভেসে উঠলো, চণ্ডীদাস। হাজার হোক বাঙ্গলার একজন অমর কবির নাম তো! আপনাদের আশীর্ব্বাদে বেঁচে থাক্‌লে, আমার চণ্ডী একদিন···

"শেষকালে চণ্ডীঠাকুর। ইস্কুলের সিনেমা দেখা ছেলেরা যে ক্ষেপাবে মা—চণ্ডীঠাকুর একি সত্যি!"

"কি যে বলেন আপনি—বড় হয়ে ও নিশ্চয় এই নামের গর্ব্বে নেচে বেড়াবে।"

কয়েকদিন পরে—

"দেখুন;—আপনার শত্তুর কাল রাত্রে একটু জ্বর···

"কার? তোমাদের চণ্ডীদাসের?"

"একটা নাম রাখতে হয়, তাই। ঐ নামটা কি কর্ণের সহজাত বর্ম্মের মত আমরা ওর গায়ে এঁটে দিয়েছি! ভাবছি কুণালই হবে ওর আসল নাম।"

আমি চক্ষু কুঞ্চিত করিয়া কহিলাম, "কেন যে স্বভাষ···"

২৫শে বৈশাখ, ১৩৪৮

স্বর্গীয় চোঙ্গদার

সকাল বেলা চায়ের বাটিতে চুমুক দিতে দিতে প্রসারিত সংবাদপত্রের দিকে চাহিয়া চমকিয়া উঠিলাম। "পরলোকে বাঙ্গলার বণিকবীর চোঙ্গদার"—অকস্মাৎ হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া তাঁহার বালীগঞ্জের প্রাসাদে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন। চোঙ্গদারের নাম জানা ছিল। পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে আমার পিতৃদেব পুত্রের ভবিষ্যৎ নিরাপদ করিবার জন্য চোঙ্গদারের চা বাগানের বার হাজার টাকার শেয়ার কিনিয়াছিলেন। চোঙ্গদারের কৌশলে শেয়ারের বাজারে হরিণমারী টি কোম্পানীর ১০০৲ টাকার শেয়ারের দর যখন ২৭৲ টাকায় নামিল তখন পিতা অধৈর্য্য হইয়া শেয়ারগুলি বেচিয়া দিলেন। কিন্তু দু'বৎসর পর টি কোম্পানী ফাঁড়া কাটাইয়া সগৌরবে লভ্যাংশ ঘোষণা করিল, অবশ্য তখন শতকরা ৯৫টা শেয়ারই চোঙ্গদার হস্তগত করিয়াছেন। তারপর ১৭টা কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর চোঙ্গদারের বিস্ময়কর কর্ম্মজীবনের বড় বেশী খোঁজ খবর রাখি নাই। আজ সংবাদপত্র পড়িয়া বুঝিলাম, বাঙ্গলা দেশের কি অপূরনীয় ক্ষতি হইল, কতবড় একজন মহাপুরুষ জাতিকে অনাথ করিয়া চলিয়া গেলেন। বড় বড় জননায়কের মৃত্যুতে যে ভাবে সংবাদ দেওয়া হয় এ ক্ষেত্রেও তাহার ত্রুটি হয় নাই। চোঙ্গদারের বিভিন্ন বয়সের ছবি, তাঁহার পুষ্প মাল্যে আবৃত মৃতদেহের সহিত বিভিন্ন কোম্পানীর বিশেষ কর্ম্মচারীদের গম্ভীর মুখগুলির প্রতিকৃতি, তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধানিবেদনের জন্য যাঁহারা বাড়ীতে বা শ্মশানে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের নামের সুদীর্ঘ তালিকা এবং বিশিষ্ট নাগরিকদিগের বাণী। তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনচরিতে সমস্ত বাঙ্গলাদেশ এই প্রথম জানিল, স্বদেশী আন্দোলনের বাণীতে

অনুপ্রাণিত যুবক চোঙ্গদার ; নিঃসম্বল কিন্তু চরিত্র সম্পদে সমৃদ্ধ চোঙ্গদার কলিকাতায় আসিয়া জুতা ও লেখার কালি, দিশি এসেন্স পমেটম ইত্যাদি ফিরি করিতে আরম্ভ করেন। সেদিন কে জানিত বাঙ্গলার জাতীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠার অগ্রদূত চোঙ্গদার বঙ্গলক্ষ্মীর ঝাঁপি রাশি রাশি স্বর্ণপদ্মে ভরিয়া তুলিবেন। বাঙ্গালীর অন্ন, কর্ম্ম ও চাকুরী পাইবার প্রতিষ্ঠানগুলি যিনি গঠন করিয়াছেন, সেই চরিত্রবান, ধর্ম্মানুরাগী, সততা ও সাধুতায় অমায়িক মিষ্টভাষী চোঙ্গদার একজন খাঁটি বাঙ্গালী ছিলেন। তাই বাঙ্গালীর নিজস্ব ধর্ম্ম গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধনাকে তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রাচীন কৃষ্টির সহিত আধুনিক সংস্কৃতির সমন্বয়ে চোঙ্গদারের ব্যক্তিত্বের একটা অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য ছিল। 'স্বরাজের' সম্পাদক বিলাপ করিয়া লিখিয়াছেন,—"গুণের আদর করিতে অক্ষম বাঙ্গালী আজ বুঝিল না যে সে কি হারাইল। হায়, বঙ্গমাতার মুখোজ্জ্বলকারী সন্তান চোঙ্গদার মহাশয়ের অসংখ্য অবদানের কতটুকু আমরা বরণ, গ্রহণ ও অনুসরণ করিতে পারিলাম! পরাধীন জাতির এমনি মানসিক দৈন্য, কিন্তু স্বাধীন বাঙ্গলা চোঙ্গদারের স্বুবর্ণ মুর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিবে।...তাঁহার আত্মজীবনী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাধ্যতামূলক পাঠ্য পুস্তক হইবে।"

ভক্তিতে বিস্ময়ে গদগদ হইয়া এই অদ্ভুত বণিকবীরের সাফল্যমণ্ডিত জীবনের কীর্ত্তি পাঠ করিতেছি, এমন সময় 'স্বাধীনতা' সম্পাদক অধিকারী টেবিলের উপর এক তাড়া খবরের কাগজ রাখিয়া বসিতেই, মুখ তুলিয়া বলিলাম, "চোঙ্গদার মশাই মারা গেলেন।"

অধিকারী তাচ্ছিল্যের ভঙ্গীতে সিগারেটের ছাই ঝাড়িয়া বলিল,— "বাঙ্গলাদেশ একজন খাঁটি জুয়াচোর হারাল। তাও হয়তো হল না। মিলিটারী ঠিকাদারী আর চোরাবাজারের কল্যাণে অনেক চোঙ্গদার বঙ্গজননীর কোল আলো করে বসেছেন।"

"জুয়াচোর!"

"চলতি ভাষায় কথাটা গালাগালি কিন্তু বাণিজ্য-নীতিক পরিভাষায় ঐটেই হ'ল পয়সা রোজগারের একমাত্র প্রশস্ত অথচ দুর্গম পথ! এ পথ, "কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়"—তাই দুর্ভাগারা তাদের চোর, জুয়াচোর বাটপাড় বলে ঈর্ষার জ্বালা মেটায়। জুয়াচুরী ছাড়াও আরও অনেক সদগুণ চোঙ্গদারের ছিল। নৈলে ঐ রকম একটা বর্ব্বর······ হৃদরোগ। অমন হৃদয়বানের হৃদয়রোগ ছাড়া আর কি হবে। ৬০ বৎসর—টানা ২৫ বৎসর লোকটা কি বিপুল বিত্তই না উপার্জ্জন ও ভোগ করেছে। 'স্বাধীনতায়' আমি কি লিখেছি দেখ, "জন্মগত ব্যবসায় প্রতিভার সঙ্গে মানবদুর্ল্লভ বহু সদগুণে পূর্ণ চরিত্রবান চোঙ্গদার একটা আদর্শ জীবন বাঙ্গালীর সম্মুখে রাখিয়া চলিয়া গেলেন। বাবুই পাখী যেমন অনায়াস নৈপুণ্যে আশ্চর্য্য বাসা গড়িয়া তোলে, তেমনি নীরব কর্ম্মী চোঙ্গদার প্রতিদিনের সাফল্যের সমষ্টিভূত স্বীয় কীর্ত্তিস্তম্ভের উপর স্বুবর্ণকুম্ভ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালী আমরা, চোঙ্গদারের গৌরবময় জীবনের সফল সৃষ্টির উত্তরাধিকারী আমরা;—তাঁহার কীর্ত্তিস্তম্ভের বেদীমূলে অকপট শ্রদ্ধার অর্ঘ্য নিবেদন করিয়া ধন্য হইলাম।"

"স্বাধীনতার' সম্পাদকীয় প্রবন্ধ পাঠ করিতে করিতে বলিলাম, "তুমি ঠাট্টা করছো অধিকারী আসলে তুমি তাকে শ্রদ্ধা করতে। তোমার সঙ্গে তো তাঁর দীর্ঘকালের ঘনিষ্টতা ছিল। নৈলে অমন দরদ দিয়ে লিখতে পারতে না।"

অধিকারী অপ্রতিভ না হইয়া বলিল, "ঘনিষ্ঠতা খুব বেশীই ছিল। বিশ বছর—কম কথা নয়। ওর আত্মপ্রচারের আমিও ছিলাম অন্যতম বাহন। ওর প্রতি আমার একটা আকর্ষণ ছিল বটে, কিন্তু ঐ মনোহর পাষণ্ডটাকে শ্রদ্ধা করা কঠিন। সাহিত্য জগতে ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস অতি

নীচু স্তরের, তবু অধিকাংশ লোক যেমন ওতে আকৃষ্ট হয়,—ওর প্রতি আমার অনুরাগ অনেকটা সেই রকম। ডাক্তার নরদেহের কুৎসিৎ ক্ষতকে যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি দিয়ে দেখেন,—সমাজ বিজ্ঞানীর দৃষ্টি দিয়ে আমিও তেমনি ভাবে ওকে পর্য্যবেক্ষণ করেছি। এত বড় ভণ্ডকে কাছে থেকে দেখার সুযোগ কত দুর্ল্লভ। একথা তোমাকে মানতেই হবে, বহুলোক্‌কে বঞ্চনা ক'রে যারা বছরে ৪।৫ লাখ টাকা রোজগার করে, তাদের সঙ্গে বন্ধুত্বের সৌভাগ্য আমাদের মত লোকের সচরাচর হয় না। এরা আশ্চর্য্য জানোয়ার, দিনে পাই পয়সা নিয়ে শেয়ারের বাজারে কুকুরের মত কামড়া কামড়ি করে, পরস্পরকে ধাপ্পা দেবার জন্য পাগলের মত মরিয়া হয়ে উঠে; আবার রাত্রে এরাই ক্ষেত্র বিশেষে হয় সহজদাতা। কিন্তু সব জেনে শুনেও লিখতে হয় আর এক রকম। ফটোগ্রাফে যা ধরা পড়ে তা আর্ট নয়, চিত্রকরের তুলির টানে, নানা রং এর সামঞ্জস্যে যা ফুটে ওঠে, তাই হয় রসোত্তীর্ণ। সাংবাদিকও সাহিত্যিক, অর্থাৎ আর্টিষ্ট, ফটোগ্রাফার নয়। সংবাদপত্রের মূলনীতি অর্থাৎ মালিকের অভিপ্রায়ের দিক থেকে আমাদের ঘটনা ও জীবনকে রূপায়িত করতে হয়। যে চোঙদার মরে গেল,—তার মৃত্যুই হ'ল। যে চোঙদার দেশবাসীর শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে রইল, সে আমার সৃষ্টি।"

"এতটা সিনিক না হলেও পার অধিকারী।"

"সিনিক্? তুমি হাসালে। তুমি উকীল, স্বাধীন বৃত্তিজীবি; তোমার বিবেকের স্বাধীনতা কতটুকু? আদালতে চোর, প্রতারক, জালিয়াৎ, নারীহরণকারীকে সাধু ও নির্দ্দোষ প্রমাণ করে তুমি বিচারককে ফাঁকি দাও, রোজগার কর হাজার হাজার টাকা। আর আমি অতি সামান্য বেতনে, প্রবলের দ্বারা নির্জীত একটা জাতির পক্ষে ওকালতী করি, জাতীয় গৌরব বৃদ্ধির জন্য কিছু অতিরঞ্জিত করে জাতীয় বীর সৃষ্টি করি,

আমি হলুম সিনিক! না ভাই আমি নৈষ্ঠিক জাতীয়তাবাদী। আসল চোঙ্গদারকে দেশের যুবকশক্তি ধিক্কার দেবে, নিষ্ঠুর নৃশংস শোষক চোঙ্গদার তাদের কমিউনিজমের দিকে ঠেলে দেবে; কিন্তু নকল চোঙ্গদার; নিরামিশভোজী, খদ্দর আচ্ছাদিত দেহ চোঙ্গদার জাতীয়তাবাদী ধনীদের প্রতি তাদের শ্রদ্ধালু করে তুলবে। চোঙ্গদারের কোম্পানীগুলিকে তারা শোষণযন্ত্র না ভেবে, জাতীয় প্রতিষ্ঠান, জাতীয় সম্পদরূপে দেখ্‌বে। চোঙ্গদারের মিলের কাপড় তারা দুঃখিনী বঙ্গজননীর "মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়" বলে মাথায় তুলে নেবে। জাতিকে বড় করতে হ'লে জাতীয় বীর চাই—বীর পূজা না করে কোন জাত বড় হয় না। এই বীর রোজ রোজ জন্মায় না, আমাদের রাজনীতি অর্থনীতির প্রয়োজনে এই বীর সৃষ্টি করতে হয়। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,—"আসল রামের চেয়েও রামায়ণের রামকে বড় করে তোলা কবির কাজ। তাই রাম না জন্মাতেই রামায়ণ লেখা হয়েছিল। সমাজে যখন রামের প্রয়োজন হয়, তখন স্বাভাবিক ও বাস্তব রামের জন্য প্রতীক্ষা করা চলে না! যুগে যুগে এই চলে আস্‌ছে। এ যুগের ঋষি আমরা—সাংবাদিক; আমাদের দৃষ্টিতে সত্যের বাস্তবরূপের অতীত একটা তত্ত্ব উদ্ভাষিত হয়, সেই তত্ত্বের দিক থেকে আমরা স্বদেশহিতে উৎসর্গীকৃত প্রাণ ত্যাগী কর্ম্মী ও নেতা সৃষ্টি করি। এতবড় কর্ত্তব্য যারা পালন করে, তারা সিনিক্ নয়, তারা জাতীয়তাবাদী সাংবাদিক অর্থাৎ জাতীয় ভাবধারার ভাণ্ডারী। এই কর্ত্তব্যের দিক থেকেই আমি পাঁচ বৎসর পরিশ্রম করে, চোঙ্গদারের আত্মজীবনী লিখেছি জান!"

"চোঙ্গদারের আত্মজীবনী তোমার লেখা! ভারী মজার কথা তো? একথা জান্‌লে তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী 'স্বরাজ' সম্পাদক কিছুতেই লিখতো না,—"এত বড় একটা সাহিত্য-প্রতিভা মাত্র আত্মজীবনীতেই সীমাবদ্ধ রহিল, ইহা বঙ্গবাণীর এক অপূরনীয় ক্ষতি। ব্যবসায় ও জনকল্যাণকর

কাজের ব্যস্ততায় তিনি দরিদ্র বাঙ্গলা সাহিত্যের ভাণ্ডারে অধিক কিছু দিতে পারিলেন না, ইহা ভাবিয়া আমরা বিমনায়মান হইতেছি। কিন্তু পরক্ষণেই কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করিতেছি, যাহা দিয়াছেন, তাহাও অতুলনীয়।"**

অধিকারীর অধরোষ্ঠ ব্যঙ্গহাস্যে বিকৃত হইল—"তা চোঙ্গদার দিয়েছেন। তিন হাজার টাকা নগদ, আর প্রথম সংস্করণের মুনাফা। বাঙ্গলাদেশে পাঁচশ পৃষ্ঠার একখানা বই লিখে একবারে এত টাকা শরৎবাবু ছাড়া কেউ পায় নি। তা ছাড়াও অনেক কিছু পেয়েছি, টাকায় যার দাম ঠিক করা যায় না।

"কি রকম ?"—উৎসুক দৃষ্টিতে চাহিলাম।

"তবে বলি শোন। আত্মজীবনীর উপাদান সংগ্রহ করবার জন্য প্রায়ই ছুটির দিনে তাঁর দমদমের বাগান বাড়ীতে যেতাম। অন্য দিন তো সময় হয় না। অনেক শনিবারের রাত আর রবিবারের দুপুর ঐ বাগানবাড়ীতে কেটেছে। তুমি তো এইমাত্র পড়লে, "সতীলক্ষ্মী সহধর্ম্মিনী চার বছরের মধ্যে দুই পুত্র ও এক কন্যা রাখিয়া স্বামীর পাদোদক পানান্তে যখন সজ্ঞানে গঙ্গালাভ করেন—তখন চোঙ্গদারের বয়স মাত্র আটাশ বৎসর। কিন্তু পত্নী প্রেমিক ও সন্তান বৎসল চোঙ্গদার আর বিবাহ করেন নাই। কঠোর ধর্ম্মজীবন ও সংযমই ছিল তাঁর আদর্শ।" থাক্ সে কথা, আটত্রিশ বৎসরের চোঙ্গদারের সঙ্গে যখন আমার পরিচয় তখন তাঁর আদর্শ ধর্ম্মজীবনের সাধন সঙ্গিনী···মিসেস মল্লিকা সেন। আলাপে বুঝলাম, পরিচয় অনেকদিনের। 'ম্যাট্রিক কি আই এ পাশ করেছিল, বাঙ্গলা বই ও আধুনিক সাহিত্যের খবর রাখে, কথাবার্ত্তায় মাঝে মাঝে মার্জ্জিত রুচির পরিচয় পাওয়া যায়। সুন্দরী, বয়স বাইশও হতে পারে, পাকামী দেখে ত্রিশও অনুমান করিতে ইচ্ছে হয়, প্রসাধন পারিপাট্যে ধরবার উপায়

নেই। চোঙ্গদারই আলাপ করিয়ে দিলেন, আবিষ্কার করলুম আমার লেখার একজন ভক্ত। এক গাছের লতা বাতাসে দোল খেয়ে আনমনে যেমন আর এক গাছের পাতাকে জড়িয়ে ধরে, লেখককে পেয়ে মল্লিকার হোল সেই দশা। লক্ষ্য করলাম আমার সঙ্গে কথা বলার সময় ওর ভাষা ও ভঙ্গী স্বতন্ত্র; আমি যে দেহ সর্ব্বস্ব চোঙ্গদার নই ও বুঝলো। সাংবাদিক জীবনে তরুণদের বন্দনা ও ফুলের মালা অনেক পেয়েছি, কিন্তু সমঝদার নারীর, সুন্দরী যুবতীর অর্ঘ্য এই প্রথম পেলাম। আমার চিত্তলোক এক নবীন জ্যোতিষ্কের আলোকে উদ্ভাসিত হল। আমার সম্পাদকীয় প্রবন্ধে এক নূতন ভাবের জোয়ার এলো। তীব্র অনুভূতিতে ভরা স্বদেশপ্রেমের গভীর আবেগময় প্রবন্ধ পড়ে, কংগ্রেস কর্ম্মীরা ধন্য ধন্য করতে লাগলো। মালিক একদিন ডেকে বললেন, "অধিকারী, তোমার কলমে নূতন সুরের রেশ পাচ্ছি।" কৃতার্থ হয়ে বল্‌লাম, "অনাগত জাতীয় সংঘর্ষের সংবাদ পেয়েছি আমার অবচেতন মনের তলায়, দেশকে প্রস্তুত করা আমার ব্রত।" তিনি বললেন,—"তা কর। তবে ঐ চোঙ্গদারের সঙ্গে বেশী মেলামেশা করো না, লোকটি"—"আপনার বন্ধু, আমাদের বিজ্ঞাপনদাতা" বলতেই তিনি বাধা দিয়ে বললেন, যাও নিজের কাজ করগে"—

"মিষ্টার চোঙ্গদার, আপনি যেন একটা কি!"—নলেনগুড়ের মত কথাগুলো যখন মল্লিকার মুখ থেকে গদগদ ভাবে গড়িয়ে পড়ে, আর চোঙ্গদার বোকার মত হাসতে হাসতে হাত কাড়াকাড়ি করেন, তখন আমার চিত্ত ঘৃণা ও করুণায় ভরে ওঠে। সাদা চোখে এ দৃশ্য রুচিবান লোক সহ্য করতে পারে না। মদের গেলাস হাতে ঘুগরী পোকার মত ঘুরপাক খেয়ে মিঃ চোঙ্গদার মল্লিকার সর্ব্বাঙ্গ জরীপ করেন। আবার হঠাৎ খেয়ালে শূয়োরের মত ঘোঁৎ ঘোঁৎ করতে করতে মল্লিকার কোলে মাথা এলিয়ে দেন। মল্লিকা কুণ্ঠিত দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে ওর টাকে

হাত বুলায়, মাঝে মাঝে বলে ওঠে, আঃ কর কি, লাগে মাইরি···আমি শূন্য পাত্র পূর্ণ করতে করতে ভাবি, একটা ভদ্র মেয়ে কেমন করে এই বর্ব্বরটার সঙ্গে এমন ইতর আনন্দে গলে পড়ে।

"একদিন বিকেলে দু'জনে মুখোমুখী বসেছি। সাহিত্য রাজনীতির ফাঁকে ফাঁকে ওকে ব্যঙ্গ করছি, এমন সময় মল্লিকার কণ্ঠস্বরে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার সরল অন্তরঙ্গতা ফুটে উঠলো। "জানেন মিষ্টার অধিকারী, ভাল লাগে না তবুও এই অভিনয় করতে হয়। আমার পারিবারিক সম্মান, আমায় স্বামীর ভাগ্য ওর হাতে।" দীর্ঘশ্বাস ফেলে ও উন্মনা হল। হয়তো ওর মন অতীতে ফিরে গিয়েছে। নইলে আমি শুনতে না চাইলেও ওর ঘরের কথা বলবে কেন? ও কি চায়, সমর্থন না সহানুভূতি! যার আপাদ মস্তকে চোঙ্গদারের সোনা ঝলমল করছে, এতদিন পরে তার মন বিষিয়ে উঠলো কেন? "জানেন মিষ্টার অধিকারী (ওর মুখে "মিষ্টার" শুন্‌তে এত ভাল লাগে) আপনি আমার জীবনে না এলে—"

"তুমি আত্মহত্যা করতে"—হেসে উঠলাম।

"ঠিক তা নয়, একজন দরদী পাওয়া কত দুর্ল্লভ। মনের কথা আপনাকেই বলা যায়,—ঐ মুর্খ টার দেহের অতিরিক্ত আর কিছু বোঝবার শক্তি নেই। বিধাতা ওকে ঐশ্বর্য্য দিয়েছেন কিন্তু মনটি দিয়েছেন পক্ষাঘাতে অসাড় করে, স্বাস্থ্য দিয়েছেন পশুর মত, প্রবৃত্তিও ওর পশুর মত নগ্ন নির্ল্লজ্জ; সসর্প গৃহে বাস করার যন্ত্রণা আপনি বুঝবেন।

"মল্লিকা মুখর হয়ে উঠলো। স্বৈরিণী হলেও গণিকা হতে পারেনি, ভদ্রতা ও শালীনতার পালিস, চোঙ্গদারের স্থূলরুচির ঘষায় এখনও উঠে যায়নি। ওর জীবনের সত্যরূপ প্রকাশ করতে গিয়ে ও যদি উপন্যাস থেকে বেছে নেয়া কিছু কল্পনার ভেজাল দিয়ে থাকে, তা হলেও

মিথ্যাকে মনোহর করে বলবার দক্ষতা ওর আছে। চমৎকৃত হলুম, আকৃষ্টও হলুম। দূর থেকে চোঙ্গদারকে আসতে দেখে মল্লিকা ত্রস্তে উঠে দাঁড়ালো—আশ্রয়লিপ্সু কাতর মুখে বল্‌লো—ভালবাসতে না পারুন, দয়া থেকে বঞ্চিত করবেন না। অভিভূতের মত বললাম, মল্লিকা আমায় বিশ্বাস করে কেউ ঠকেনি।

"আবার সুরু হ'ল অসহ্য একঘেয়ে ন্যাকামী—মদের বোতল গ্লাস। তারি মাঝে মাঝে চোঙ্গদার যোগাতে লাগলেন আত্ম-জীবনীর উপাদান, লোকটার ঘটনাস্মৃতি দুর্ব্বল, সাল তারিখ সম্বন্ধে একেবারে অর্ব্বাচীন। প্রশ্ন করলে হেসে বলেন, ও ফাঁক তুমিই পূরণ করে নিয়ো।"

আমি বলিলাম, "হাউ ইন্‌টারেস্‌টিং ;—চোঙ্গদারের আত্মজীবনী চুলোয় যাক, অধিকারী তোমার প্রেমের গল্পটা বল ; তুমি কমলাকান্ত, সংসার অরণ্যে নিস্ফলা বৃক্ষ—তোমাতেও প্রেমের মুকুল দেখা দিল ?"

অধিকারী সিগারেট ধরাইয়া নির্ব্বিকারভাবে বলিতে লাগিল,—"পরস্ত্রী আর পণ্যাস্ত্রীর মধ্যে আকশ পাতাল তফাৎ। মদের আসরে যারা খেম্‌টা নাচে, যারা দাঁত দিয়ে দেখে আর চোখ দিয়ে দংশন করে সেই সব যৌবনধন্যা কুক্কুরীকে তুমি ঘৃণা করতে পার—কেননা ওরা বৈচিত্র্যহীন জড় পদার্থ। লম্পটের চাহিদার ছাঁচে ঢালা পুতুল। কিন্তু পরস্ত্রী ষ্ট্যাটিক নয়, ডিনামিক। ওদের জীবনস্রোতে বহু ভঙ্গীময় তরঙ্গ ওঠে। ওরা কূল ত্যাগ করে অকূলে ভাসে না। ওরা দুই কূল বজায় রেখেই এক কূল ভাঙ্গে। অসতী অথচ পতিব্রতা—মল্লিকাকে না দেখলে বিশ্বাসই করতুম না। তবু তুমি বিশ্বাস কর, "তোমার পরশ অমৃত সরস" বলে ঝাপিয়ে পড়তে গিয়েও ফিরে এসেছি।"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "হয়তো মল্লিকার অনুরাগের চেয়ে তোমার কাছে চোঙ্গদারের বন্ধুত্বের দাম বেশী ছিল।"

"বন্ধুত্ব! চোঙ্গদার বলতেন, স্বার্থ ছাড়া বন্ধুত্ব বলে কোন কথা নেই। বিনা প্রয়োজনে আমি কখনও ভালবাসার ভানও করিনে। স্নেহ মমতা দয়া দাক্ষিণ্য ও সব কেতাবে পড়তে ভাল লাগে, হয়তো গরীবদের মধ্যে কিছু আছে! কিন্তু দশজনকে দাবিয়ে বড় হ'বার ওগুলো বাধা। এই ধর না, মিঃ রায়। দশ বৎসর আমার কয়লার খনিতে কাজ করেছেন। আপিসের কর্ম্মচারীরা এমন কি মিঃ রায়ও জান্‌তেন আমি তাকে সহোদর ভাইয়ের মত স্নেহ করি। ডুবে যাওয়া কোম্পানী তিনি বাঁচিয়ে দিলেন। কিন্তু ব্যবসায়ী মহলে আমার নামে ধন্য ধন্য পড়ে গেল। তোমার "স্বাধীনতাই" লিখলে, "চোঙ্গদারের সুদক্ষ পরিচালনায় বাঙ্গলার একটা জাতীয় প্রতিষ্ঠান, অবাঙ্গালীর হাত হইতে রক্ষা পাইল।" আঁট ঘাট বেঁধে মিঃ রায়কে সরিয়ে দিলুম। বেচারা চোখের জল ফেলে চলে গেল। গলে গেলে—নিজের ক্ষতি করতাম। বন্ধুত্ব ও স্নেহের অভিনয়টা ভাল—তার বেশী এগুলে মানুষ পেয়ে বসে।"

"এসব শুনেও তুমি লোকটার সঙ্গে থাকৃতে!"

"এই সব শোনবার জন্যই থাকৃতুম। চোঙ্গদার বল্‌তেন, আপিসের বাইরে একান্ত প্রয়োজন না হলে তিনি মিথ্যাকথা বলেন না।"

"যাক, তোমার মিসেস মল্লিকা সেনের কথা বল।"

"মাঝখানে কয়েক মাসের ছেদ পড়লো। মল্লিকা দারজিলিংএ চলে গেল। মল্লিকা ছুটি পেল, কেননা, চোঙ্গদার একটা নতুন কোম্পানীর ফিকিরে বোম্বাইবাসী হ'ল। প্রথম দিকে মল্লিকা কয়েকখানি পত্র লিখছিল, দস্তুরমত প্রেম পত্রই বল্‌তে পার—আমার উত্তরগুলো হ'ত একান্ত মামুলী। হয়তো সেই কারণেই তার পত্র লেখার উৎসাহ নিভে গেল। এদিকে রাজনীতিক গগনে ঘনঘটা ঘনিয়ে এলো।

কয়েকমাস প্রতীক্ষার পর গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে মিটমাট হ'ল না। এক বৎসরের মেয়াদ ফুরিয়ে গেল। লাহোর কংগ্রেস ঘোষণা করলো পূর্ণ স্বাধীনতা। আমার ভিতরকার বিরহী যক্ষ হিমগিরি শৃঙ্গে অলকায় অধিষ্টিতা মল্লিকাকে লক্ষ্য ক'রে রাজনৈতিক মেঘদূত রচনা ক'রে চললো,—গৈরিক নিস্রাবের মত আমার অগ্নিঢালা প্রবন্ধগুলি দেশে আন্‌লো নূতন চেতনা, 'স্বাধীনতার' প্রচার বৃদ্ধিতে মালিক হলেন আনন্দিত। কিন্তু বেরসিক গভর্ণমেণ্ট হলেন রুষ্ট। রাজদ্রোহের অভিযোগে পুলিশ আদালতে ধরে নিয়ে গেল। আমি নাটকীয় ভঙ্গীতে আদালতে এক জোরালো বিবৃতি দিলাম,—রাষ্ট্রপতি ছাড়া আর কারও হুকুম মানিনে। অবশ্য বিবৃতিটা খবরের কাগজে বের হবে না, মল্লিকা পড়তে পারবে না ব'লে দুঃখও হ'ল। কিন্তু মল্লিকার প্রেমের চেয়েও স্বদেশ প্রেম তখন উগ্র—হাস্যমুখে এক বৎসরের জন্য কারাবরণ ক'রে আলীপুর সেণ্ট্রাল জেলে অহিংস বন্ধুদের সঙ্গে মিলিত হ'লাম।

"জেল থেকে বেরিয়ে এক শনিবার দমদমের বাগান বাড়ীতে গিয়ে দেখি, মল্লিকা সোফায় বসে একখানা বাজে ইংরেজি নভেল পড়ছে। হঠাৎ আমায় দেখে ও উচ্ছ্বাসে ভেঙ্গে পড়লো—আপনি ধন্য, দেশের মুক্তির জন্য কি দুঃখই না বরণ করলেন। পায়ের ধুলো নেবার জন্য নত হতেই আমি থাক্ থাক্ ব'লে দু'হাত ধরে ওকে বসিয়ে দিলাম, ওর নরম হাত দুটো কিছুক্ষণ হাতের মধ্যে রাখতে ভারী লোভ হ'ল। আঙ্গুলের ভাষা ও বুঝলো। আমি এদিক ওদিক চেয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, চোঙ্গদার কই ?—"সে হয়তো আজ আসবার সময় পাবে না।"

"মানে !"

"—মানে কিছুই নয়। বনমালা দেবীর বাড়ী আরতি কীর্ত্তনের পর সময় পান না। কিছুই খবর রাখেন না বুঝি! মিঃ রায়ের কথা মনে

আছে? তিনি মরবার পর তাঁর স্ত্রী বনলতা ওকে পেয়ে বসেছে।” বলতে বলতে ক্ষোভে ও রোষে মল্লিকার চক্ষে জল এলো। ও বুঝতে পেরেছে, চোঙ্গদারের সঙ্গে ওর সম্পর্ক শেষ হয়েছে, অক্ষম ঈর্ষা আর বঞ্চনার ক্ষোভ—নারী কত অসহায়, কত দুর্ব্বল, কত মূল্যহীন! আমি জানি, চোঙ্গদারকে ও ঘৃণা করে, তবু আজ যে চোঙ্গদার বনমালার কথায় উঠছে বসছে এটা ও সইতে পারছে না, অর্থাৎ সইতে চাইছে না। আত্মাবমাননার গ্লানির ক্লেদ ওর কণ্ঠনালীতে ফেনিয়ে উঠছে। দংশনে অক্ষম বিষহীনা ভুজঙ্গিনীর ব্যর্থ ফণা আস্ফালন নিস্তেজ হ’য়ে এল; আমার হাত চেপে ধ’রে বল্‌লো, আপনি ওকে ফেরান।

“ভুল করোনা মল্লিকা, উনি ওঁর পথেই চলেছেন, এখন পালা তোমার। সেতারীর কাছে, সেতারটা উপলক্ষ্য, লক্ষ হ’ল স্বর। যে কোন সেতারে একই স্বরের ঝঙ্কার তোলার মত গুণী চোঙ্গদারকে আমি চিনি। পঞ্চম অঙ্কের যবনিক পড়বার পর, আবার পটপরিবর্ত্তনের আশায় বসে থাকবার মত নির্ব্বোধ তুমি নও মল্লিকা। নাও ওঠ, আমরাও জীবনকে এবং পরস্পরকে প্রতারণা করি;—বলতে বলতে উঠে সরঞ্জাম ঠিক ক’রে নিলাম। পূর্ণ পাত্র এগিয়ে দিয়ে বললাম, ‘এসো আমরা চোঙ্গদারের স্বাস্থ্যপান করি। এই স্বর্ণাভ জলের অতল গহিনে অতীত যাক্ ডুবে’—চমৎকার অভিনয় করতে লাগলাম, লঘু হাস্যে মল্লিকা বলে ওঠে, ‘এত কথাও আপনি বানিয়ে বলতে পারেন, আপনার কথায় যাদু আছে, দুঃখ ভোলাবার মন্ত্র আপনি জানেন।’ ওর দুই স্কন্ধ সবলে চেপে ধ’রে বললাম,—“শুধু জানিনে, আমি ঐ মন্ত্রের সাধনায় সিদ্ধ মহাপুরুষ। আমার চিদাকাশে নারী আসে শরতের লঘু মেঘখণ্ডের মত, কোন পদচিহ্ন রেখে যায় না। না পাওয়া বা

পেয়ে হারানোর উর্দ্ধে আমার আসন। আমি কাপালিক, অঘোরপন্থী, নর করোটির খর্পরে আমি উষ্ণ রুধির পান করি; শবদেহে প্রাণসঞ্চার করা আমার বিলাস। এসো মহাভৈরবী—তোমায় আজ পূর্ণাভিষেকের দীক্ষা দেবো।" নিজেকে একান্তভাবে আমার ওপর নিক্ষেপ ক'রে মল্লিকা বাষ্পরুদ্ধ স্বরে বল্‌লো, নাও, আমার সব নাও; নূতন মল্লিকাকে তুমি সৃষ্টি কর—মরে যাক, মুছে যাক অতীত।' এমন সময় কাঁকরের পথে পরিচিত মোটরের শব্দ—হাস্য মুখে চোঙ্গদারের প্রবেশ—এবং মুক্তির পরিনির্ব্বান!

আমি তন্ময় হইয়া অধিকারীর মুখের দিকে চাহিয়া আছি বুঝিতে পারিয়া সে আত্মসম্বরণ করিয়া সহজভাবে বলিতে লাগিল,—"দেখ ভাই, মানুষ তার অভ্যস্ত মূঢ়তাকে ধর্ম্মের অনুরাগ নিয়ে অনুসরণ করে। ভুলের জের টেনে চলবে, তবে ভুলকে ভুল বলে স্বীকার করবে না, আত্মাভিমান এমনি জিনিষ। মানুষ অবিশ্বাসকে বিশ্বাস দিয়ে জয় করতে চায়, প্রতারককে কৃতজ্ঞ করতে চায় ক্ষমা দিয়ে। চল্লিশ বছরের তিক্ত অভিজ্ঞতার পরও গান্ধিজী হিংসাকে জয় করতে চান অহিংসা দিয়ে। আমরা রোমাঞ্চিত কলেবরে অসম্ভবের প্রত্যাশা করি। তিনি যখন বন্দীশালা থেকে লর্ড লিনলিথগোকে "প্রিয় বন্ধু" বলে সম্বোধন করে পত্র লেখেন, তখন মহত্ত্বের মহিমা আমরা বিস্ফারিত নেত্রে চেয়ে দেখি, লজ্জায় নতশির হইনে। তাই প্রতারিত, অপমানিত মিঃ রায়, চোঙ্গদারকেই তার বিধবা স্ত্রী ও নবালক পুত্রের অভিভাবক নিযুক্ত করে শান্তিতে মরেছেন, এ সংবাদে দুঃখিত হলেও আশ্চর্য হইনি। চোঙ্গদার বলেন, 'দেখলে তো অধিকারী, ধর্ম্মের কল বাতাসে নড়ে। এখন লোকে বুঝছে, আমি তার কত বড় হিতৈষী ছিলাম, তা না হলে এত কাজের মধ্যে এত বড় দায়িত্ব নিতাম না!' আমি বললাম,

'পরের বোঝা বইবার মত প্রশস্ত স্থান আপনার স্কন্ধে আছে।' চোঙ্গদার হেসে বলেন,—'ঐ আমার বিধিলিপি অধিকারী, মানুষের দুঃখ সইতে পারিনে বলেই ভূতের বেগার খাটি।'

"দেখলাম এবং জানলাম বনমালা দেবীকে। একহারা গড়ন, অজীর্ণ রোগীর মত বিবর্ণ মুখ, চোখে অস্বাভাবিক দীপ্তি। অপ্রত্যক্ষ ইষ্টদেব বঙ্কুবিহারী আর প্রত্যক্ষ দেবতা অবধূত রাধানন্দ স্বামীর হাতে পরকালের ভার দিয়ে, চোঙ্গদারকে ইহকালের কাণ্ডারী করে বৈধব্য যন্ত্রণা লাঘব করে ফেলেছেন। অবধূত বলে, দেবী সামান্যা নারী নয়, ওর হ্লাদিনী শক্তির স্ফুরণ হয়েছে, প্রচুর মালপো ভোগে তৃপ্ত চেলারা আরও বাড়িয়ে বলে। শুন্‌তে শুন্‌তে বনমালাও নিজেকে তাই মনে করে। দেখলে মনে হয় সর্ব্বদাই ভাবাবিষ্ট হয়ে আছে। আসলে হিষ্টিরিয়া, ফিটের ব্যামো, ভক্তরা বলে ভাব সমাধি। চোঙ্গদার উপস্থিত থাকলে সন্ধ্যারতির পর ভাব সমাধি হয়, তখন চেলারা দশা ভাঙ্গবার জন্য হায় হায় করে হরিনাম করতে থাকে। বারান্দায় কীর্ত্তনিয়াদের রেখে, চোঙ্গদার স্মেলিং সল্টের শিশি, গরমজলের বোতল আর এসপিরিন ট্যাবলেট নিয়ে ব্যস্ত হয়ে ঘরে ঢোকেন। সম্পর্ক পাতান হয়েছে ভাল। বনমালা ডাকে, দাদু,—দাদু আদর করেন পাগলী বলে। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস, আগে কোন সম্পর্ক ছিল না, জানাশুনা ছিল কিনা সন্দেহ। কিন্তু বনমালা সম্পর্কটাকে টেনে নিয়ে গেছে তার কুমারী-জীবনে পল্লীর নিভৃত নিরালায়।

"বনমালা বলেন, বুঝলেন অধিকারী মশাই। আমি ছেলেবেলায় ওদের গাঁয়েই মামা বাড়ীতে মানুষ হয়েছি। আমার কত আবদারই না উনি সহ্য করেছেন। বনমালা যখন কোন গ্রামে কিশোরী তখন চোঙ্গদার কলকাতায় হরিণমারী টি কোম্পানীর শেয়ার নিয়ে জুয়া

খেলায় মেতেছে কিন্তু বনমালা তখন তাকে ডিঙ্গী নৌকায় করে নিয়ে গেল গ্রামের বিলে পদ্ম তুলতে, এলো ঝড়—নৌকার সেই থর থর কম্পণের মধ্যে ইত্যাদি এবং প্রভৃতি! চোঙ্গদার মুচকি হেসে মিটমিট করে তাকান আর বলেন, তোর এতও মনে থাকে পাগ্‌লী আমি তো ভুলেই গিয়েছিলাম। আমার দিকে চেয়ে চোঙ্গদারের হাসি থেমে যায়, চোখ তার কেন যেন বুজে আসে। গা ঝাড়া দিয়ে অকারণেই বলে ওঠেন, হুঁ।

"দমদমের বাগান বাড়ী। বৈষ্ণব সম্মেলনের সভাপতির অভিভাষণ লিখবার জন্য আমার ডাক পড়েছে। আলোচনার মধ্যে চোঙ্গদার বলেন, তোমার দেবীর সব আবদার সহ্য হয়, কেবল গুরু বেটাকে আমি সহ্য করতে পারিনে। ও আমার কাঁধে ভর করতে চায়। ওর ধারণা আমাকে শিষ্য করতে পারলেই বৃন্দাবনের আশ্রম জাঁকিয়ে তুলতে পারবে। বেটা পয়লা নম্বরের ভণ্ড, কেবল বনমালার মুখ চেয়ে সহ্য করি।"

"তা ঠিক বলেছেন। আপনি, দেবী আর অবধূত ;—এ তিনের কে যে ভণ্ডামীতে কম, আজও তা ঠাহর করতে পারলাম না।"

"বেশ স্পষ্ট করে বলেছ কিন্তু অধিকারী। আমার ভণ্ডামীটা আধ্যাত্মিক নয়, নিছক লৌকিক কাজ হাসিল করার কৌশল। বনমালা ভাবছে সেই আমাকে নাকে দড়ি দিয়ে বৈষ্ণব সম্মেলনের ঘাটে জল খাওয়াছে। তবে শোন, অবধূতের চেলা বাঁড়ুয্যে, কালীগঞ্জ পটারী ওয়ার্কস চালাতে পারছে না। অনেক টাকা দাদন দিয়েছি এইবার পূর্ণগ্রাস। বাঁড়ুজ্যে ভাবে, সে যখন বনমালার গুরুভাই তখন আমার মাথায় হাত বুলোতে পারবে—ম্যানেজিং ডিরেক্টরীটা বদলে গেলে কি হয় দেখে নিয়ো অধিকারী"—চোঙ্গদারের চোখ দুটো অজগরের মত জ্বল্ জ্বল্ করে উঠল।

"এর মধ্যে আবার স্ত্রীলোক ঘটিত কিছু নেই তো ?"

চোঙ্গদার দু' হাতে সম্মুখের কোন বিদেহী প্রাণীকে ঠেলে দিয়ে বল্লেন, "না অধিকারী, এটা নিছক পুরুষালী ব্যাপার। তোমাদের সংবাদপত্রের ভাষায় বাঙ্গলার একটা জাতীয় প্রতিষ্ঠানকে পুনঃ প্রতিষ্ঠার নিঃস্বার্থ উদ্যম।"

চোঙ্গদার কি জানি কেন মনের দরজা খুলে দিলেন। আরও দু'তিনটা কোম্পানী হাত করার ইতিহাস শুনলাম, সহরের বড় বড় নামধারীদের কত কীর্ত্তিকলাপ জালিয়াতী মিথ্যাভাষণ ধাপ্পাবাজীর কত রকম কৌশলের নাম জীবনযুদ্ধ—পার্থের মত ভক্তিমান হয়ে সে গীতা শুনলাম, সত্য উপলব্ধি হ'ল। চোঙ্গদার বিশ্বরূপ দেখালেন,—টালা থেকে টালীগঞ্জ পর্য্যন্ত অসংখ্য চোঙ্গদার স্বদেশী শিল্প বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি করে বাঙ্গলার মুখ উজ্জ্বল করছেন। কত মল্লিকা বনমালার মুখ কলের চিমনীর ধোঁয়ায় কাল হয়ে গেল।

"কি ভাবছো অধিকারী !"

"ভাবছি সমসাময়িক বাঙ্গলার একটা ইতিহাস লিখবো।" শুনে চোঙ্গদার হেসে বল্লেন, "আগে আমার আত্মজীবনটা শেষ করো।"

"শেষ পর্য্যন্ত বনমালা দেবীর কি হ'ল ?" আমার প্রশ্ন যেন শুনতেই পেল না। আপন মনেই অধিকারী বলে চললো,—"আমার জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি এবং অকীর্ত্তি চোঙ্গদারের আত্মজীবনী শেষ হবার পর, আমাদের ঘনিষ্ঠতা শিথিল হ'য়ে গেল। একদিন বাজার থেকে ফিরছি চোঙ্গদারের সোফারের সঙ্গে দেখা। নমস্কার করে বললে, "আমাদের ওদিকে আপনাকে তো ইদানীং আর দেখিনে স্যার।" "এই সময় পাইনে, —মিঃ চোঙ্গদার ভাল আছেন তো ?" সোফার সমস্ত মুখ ভরা হাসি এনে বললে বনমালা দেবী রাধানন্দবাবাজীর সঙ্গে বৃন্দাবনে গেছেন

১০

আমাদের সাহেব এখন বৌবাজারে এক ইহুদি—'ভাল ভাল' বলতে বলতে পা বাড়ালাম।

"তা'হলেই বল, তুমি ঢালের একদিক, তাও অতি সামান্য দেখেছ। গোটা মানুষ সমগ্র ভাবে মানুষের বিস্ময়, অর্দ্ধ উদ্ঘাটিত বায়োলজীর প্রবাহমান প্রহেলিকা। তবু মানুষ মানুষকে বিচার বিশ্লেষণ করছে, কাউকে তুলছে আকাশে, কাউকে ফেলছে কাদায়। আমি বলি; বহু নর এবং নারীর অতৃপ্ত কামনার ও অনবরুদ্ধ ঘৃণার ঘনীভূত মূর্ত্তি চোঙ্গদার তোমাদের ভাষায় চিরস্মরণীয় মহামানব।"

অধিকারী হাত ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে বললো, "আজ আর নয় আমাকে শোকসভার আয়োজন করতে হবে।"

মার্চ্চ, ১৯৪৫

সংবাদ-সাহিত্য

শ্রদ্ধেয় প্রধান সভাপতি ও প্রতিনিধিবৃন্দ। বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের বৈঠকে সংবাদ-সাহিত্য বিভাগের উদ্বোধন ও আমন্ত্রণ এই প্রথম। বলা বাহুল্য এই সাদর আমন্ত্রণে আমি ও আমার সাংবাদিক সহকর্ম্মিগণ আনন্দিত ও গর্ব্বিত। বাঙ্গলা সংবাদপত্রের শৈশবকাল হইতে আজ পর্য্যন্ত বিশিষ্ট সাহিত্যিকগণই দৈনিক ও সাময়িক সংবাদপত্রের সম্পাদনা করিতেছেন। ফলে বাঙ্গলা সাহিত্যের সহিত বাঙ্গলা সংবাদপত্রের চিরদিনই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে। অতীতে সংবাদপত্রের সম্পাদকগণ, সাহিত্যিকরূপেই সম্মেলনে যোগ দিতেন। কিন্তু বর্ত্তমানযুগে সংবাদপত্রগুলি উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধির সহিত এক বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছে বলিয়াই আপনারা সম্ভবতঃ সংবাদ-সাহিত্যরূপ স্বতন্ত্র বিভাগ প্রতিষ্ঠা করিলেন। ইহার মর্য্যাদা ও গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া প্রথম সভাপতিরূপে আমি অত্যন্ত সঙ্কোচ বোধ করিতেছি। কেননা, আপনারা আমার নিকট যাহা শুনিতে চাহেন সে সম্বন্ধে আমার ধারণা স্পষ্ট নহে। আশঙ্কা হয়, আমি যাহা বলিব, তাহা সংবাদপত্র সম্পর্কে কতকগুলি মামুলী কথা মাত্র। সঙ্কোচ ও আশঙ্কা সত্ত্বেও এই সুযোগ আমি কৃতজ্ঞ চিত্তে গ্রহণ করিয়াছি। কেননা, যাহারা চিরদিন নিজেদের নেপথ্যে রাখিয়া অপরকে ঘোষণা করে; ধর্ম্মবীর, কর্ম্মবীর, রাষ্ট্রবীর হইতে অতি সাধারণ লোকেও যাহাদের সাহায্যে সমাজে খ্যাতি ও মর্য্যাদালাভ করে; যাহারা প্রবলের পীড়ন হইতে দুর্ব্বলকে রক্ষা করিবার জন্য, অন্যায় অবিচার কুব্যবস্থা দূর করিবার জন্য, সমাজ ও রাষ্ট্রের শুভবুদ্ধিকে সদজাগ্রত রাখিবার প্রয়াস পায়; অথচ নিজেদের অপমান পীড়ন হইতে

রক্ষা করিতে অক্ষম ও উদাসীন;—সেই সাংবাদিক মণ্ডলীর অবরুদ্ধ হৃদয়ের দু'চারিটা কথা যদি আজ প্রকাশ করিতে পারি, এবং যদি তাহা আপনাদের সহানুভূতি ও স্নেহ লাভ করে, তাহা হইলেই আমি ধন্য হইব।

মানবসভ্যতার প্রথম উন্মেষ কাল হইতেই মানুষের কৌতূহলী মন পরস্পরের ও রাজরাজড়া বড়লোকদের সংবাদ জানিতে চাহিয়াছে। এই স্বাভাবিক ইচ্ছা হইতেই পুরাণ ইতিহাস ইত্যাদির আবির্ভাব। ভাট, চারণ ও কবিগণ তাহাদের আলঙ্কারিক ও অতিরঞ্জিত ভাষায় ও ছন্দে দীর্ঘকাল মানুষের মনোরঞ্জন করিয়াছেন। মধ্যযুগে যাগযজ্ঞের বিশেষ ঘটা, যুদ্ধবিগ্রহ, রাজ্যাভিষেক প্রভৃতির সংবাদ হাতে লিখিয়া কিছু কিছু বিতরিত হইত। তারপর আসিয়াছে সংবাদপত্র।

বর্ত্তমান যুগে মানুষের অভ্যস্ত জীবন-যাত্রার মধ্যে সংবাদপত্র এক অপরিহার্য্য বস্তু। জড়বিজ্ঞান ও যন্ত্রযুগ এই বিপুল পৃথিবীর মানব সমাজকে নিকটতর করিয়াছে। বিভিন্ন দেশের মানবের বহুমুখী কর্ম্মপ্রচেষ্টার কত বিচিত্র ধারা, অথচ সংবাদপত্রের স্থান সীমাবদ্ধ। এই সীমাবদ্ধ স্থানে যতটুকু সংবাদ দেওয়া সম্ভবপর, বাছিয়া বাছিয়া তাহাই দেওয়া হইয়া থাকে। আবার এমন সংবাদপত্রও আছে যাহা কেবল একই বিষয়ের সংবাদ দেন ও আলোচনা করেন। কিন্তু সর্ব্বশ্রেণীর পাঠকের জন্য সাধারণ সংবাদপত্রের সম্মুখে প্রধান ও চিরন্তন প্রশ্ন, লোকে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী জানিতে চাহে কোন কোন বিষয়গুলি। বহুকালের অভিজ্ঞতা হইতে দেখা গিয়াছে, কতকগুলি বিশেষ বিষয়ে সংবাদ জানিতে লোকের আগ্রহের মাত্রা খুব বেশী। নারী ঘটিত ব্যাপার, ধন দৌলত, যুদ্ধ বিগ্রহ এবং অপরাধ সম্পর্কিত সংবাদের প্রতি সাধারণ পাঠক অধিকতর আগ্রহশীল। সাংবাদিকগণ, সেই সকল সংবাদ সংগ্রহ ও সরবরাহ করিবার চেষ্টাই করিয়া থাকেন। সংবাদ সংগ্রহ করার পর প্রশ্ন

উঠে, কি ভাষায় কি ভাবে সেই সংবাদ লিখিত হইবে। এই কথাটাই বোধ হয় এই সম্মেলনের আলোচ্য বিষয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সংবাদ-সাহিত্য বলিতে ঠিক কি বুঝায় তাহা আমি জানি না। সম্ভবতঃ যে লিপিকৌশল দ্বারা সংবাদ-রচনা অধিকতর হৃদয়গ্রাহী হয়, তাহাই সংবাদ-সাহিত্য। সংবাদ প্রচারের উপযোগী ভাষা ও বর্ণনা-রীতিকেও সংবাদ-সাহিত্য বলা যাইতে পারে।

সংবাদপত্রের আদিযুগে বিলাত ও আমাদের দেশে যে সংবাদলিপির প্রচলন ছিল,—তাহা ছিল চিঠির ভাষা। মুদ্রিত সংবাদপত্রের আমলে প্রচলিত মার্জ্জিত সাহিত্যের ভাষায় সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। কিন্তু সংবাদপত্রের প্রচার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল, উচ্চাঙ্গের আলঙ্কারিক ভাষায় সংবাদ লিখিলে অল্প লেখাপড়া জানা পাঠকবর্গের বুঝিবার অসুবিধা হয়, তখন সাধারণের সহজবোধ্য ভাষায় সংবাদ লেখা আরম্ভ হয়। কালবশে নিত্যনূতন বিষয় নূতনভাবে সন্নিবেশ করার ফলে সংবাদপত্রের ভাষারও বহু পরিবর্ত্তন হইয়াছে। সংবাদপত্রের সাজসজ্জা এবং শিরোনামার জন্য অনেক বড় বড় শব্দকে সংক্ষেপ করার প্রয়োজন হইয়াছে। প্রয়োজন মত সংবাদপত্রে নিত্য-নূতন শব্দ গড়িয়া উঠিতেছে ;—কিন্তু এখন পর্য্যন্ত সংবাদপত্রের ভাষা সম্বন্ধে বাঁধাধরা নির্দ্দিষ্ট কিছু স্থির হয় নাই। বাঙ্গলার গদ্য সাহিত্যে বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, রামেন্দ্রসুন্দর, হরপ্রসাদ, বিপিনচন্দ্র, শরৎচন্দ্র প্রভৃতির নিজস্ব রচনাভঙ্গীর মৌলিকতা সত্ত্বেও লিখিত বাঙ্গলা গদ্য যে কারণে কোন অতিনির্দ্দিষ্টতার মধ্যে আবদ্ধ হয় নাই,—সেই কারণেই সংবাদপত্রের সেবকগণও সর্ব্বক্ষেত্রে একই রচনাভঙ্গী অনুসরণ করিতে পারেন না। বিলাতেও টাইমস, ডেলী হেরাল্ড, ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ান প্রভৃতি কাগজগুলির 'সাহিত্য'—পৃথক পৃথক ধরণের। আমাদের দেশেও ষ্টেটসম্যান ও অমৃতবাজারের ইংরাজীর পার্থক্য আছে।

তবে সংবাদ-সাহিত্যের একটা মূলকথা আছে। যত কম কথায় বর্ণিত বিষয় প্রকাশ করা যায়, ততই ভাল। অত্যুক্তি ও অধিক অলঙ্কার বর্জ্জন করাই উচিত, এ সম্বন্ধে একজন বিশিষ্ট বিলাতী সাংবাদিক বলেন,—সংবাদপত্রের সাহিত্য হইবে নারীর আচ্ছাদনের মত। "It should be like a lady's garment, long enough to cover the subject, but at the same time short enough to be interesting." এ ক্ষেত্রে অবশ্য আধুনিক ইংরাজ তরুণীদের পরিচ্ছদই উপমাচ্ছলে ব্যবহার করা হইয়াছে। আমাদের দেশের আপাদমস্তক অবগুণ্ঠনবতীরা অথবা মার্কিনী হলিউডের কৌপীনবতী ভাগ্যবতীরা এই উপমার আওতায় আসেন না।

বাঙ্গলা সংবাদপত্রে যাঁহারা সংবাদ লিখিবার কাজ করেন তাঁহাদের দ্বারা যে 'অপূর্ব্ব সাহিত্যের' স্বষ্টি হইয়াছে, তাহা লইয়া কাব্য ও সাহিত্য জগতের মহারথী ও রথীবৃন্দ বহু বিদ্রূপ করিয়া থাকেন। সঙ্গত ও অসঙ্গত এই সকল সমালোচনা, ব্যঙ্গ বিদ্রূপ সম্পাদকদিগকে নিরুপায় হইয়া সহ্য করিতে হয়। তাঁহারা ভুলিয়া যান, বাঙ্গলা সংবাদপত্রের চৌদ্দ আনা সংবাদ প্রত্যহ ইংরাজী হইতে তর্জ্জমা করিতে হয় এবং তাহাও ভাবিয়া চিন্তিয়া করিবার উপায় নাই, রুদ্ধশ্বাসে দ্রুত করিয়া যাইতে হয়। ইংরাজী আমাদের রাষ্ট্রভাষা। সমস্ত রাজকার্য্য ইংরাজীতে হয়। বিশ্ব-বিত্যালয়ের সমস্ত কাজ ইংরাজীতে হয়। খেলাধূলা ইংরাজী ধরণের। বক্তা, নেতা, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, বিজ্ঞাপনদাতা সকলে ইংরাজীতে চিন্তা করেন, ইংরাজী বলেন, ইংরাজীতে লিখেন। বাঙ্গলা সংবাদপত্রের কর্ম্মীদিগকে তাহা বাঙ্গলায় অনুবাদ করিয়া দিতে হয়। এক এক জন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত যাহা বহুকাল ধরিয়া, প্রত্যেকটি শব্দ ওজন করিয়া অতি সতর্কতার সহিত নিবিষ্ট চিত্তে রচনা করেন, সাংবাদিকেরা তাহা দ্রুত

অনুবাদ করিয়া পাঠকদের সম্মুখে ধরেন। বহু ইংরাজী পারিভাষিক শব্দের নির্দ্দিষ্ট প্রতিশব্দের অভাব তাঁহাদিগকে পূরণ করিয়া লইতে হয়। কোন বিশেষ ঘটনা বা ঐতিহাসিক কারণ হইতে উদ্ভূত শব্দ এবং বৈজ্ঞানিক শব্দগুলির অনুবাদ কেবল দুঃসাধ্য নহে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে অসাধ্য। এই অসাধ্যসাধনের দাবী প্রতিদিন সাংবাদিককে পূরণ করিতে হয়,—পাঠকদের মধ্যে অনেক বিলাতী বিদ্যাবিশারদ বিশেষজ্ঞ এই অনুবাদের মর্ম্মগ্রহণ করিতে পারেন না। অনেক সময় অনুবাদ যথাযথ হইলেও, বাঙ্গলা ভাষা সম্পর্কে তাঁহাদের 'প্রশংসনীয় অজ্ঞতা'র দরুণ, নিজেদের বুঝিতে না পারার অক্ষমতার অপরাধ সংবাদপত্রের অনুবাদকের উপর নিক্ষেপ করিয়া কটূক্তি করেন। এই কটূবাক্য শ্রবণ ও সহ্য করিয়া প্রত্যেক দিনের কার্য্য আরম্ভ করার মত ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা একমাত্র সাংবাদিকেরই আছে,—কবি, ঔপন্যাসিক, সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিকের নাই।

অনেকেই ভাবিয়া দেখেন না যে, নব নব বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়ার সহিত প্রত্যহ কত নূতন শব্দ সৃষ্টি হইতেছে। নিত্য নূতন ভাবধারা বিদেশ হইতে আসিতেছে তাহার সহিত আসিতেছে নূতন নূতন শব্দ। নূতন শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তনের সময় যতগুলি নূতন শব্দ এদেশে আসিয়াছে, তাহার সংখ্যা দেখিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। এই সব শব্দ যাহারা বাঙ্গলায় অনুবাদ করিয়াছে অথবা বাঙ্গলায় বোধগম্য করিয়া গঠন করিয়াছে, তাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের অতিপারিশ্রমিকপুষ্ট এবং সুদীর্ঘ ছুটির আরামে তুষ্ট অধ্যাপকও নহে, বিশ্বসাহিত্যিক বা বিশ্বকবিও নহে। সংস্কৃত ভাষার সন্তান বাঙ্গলা ভাষা প্রধানতঃ কাব্য সাহিত্য ও দর্শনের ভাষা। ভাবাবেগ বা দিব্যানুভূতি প্রকাশে ভাষার ও শব্দের প্রাচুর্য্য আছে। বিজ্ঞান ও রাজনীতিক্ষেত্রে এখনও ভাষা তেমন স্বচ্ছন্দ ও বেগবান নহে। তাহার জন্য আমাদের কান ও মন তৈয়ারী হয় নাই বলিয়াই কাব্য ও উপন্যাসের

বাঙ্গলা শুনিতে ও পড়িতে অভ্যস্ত মন ও কান অনুরূপ লালিত্য না পাইয়া বিরক্ত হয়; অনভ্যস্ত শব্দ শ্রুতিকটু মনে হয়। তাঁহারা নালিশ করিয়া বলেন, বাঙ্গলাভাষা আড়ষ্ট। ভাষার দোষ নহে, দোষ আমাদের শিক্ষার। বাঙ্গলার সংবাদপত্র একদিকে যেমন নূতন নূতন শব্দ আনিয়া ভাষাকে সমৃদ্ধ করিতেছে, অন্যদিকে মাতৃভাষায় রাষ্ট্রনীতি বিজ্ঞান প্রভৃতি শিক্ষা দিবারও দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছে। আজ বাঙ্গলা সংবাদপত্র যে প্রচার-প্রতিষ্ঠায় ইংরাজী ভাষায় পরিচালিত সংবাদপত্রের আভিজাত্য ও গৌরব খর্ব্ব করিয়াছে, ইহা তাহার বহুবর্ষের সাধনার ফল এবং এ গৌরব তাহার একান্ত নিজস্ব। বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ্ডিতবর্গ অথবা সাহিত্যরথিদের নিকট সে কোন সাহায্য পায় নাই। বাহির হইতে সহানুভূতিহীন মন লইয়া সমালোচনা করা সহজ; হৃদ্যতার সহিত পথ প্রস্তুত করা কঠিন। অবশ্য ইংরাজী খেলার বাঙ্গলা বিবরণ; মার্কিন চিত্রজগতের হলিউডের ভাষা, বিলাতী ঔষধ, মোটরকার, যন্ত্রপাতির বিজ্ঞাপনের ভাষার হুবহু বাঙ্গলা তর্জ্জমা করা অসম্ভব। এই অসম্ভবকে সম্ভব করিবার চেষ্টা করিতে যাইয়া একটা জারজ ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

এমন ঘটনাও বাঙ্গলা সংবাদপত্রের আপিসে ঘটে যে, যথাযথ অনুবাদও গ্রাহ্য হয় না। একবার একটি সওদাগরী কারবার হইতে আনন্দবাজার পত্রিকায় একটি জিনিষের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় তাহাতে ইংরাজীতে বড় বড় অক্ষরে লেখা ছিল, 100 percent pure. বিজ্ঞাপনদাতার নির্দ্দেশ ছিল যেরূপ অক্ষরে ও আকারে এই কথা কয়টি আছে, বাঙ্গলাতেও সেইরূপ রাখিতে হইবে। অনুবাদক মহাফাঁপরে পড়িলেন। অনেক ভাবিয়া লিখিয়া দিলেন, ১৬ আনা খাঁটি। অক্ষরে গাঁথিয়া প্রুফ্ পাঠান হইল, অনুমোদনের জন্য। বড় সাহেবের বাঙ্গলা বর্ণজ্ঞান পর্য্যন্ত নাই। তিনি

দেখিলেন ১০০ লিখিলে তিনটি সংখ্যা, অথচ প্রুফে আছে দুইটি। এই মস্ত ভুল ধরিয়া তিনি বড়বাবুকে ডাকিলেন। সাহেবকে তুষ্ট করিবার জন্য বড়বাবু বলিলেন, ভুলই হইয়াছে। এত বড় একটা ভুল আবিষ্কারের আনন্দে গদ গদ হইয়া সাহেব আনন্দবাজারে ফোন করিলেন। অনুবাদক উত্তর দিলেন, ভুল হয় নাই, অনুবাদ ঠিকই হইয়াছে। সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, ঠিকই যদি হইবে তাহা হইলে ১০০ লিখিতে তিনটি সংখ্যা না দিয়া দুইটি দেওয়া হইল কেন? অনুবাদক বলিলেন, ফোনে এ বিষয় বুঝাইয়া দেওয়া সম্ভব নহে। সাহেব বলিলেন, বিজ্ঞাপনটি বিশেষ জরুরী, পরদিনই বাহির হওয়া চাই, সুতরাং তিনি নিজে আসিয়া বুঝাইয়া দিতেছেন। কিছুক্ষণ পরে বড়বাবুসহ সাহেব আসিয়া উপস্থিত। অনুবাদক বুঝাইয়া বলিলেন, বাঙ্গলায় এক টাকাকে পূর্ণ ধরিয়া আনা হিসাবে অংশ করা হয়; একশতকে পূর্ণ ধরার প্রথা নাই। সুতরাং নির্দ্দেশমত অক্ষর যথাসম্ভব ঠিক রাখিয়া এইরূপ করা হইয়াছে, ইহাতে পাঠকেরা বুঝিবে ভাল এবং বিজ্ঞাপনের ঠিক ফল হইবে। সাহেব কথাটা বুঝিলেন এবং বড়বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন একথা তিনি বুঝাইয়া বলেন নাই কেন? বড়বাবু অম্লানবদনে বলিলেন, তিনি ভাল বাঙ্গলা জানেন না। বাঙ্গালী বাঙ্গলা জানেন না একথা শুনিয়া সাহেব একটু বিস্মিত হইলেন। আমরা সাহেবকে বুঝাইয়া বলিলাম যে, সাহেব আমাদের দেশে মাতৃভাষায় অজ্ঞতা শিক্ষার বা কোনও কাজের ব্যাঘাত ঘটায় না। দোষ সওদাগরী আপিসের বড়বাবুর একার নহে; প্রত্যহ বহু শিক্ষিত ভদ্রলোক ইংরাজীতে সংবাদ বা বিবৃতি লিখিয়া আনিয়া অনুবাদ করিয়া লইবার অনুরোধ করেন এবং ত্রুটী স্বীকার করিয়া গর্ব্বিত বিনয়ের সঙ্গে বলেন, বাঙ্গলায় তিনি লিখিতে পারেন না। এই শ্রেণীর লোকের এক অন্ধ কুসংস্কার আছে যে, তাহারা মনে করে, তাহারা ইংরাজী বেশ ভাল জানে।

সংবাদপত্রের কর্ম্মীদের কেবল যে অনুবাদ করিতে হয় তাহা নহে, সংবাদ, অভিযোগ, বর্ণনা, বক্তৃতা কাটিয়া ছাটিয়া মাজিয়া ঘসিয়া সংবাদ-পত্রের উপযোগী করিতে হয়। ভাষার উপর ভাল দখল না থাকিলে এ কাজ সহজে করা যায় না। অতিশয়োক্তি ও বাহুল্য বিস্তার করিয়া বলা আমাদের জাতীয় অভ্যাস। এই জন্য মফঃস্বল হইতে প্রেরিত অনেক সংবাদ প্রকাশ্যযোগ্য বিবেচিত হয় না। কিন্তু আমার নিজের জীবনেই দেখিতেছি, অবস্থার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে, মফঃস্বল হইতে বহু উৎকৃষ্ট রচনা এখন পাওয়া যায়। সংবাদপত্রের অনেক নিয়মিত পাঠক ইদানীং এমনভাবে সংবাদ প্রেরণ করেন যাহা বেশী পরিবর্ত্তন করার প্রয়োজন হয় না। কৃষক বা ইংরাজী না জানা অনেক পাঠক ও সংবাদদাতা উত্তম বাঙ্গলা লিখিতে পারেন। সংবাদপত্রের বহুল প্রচলনের ফলে শতকরা ৯০ জন নিরক্ষরের দেশেও বাঙ্গলার কথ্য ভাষাও মার্জ্জিত ও উন্নত হইয়াছে এবং হইতেছে।

জাতীয় জীবনের উপর সংবাদপত্র যে প্রভাব বিস্তার করে, তাহা কেবল দ্রুত দেশ বিদেশের সংবাদ সরবরাহ করিয়া নহে—তাহার নিজস্ব মতবাদ দ্বারা জনমনকে জয় করিবার সদা সচেতন চেষ্টা দ্বারা। বাঙ্গলা দেশে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরাধীনতার ফলে, ছত্রভঙ্গ দুর্ব্বল সমাজব্যবস্থায় অধিকাংশ নরনারী পীড়িত অপমানিত ; এই কারণে যে সকল সংবাদপত্র জাতীয় স্বাধীনতার ভাবধারা প্রচার করিয়াছে, সামাজিক সমুন্নতির প্রেরণা দিয়াছে, তাহারাই জনপ্রিয় হইয়াছে। অন্যায় অবিচার অব্যবস্থার বিরুদ্ধে জনচিত্তকে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য, বিশেষ আদর্শবাদের দিকে জনমনকে আকৃষ্ট করিবার জন্য সম্পাদক ও সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লেখকগণ যাহা লেখেন, তাহা সাময়িক ও ক্ষণভঙ্গুর হইলেও সাহিত্যের দরবারে তাহার স্থান আছে। সম্পাদকগণের

রচনাভঙ্গী, শব্দবিন্যাসরীতি অনেক শক্তিমান স্থায়ী সাহিত্যরচয়িতা অনুকরণ ও অনুসরণ করিয়া থাকেন। জনসাধারণের হৃদয়ে প্রবেশ করিবার কৌশল, পাঠকবর্গের হৃদয়গ্রাহী করিয়া বর্ণনা করিবার কৌশল, সংক্ষেপে অথচ সরলভাবে বক্তব্য বিষয়কে পরিস্ফুট করিবার কৌশল অনন্যসাধারণ সাহিত্যিক প্রতিভা না হইলেও অনুপম ও তীক্ষ্ণ বোধ-শক্তির পরিচায়ক। যাহার ভাষায় ঝঙ্কার নাই, উদ্দীপনা নাই, প্রাণ শক্তির গতিবেগের প্রাচুর্য্য নাই সে কখনও সংবাদপত্রের মধ্য দিয়া জনচিত্ত অধিকার করিতে পারে না। সাধারণ প্রবন্ধরচয়িতার সহিত সংবাদপত্রের লেখকের সুস্পষ্ট পার্থক্য আছে। খুব বড় পণ্ডিত না হইলেও সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লেখা যায়। কিন্তু হৃদয়াবেগ, তীব্র অনুভূতি এবং জাতির সহিত, জাতির আশা আকাক্ষার সহিত প্রাণগত যোগ না থাকিলে সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লেখা যায় না। সম্পাদককে নিত্য নূতন শিক্ষা লাভ করিতে হয়, পুরাতন ভুলিতে হয়। অতীতের প্রতি সে মমত্বহীন, বর্ত্তমান তাহার নিকট বাস্তব-সত্য, ভবিষ্যৎ তাহার কল্পনায় রূপায়িত। সম্পাদকের চিন্তা ও সৃষ্টি উদ্দেশ্যমূলক। উদ্দেশ্যের দৃঢ়তা ও আদর্শ নিষ্ঠাই সম্পাদকের প্রতি দিনের রচনায় প্রাণ সঞ্চার করে। সম্পাদককে খুঁটিনাটি অনেক কিছু দেখিতে হয়; বহু লোকের সমবেত চেষ্টায় যে সংবাদপত্র প্রতিদিন প্রভাতে নিয়মিত সময়ে প্রকাশিত হয়, তাহার কর্ম্মকোলাহলের মধ্যে ভাবিয়া চিন্তিয়া ধীরে সুস্থে লিখিবার অবসর অল্পই মেলে। অনেক আকস্মিক গুরুতর ঘটনায় তৎক্ষণাৎ সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখিতে হয়। অসুবিধা, অনবসর, দ্রুত সিদ্ধান্ত ও দৈনন্দিন কর্ম্মক্লান্তির মধ্যেও সংবাদ পত্রের অপূর্ব্ব মাদকতা ও উত্তেজনা আছে; তাহাই সাংবাদিকদের চিত্তকে সরস ও মনকে সজীব করিয়া রাখে। প্রতিদিনের ব্যক্তিগত

সমষ্টিগত অভাব অভিযোগ বেদনা ও পীড়া লইয়া যে সাহিত্য রচিত হয় এবং জাতির বৃহত্তর আশা আকাঙ্ক্ষা লইয়া যে সাহিত্য রচিত হয় আমাদের দেশে তাহা কেবল সংবাদসাহিত্য নহে, তাহা একাধারে রাজনীতি ও অর্থশাস্ত্র। বাঙ্গলা ভাষায় উচ্চাঙ্গের মৌলিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক গ্রন্থ একরূপ নাই বলিলেই চলে। বাঙ্গলা সংবাদ-পত্র এই গুরুতর অভাব পূরণ করিয়াছে। চিন্তাশীল ও দেশপ্রেমিক ব্যক্তিদের রাজনীতি আলোচনার একমাত্র ক্ষেত্র সংবাদপত্র বা সাময়িক পত্র। বাঙ্গলার কবি ও সাহিত্যিকগণও সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রের সহায়তাতেই প্রচার ও খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। এককথায় বাঙ্গলা সাহিত্য ও সংবাদপত্র অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধে আবদ্ধ। এই দরিদ্র দেশে সুলভ সংবাদপত্রই বহুজনলভ্য। সংবাদপত্র যখন সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে, তখন তাঁহারাই সুলভে সাহিত্য প্রচার করিয়াছেন। 'বঙ্গবাসীর' পুরাণসমূহ প্রকাশ, 'হিতবাদীর' মহাভারত, রবীন্দ্র গ্রন্থাবলী প্রভৃতি উপহার, সর্ব্বশেষে বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের, বিপুল প্রচেষ্টা ও বঙ্কিম, গিরিশ, শরৎচন্দ্র প্রভৃতি ছোট বড় বহু সাহিত্যেকের গ্রন্থাবলীর 'সুলভ' সংস্করণ প্রকাশ বিশেষভাবে স্মরণীয়। সংবাদপত্রের পক্ষ হইতে এই চেষ্টা না হইলে বাঙ্গলার শ্রেষ্ঠ প্রতিভার সৃষ্টি লোকসমাজে এভাবে ছড়াইয়া পড়িত না। আমাদের দেশে মূল্য দিয়া বই কিনিয়া পড়িবার প্রবৃত্তি একেই কম, তাহার উপর দামী বই হইলে তো কথাই নাই। কোন সাহিত্যিকের নামের গুণে যতটা না হউক, সুলভের লোভেই পাঠক প্রথমে আকৃষ্ট হইয়াছে, ইহা অস্বীকার করা যায় না।

সংবাদপত্র ব্যক্তিগত সম্পত্তিই হউক আর যৌথ কারবারই হউক, সংবাদপত্রের আসল প্রভু জননায়ক, জনতা মহারাজ, গভর্ণমেণ্ট ও

বিজ্ঞাপনদাতা। ইঁহাদের পরস্পরের বিপরীত স্বার্থ ও অভিপ্রায়ের ঘাত-সংঘাত সংবদপত্রের উপর সর্ব্বদাই প্রভাব বিস্তার করিতে চেষ্টা করে। ইহাকে কখনও স্বীকার, অঙ্গীকার, উপেক্ষা, ক্ষমা করিয়াই দৈনন্দিন কাজ করিতে হয়। পূর্ব্বে সংবাদপত্রে সম্পাদকের নাম প্রকাশ করার রীতি ছিল না; সংবাদপত্র দমন আইন কঠোর হইতে কঠোরতর হইয়া সম্পাদকের নাম প্রকাশ করিতে বাধ্য করিয়াছে। সম্পাদকের ব্যক্তিগত খেয়াল খুসীতে সংবাদপত্র পরিচালিত হয় না; অথচ প্রশংসা অপেক্ষা নিন্দা ও অপবাদের ভাগ সম্পাদকদিগকেই গ্রহণ করিতে হয়। সম্পাদক অতি-মানব নহেন। দোষ ত্রুটি অপূর্ণতা যেমন সাধারণ মানুষের আছে, তেমনি সম্পাদকেরও আছে। কিন্তু তাহা স্মরণে রাখিয়া কেহ তাহাকে রেহাই দেন না। সম্পাদককে সমস্ত জিজ্ঞাসার উত্তর দিতে হইবে, সকলের মনোরঞ্জন করিতে হইবে; সামান্য অসাবধান হইলেই আইন তাহাকে দংশন করিবে। ধনী ও বড়লোকেরা তাঁহাদের ঢাক পিটাইতে অস্বীকার করিলে ক্রুদ্ধ হন, নেতারা তাঁহাদের বিবৃতি বড় বড় হরপের শিরোনামা দিয়া প্রকাশ না করিলে বিষন্ন হন, মন্ত্রীদের দোষ-ত্রুটী উদ্ঘাটন করিলে তাঁহারা ক্ষিপ্ত হইয়া বড় বড় ডাণ্ডা বাহির করেন, পুলিশ ও সিভিলিয়ানতন্ত্র তাঁহাদের নিরুদ্বিগ্ন ক্ষমতা ও প্রভুত্বের উপর প্রাত্যহিক কটাক্ষ ও সমালোচনা দেখিয়া দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করেন।

এই সকল বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও সাংবাদিক আমরা জনসেবার গৌরবে সমস্ত ঈর্ষা অসূয়া ক্ষোভ ক্রোধের আঘাত ভুলিয়া যাই। দরিদ্র দুর্ব্বল বঞ্চিত ও ব্যথিত অসংখ্য নরনারীর হৃদয়ে আমাদের জন্য যে স্নেহ ও সমবেদনা সঞ্চিত হইয়া আছে, আমাদের সম্বল ও সান্ত্বনা তাহাই। তাহাদের ভাষায় আমরা তাহাদের কথাই বলি। শ্রমিক, কৃষক, বৃত্তিজীবী, ছাত্র, যুবক, রাজরোষে লাঞ্ছিত নির্য্যাতনে ম্রিয়মান নর-

নারীর পক্ষ সমর্থন করিতে হয় বলিয়া আমাদের ভাষা রূঢ় কর্কশ অমার্জ্জিত; ইহাকে যদি আপনারা সাহিত্য বলেন, আমরা ধন্য হইব, যদি না বলেন, তথাপি ক্ষুব্ধ হইব না। আমরা স্থায়ী সাহিত্য সৃষ্টি করিবার গৌরবের দাবী করি না। লোকলোচনের অন্তরালে বসিয়া আমরা বিনিদ্র রজনীতে 'বহুজন সুখায় বহুজন হিতায়' নানা পুষ্প চয়ণ করিয়া বরমাল্য গাঁথি। প্রভাতে আমাদের উপাস্য গণশক্তির কণ্ঠে সে মালা ঝুলাইয়া দেই, সন্ধ্যায় তাহা ম্লান হইয়া ঝরিয়া পড়ে; আবার উদয়াস্ত চেষ্টায় পরদিনের নূতন মালা গাঁথি। কোন দিন দেবতার ভাল লাগে, কোনদিন লাগে না। হে সাহিত্যিক, কবি, সুধীবৃন্দ, আপনারা কত মহার্ঘ্য উপচার, মণিমাণিক্য খচিত আভরণের অর্ঘ্য নিত্য নিবেদন করিতেছেন, যাহা অনাদ্যান্ত কাল ধরিয়া আপনাদের গৌরব ও কীর্ত্তি ঘোষণা করিবে; তাহার সহিত তুলনায় সুলভ স্বল্পস্থায়ী ও ক্ষীণপ্রভ হইলেও আমাদের অর্ঘ্য-নিবেদনের আকুতি আগ্রহ চেষ্টা যত্ন কম নহে। অতএব আমরাও আপনাদের সতীর্থ সহকর্ম্মী এবং সমান উত্তরাধিকার সূত্রে বঙ্গ সাহিত্যের উত্তর সাধক।*

* একবিংশ বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলনের কৃষ্ণনগর অধিবেশনে সংবাদ-সাহিত্য শাখা—সভাপতিরূপে প্রদত্ত অভিভাষণ ১৩ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৮

কবি রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথের পরিণত পরিপূর্ণ জীবন আজ একাশী বৎসরে পদার্পণ করিল। অনন্যসাধারণ প্রতিভার এক পরমাশ্চর্য্য আত্মপ্রকাশ, আজিও আমাদের চক্ষুর সম্মুখে অম্লান মহিমায় বিরাজিত। বয়োজীর্ণ দেহ অপটু হইলেও, তাঁহার চিত্ত ও মন এখনও উজ্জ্বল প্রভাময় খড়্গের মত তীক্ষ্ণ ও মালিন্যমুক্ত। বহু শতাব্দীর ইতিহাস যে মুষ্টিমেয় মানবের স্মৃতি বক্ষে ধারণ করিয়া কৃতার্থ, রবীন্দ্রনাথ সেই শ্রেণীর মানুষ। আজ যে মহীরূহ শাখা-পল্লবে ফলে-ফুলে সমগ্র বিশ্বের শ্রদ্ধ-বিমুগ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে, আশী বৎসর পূর্ব্বে এই বাঙ্গলা দেশে তাহা অঙ্কুরিত হইয়াছিল—বাঙ্গালী আমরা এই গর্ব্ব ও গৌরবের অধিকার ঘোষণা করি, ইহা আমাদের দুর্লভ সৌভাগ্য।

রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও সাহিত্য লইয়া আমরা বহু আলোচনা করি, ভাবানন্দে বিহ্বল হই। কিন্তু কবি রবীন্দ্রনাথের পশ্চাতে একজন মানুষ রবীন্দ্রনাথ আছেন, তাঁহার কথা আমরা সব সময় ভাবি না। হিমালয়ের উত্তুঙ্গ উচ্চতার দিকে দৃষ্টিপাত করিলে যেমন শিরোঘূর্ণন হয়, সমুদ্রের অগাধ অতলস্পর্শী বিস্তারে মন যেমন সহজেই উত্তাল তরঙ্গমালার নৃত্যলীলায় বিহ্বল হইয়া পড়ে, তেমনি রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী জীবন-ধারার সমগ্র রূপ আমরা সহসা ধারণ করিতে পারি না। ঐশ্বর্য্য, খ্যাতি, যশঃ, বহু মানবের বন্দনায় যাঁহার চিত্ত ভরে নাই—সেই মানুষ রবীন্দ্রনাথের ক্ষুধিত চিত্তের ক্ষুব্ধ বেদনার পরিচয়লাভের আগ্রহ কয়-জনের হয়! সাংসারিক মানুষের সুদীর্ঘ জীবন অনেক সময় সুখের হয় না, দুঃখে দুঃখময় হইয়া উঠে। যে মানুষটি সমগ্র মানব

পরিবারের সহিত একাত্ম হইয়া বাস করিতেছেন—তাঁহার দুঃখ কত দুরাবগাহ!

এই দুঃখের অনির্ব্বাণ অনলশিখায় রবীন্দ্রনাথকে দেখিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল, সে স্মৃতি ভুলিবার নহে। কৈশোর ও যৌবনে রবীন্দ্রনাথকে দূর হইতে দেখিয়াছিলাম—উজ্জ্বল গৌরকায় রবীন্দ্রনাথ, মর্ম্মভেদী দৃষ্টিপূর্ণ চক্ষু, উন্নত নাসিকা, সঙ্গীতের মত মনোহর কণ্ঠস্বর, পরিপাটি বেশ-ভূষা। ভাবিয়াছি, অভিজাতবংশে সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে লালিত রবীন্দ্রনাথ হাসি কুড়াইয়া, হাসি ছড়াইয়া পুষ্প চয়ন করিতে করিতে সুদীর্ঘ জীবন পথ অতিক্রম করিয়াছেন। একটি কণ্টকও তাঁহার চরণে বিদ্ধ হয় নাই। প্রতিটি দিন গন্ধে ও গানে রূপে ও সুরে ঝলমল, প্রতিটি রাত্রি উৎসব নিশার মত মোহময়। বিজ্ঞদের মুখে শুনিয়াছি, দলিত দরিদ্র মানবের যে নিরুপায় বেদনা তিনি অনুপম ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন তাহা হৃদয়ের সহিত যোগহীন কবি কল্পনা মাত্র। কতক বিশ্বাস করিয়াছি, কতক করি নাই। এককালে অনেক যুবকের মতই আমি ক্ষুব্ধ হইয়া ভাবিয়াছি, স্বদেশী যুগে কবি যে রুদ্র বীণায় ঝঙ্কার দিয়া সমগ্র বাঙ্গলা দেশকে রোমাঞ্চিত করিয়া তুলিয়াছিলেন তিনি সহসা সে বীণা ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন কেন? যিনি জাতীয় ভাবের দ্যোতনায় বাঙ্গালী যুবকের চিত্তলোক আলোড়িত করিয়াছিলেন, তিনি আধ্যাত্মিকতার পথে বিশ্বমানবের কল্যাণলোকে যাত্রা করিলেন কেন? কবির সহিত মুখোমুখী হইয়া এই সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার জন্য মন মাঝে মাঝে উতলা হইয়া উঠিত। ক্রমে সভায় বৈঠকে তাঁহার সান্নিধ্য লাভ করিয়াছি। নানা বিষয়ে তাঁহার কথা উৎকীর্ণ হইয়া শুনিয়াছি, কিন্তু কথা কহিবার সাহস হয় নাই।

বহুদিন পরে সে সুযোগ আসিল। আমাদের লক্ষ্য ছিল, অল্প কথা বলিয়া বেশী কথা আদায় করিয়া লইব। কথায় কথায় বেদনার্ত্ত দৃষ্টি

মেলিয়া কবি বলিয়া উঠিলেন, তোমরা ভাব কবি ভাবের নেশায় বুঁদ হইয়া বসিয়া আছে। সহর ছাড়িয়া আমি যে আমার কর্ম্মজীবন এই পল্লীতে কেন উৎসর্গ করিয়াছি তাহা তো তোমরা দেখিলে না। তোমরা জান না যে, বাঙ্গলার নীচের স্তরের মানুষগুলির সহিত আমার কি ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। এককালে পদ্মার দুই তীরে এই মানুষগুলির সহিত নানা উপলক্ষে আমার পরিচয় ঘটিয়াছে। আমি তাহাদের দারিদ্র্য দেখিয়াছি দুঃখ দেখিয়াছি, দেখিয়াছি কুসংস্কার ও অশিক্ষায় উহাদের দুঃখ কত গভীর। এখানেও সেই দুঃখ প্রতিদিন দেখি। দুঃখ লাঘবের চেষ্টা করিতে পারি, কিন্তু প্রতিকার ত আমার হাতে নাই। এই বিশ্বভারতীর শিক্ষা ও সংস্কৃতি আমার একমাত্র লক্ষ্য নহে। তাই রথীকে (পুত্র) দিয়া স্থরুল শ্রীনিকেতনে কর্ম্মশালা স্থাপন করিয়াছি। কৃষি ও কুটীর-শিল্প উন্নততর প্রথায় চারিদিকের গ্রামে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা চলিতেছে। তোমরা কেবল কবিকেই দেখিয়া যাইও না। কালীমোহনের সঙ্গে একবার গ্রামগুলি ঘুরিয়া দেখ, কবি কি করিতেছে ইত্যাদি।

কর্ম্মী রবীন্দ্রনাথ, পল্লী ও পল্লীবাসীর উন্নতিতে ব্রতী রবীন্দ্রনাথের পরিচয় বাঙ্গলা দেশ বাঙ্গালী জাতি সম্যক্‌রূপে গ্রহণ করে নাই কবির এই অভিযোগ সত্য। কিন্তু তাঁহার সম্মুখে এই অভিযোগ সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া স্বীকার করি নাই। মনে আছে, আমরা বলিয়াছিলাম, অদ্যকার দিনে যে সকল কর্ম্মী বাঙ্গলার নানা কেন্দ্রে গঠনমূলক কাজ ও শিক্ষা বিস্তারে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন তাঁহাদের জীবনে কবির প্রভাব অসীম। তাঁহারা কবির কাব্য হইতে কেবল ভাবরস পান করেন না, তাঁহার কর্ম্মজীবন হইতে প্রেরণা গ্রহণ করেন, তাঁহার উদ্দীপনাময়ী বাণী হইতে বল সঞ্চয় করেন।

কবি রবীন্দ্রনাথ যে কেবল ভাবের বাষ্পে ভরা রঙ্গীন ফানুষের মত উর্দ্ধলোকে বিহার করেন না, মাটিতে দাঁড়াইয়া প্রতি দিন প্রতি পলে মাটির মানুষের সুখ-দুঃখের সংবাদ রাখেন এবং এই পরাধীন দেশের বিশাল মানব-সমষ্টির দুর্ভাগ্য তাঁহাকে প্রতিনিয়ত কি পীড়া দেয় তাহার সত্য পরিচয় প্রয়োজন ছিল। সেদিন কবির তীক্ষ্ণ বাণী শরবৎ ঋজুতায় হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছিল। তাহার ঝঙ্কারের রেশ এখনও কর্ণকুহরে বাজিয়া উঠে—"তোমাদের হাতে মানুষকে ভোলাবার, জাগাবার যন্ত্র আছে। তোমরা বহু লোককে কথা শোনাতে পার এইটি মনে রেখো।"

কর্ম্মী রবীন্দ্রনাগ তাঁহার মহতী কল্পনাকে বাস্তব রূপ দিতে পারেন নাই। অর্থের অভাব, কর্ম্মীর অভাব ছাড়াও এই পরাধীন দেশের কুসংস্কারাচ্ছন্ন জড়বুদ্ধির রক্ষণশীলতার বাধাও অল্প নহে। এই দুর্ভাগা দেশে সাফল্য ও ব্যর্থতার দ্বারা মানব মহত্ত্ব পরিমাপ করা যায় না। বিদ্যাসাগরের মত অদ্ভুতকর্ম্মা তেজস্বী বীর আজীবন সমাজের বিরুদ্ধতার সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াও বিধবা-বিবাহ চালাইতে পারেন নাই, সে দোষ কি তাঁহার? কর্ম্মী রবীন্দ্রনাথের কর্ম্ম প্রচেষ্টা ও পল্লীগঠন যদি বহু প্রতিকূল বাধা অতিক্রম করিয়া সমগ্র দেশে প্রসারলাভ না করিয়া থাকে তবে সে দোষ নিশ্চয় তাঁহার নয়। এই অসাফল্যে মাঝে মাঝে তাঁহার চিত্ত ক্ষুব্ধ হইলেও তিনি কখনও নৈরাশ্যে হাল ছাড়িয়া দেন নাই এবং এখনও প্রতি দিন পল্লী কর্ম্মীদিগকে তিনি উৎসাহ ও উপদেশ দিয়া থাকেন। আশ্চর্য্য তাঁহার ধৈর্য্য, সীমাহীন তাঁহার অধ্যবসায়। যেদিন বোলপুরে বিদ্যালয় খুলিয়া তিনি শিশুশিক্ষার ভার লইয়াছিলেন সেদিন অনেকে তাঁহাকে উপহাস করিয়াছিল। যে কাজ পঁচিশ ত্রিশ টাকা মাহিনার শিক্ষকের সেই কাজে রবীন্দ্রনাথ

সময় ও শক্তির অপব্যয় করিবেন এ চিন্তা পর্য্যন্ত অনেকের নিকট দুর্ব্বিষহ হইয়া উঠিয়াছিল। তখন অল্পলোকই ভাবিয়াছিলেন, একটি মানবশিশুর মনে স্বাভাবিকভাবে জ্ঞান পিপাসা জাগ্রত করার আনন্দ একটি কবিতা বা গান লেখার আনন্দ অপেক্ষা কম নহে। নবযুগের নূতন মানুষ গড়িবার জন্য রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সময় শক্তি ও অর্থ নিয়োগ করিয়াছিলেন। দেশের প্রতি, জাতির প্রতি তাঁহার মমত্ববোধ কি গভীর আমরা আজিও কি তাহা উপলব্ধি করিয়া তাঁহার ব্রতের উত্তর সাধক হইব না ?

কবি ও কর্ম্মী রবীন্দ্রনাথ নব্য বাঙ্গলার গুরুদেব, এই নামই তাঁহার সত্য পরিচয়। আজ যদিও রবীন্দ্রনাথের জীবনসূর্য্য অস্তাচলের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে তথাপি তাহার অম্লান রশ্মিমালায় প্রতিনিয়ত আমাদের শিরে কল্যাণাশীষ বর্ষিত হইতেছে। এই কল্যাণ আমরা যেন কৃপণের গুপ্তধনের মত অকর্ম্মণ্য না করিয়া রাখি, সমাজজীবনের স্তরে স্তরে যেন ইহা বহন করিয়া লইয়া যাইবার শক্তি লাভ করি। প্রণাম নিবেদন করিয়া অদ্যকার শুভ দিনে এই আশীর্ব্বাদই আমরা গুরুদেবের নিকট কামনা করিতেছি। যুক্তপাণি হইয়া আমরা উপনিষদের ভাষায় প্রার্থনা করিব—

"হিরণ্ময়েন পাত্রেন সত্যস্যাপি হিতম্ মুখম্
তত্তপুষণ নপাবৃণু সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে ॥"

২৫শে বৈশাখ, ১৩৪৮

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন

১৯১৫ সালের ফাল্গুন মাস। "প্রবুদ্ধ ভারত" পত্রিকার সম্পাদক স্বামী প্রজ্ঞানন্দের আহ্বানে চিত্তরঞ্জন দাশ বেলুড় মঠে আসিয়াছেন। স্বামী প্রজ্ঞানন্দ, আলীপুর ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম আসামী দেবব্রত বসু। তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ও চরিত্রের দৃঢ়তায়, চিত্তরঞ্জন তাঁহাকে গভীর শ্রদ্ধা করিতেন। কেবল চিত্তরঞ্জন নহেন, স্বদেশী যুগের যুবক দেশকর্ম্মীরা নেতারূপে অরবিন্দ ও দেবব্রতকে সমান মর্য্যাদা দিতেন। ভোগী ও বিলাসী চিত্তরঞ্জন এবং যোগী ও সন্ন্যাসী প্রজ্ঞানন্দের মধ্যে কোথায় যে মনের কি মিল ছিল তাহা বলিবার জন্য কেহই বাঁচিয়া নাই।

চিত্তরঞ্জন রাত্রে মঠেই থাকিবেন। রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের জননীস্বরূপা বাবুরাম মহারাজ (স্বামী প্রেমানন্দ) ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন। ব্যারিস্টার —দেশী সাহেব। অতএব আতিথেয়তার যেন কোন ত্রুটি না হয়। স্বামিজী আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, "তুই দাশসাহেবের সঙ্গে থাকবি, যেন ওঁর কোন কষ্ট না হয়।" আমি আনন্দের সহিত এ ভার গ্রহণ করিলাম। চিত্তরঞ্জনের সহিত আমার পূর্ব্ব পরিচয় অতি সামান্য। কয়েকবার কোচবিহার রাজবাড়ীতে এবং ব্যারিস্টার জে, এন রায়ের গৃহে তাঁহাকে দেখিয়াছি। আলীপুর ষড়যন্ত্র মামলায়, যিনি অরবিন্দ বারীন্দ্র প্রমুখ বহু যুবককে ফাঁসিকাষ্ঠ হইতে রক্ষা করিয়াছেন এবং আরও বহু বিপ্লবীকে পুলিস পীড়ন হইতে রক্ষা করিবার জন্য বারংবার রাজদ্বারে উপস্থিত হইতেছেন তাঁহার প্রতি বিস্ময় বিমুগ্ধ শ্রদ্ধাপোষণ যে কোন বাঙ্গালী যুবকের পক্ষে স্বাভাবিক।

স্বামিজীদের সহিত আলোচনায় বহু সময় কাটাইয়া চিত্তরঞ্জন বিশ্রামের জন্য গাত্রোত্থান করিলেন। বেলুড় মঠের সংলগ্ন উত্তরদিকের কুণ্ডুবাবুদের বাটিতে শয়নের ব্যবস্থা হইয়াছে। তিনি শয়ন করিলেন, আমি পাখা লইয়া বাতাস করিতে লাগিলাম। ইতিমধ্যে আমার পরিচয় লইলেন, সন্ন্যাসী হইব কি-না জিজ্ঞাসা করিলেন। এতবড় একটা মানুষের সম্মুখে বাচাল হওয়া কঠিন। সংক্ষেপে উত্তর দিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ পর বলিলেন, ঘরের মধ্যে ভাল লাগ ছে না, চল গঙ্গার ধারে একটু বসি। গঙ্গার দিকে চাহিয়া চিত্তরঞ্জন উন্মনা হইলেন। অন্ধকার রাত্রি—গঙ্গার দুই তীরের আলো নদীর জলে পড়িয়াছে,—নৌকা ভাসিয়া যাইতেছে। সহসা উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিলেন, "দেখ, নদী আর নৌকা দেখলে আমার পূর্ব্ববঙ্গের কথা মনে পড়ে,—আলো আর জলের সোনালী রঙেই সোনার বাঙ্গলা।" একখানি ছোট ষ্টিমার উজান বাহিয়া চলিয়াছে। তিনি বালকের মত সরল ভাবে বলিতে লাগিলেন, "ইচ্ছা হয়, অমনি একখানা ছোট স্টিমার কিনি আর বাঙ্গলার নদীতে নদীতে ভেসে বেড়াই।" আমি অবাক হইয়া তাঁহার কথা শুনিতে লাগিলাম। আমার মত একজন স্বল্পপরিচিত সাধারণ যুবকের সম্মুখে তিনি কি অনায়াসে নিজের হৃদয় উন্মুক্ত করিলেন। কথা বলিতে বলিতে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিলেন,— "তুমি কাকে বেশী ভালবাস।" একি প্রশ্ন? লজ্জায় আড়ষ্ট হইয়া রহিলাম, চিত্তরঞ্জন হাসিয়া ফেলিলেন,—"তুমি মধ্যরাত্রে ঘুম ভাঙ্গিয়ে যদি ঐ প্রশ্ন আমাকে জিজ্ঞাসা কর, তাহলে আমি দ্বিধা না করে বল্‌বো, সব চেয়ে বেশী ভালবাসি, বাঙ্গলাদেশকে।" সেই হাস্যোজ্জ্বল প্রশান্ত মুখখানির দিকে সম্ভ্রমভরা দৃষ্টি মেলিয়া নীরব শ্রদ্ধা নিবেদন করিলাম।

কবি ও বৈষ্ণব, দয়ালু ও প্রেমিক, সহজদাতা ও পরদুঃখকাতর চিত্তরঞ্জনের সহিত ইহাই আমার প্রথম ঘনিষ্ঠ পরিচয়। 'সাগর-সঙ্গীতের'

কবি চিত্তরঞ্জনের সাহিত্য সাধনার কথা আমরা প্রায় ভুলিয়া গিয়াছি। অসহযোগ আন্দোলনে ভারতের মুক্তির জন্য সর্ব্বস্ব পণ করিবার পূর্ব্বে, বিবেকানন্দ-বঙ্কিমের চিন্তাধারায় পুষ্ট চিত্তরঞ্জন 'আত্মবিস্মৃত' বাঙ্গালী জাতিকে আত্মস্থ হইবার জন্য কাব্য ও সাহিত্যের মধ্য দিয়া তারস্বরে আহ্বান করিতেছিলেন। ১৯১৭ সালে ভবানীপুরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের সভাপতির আসন হইতে তাঁহার অভিনব অভিভাষণ "বাঙ্গলার কথা", সেদিন বাঙ্গালীর চিত্তবীণায় নূতন সুরের ঝঙ্কার তুলিয়াছিল। বাঙ্গলার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের উপর জোর দিয়া চিত্তরঞ্জন "বাঙ্গলার সুর ও রূপ"কে 'নারায়ণের' বক্ষে প্রতিষ্ঠা করিলেন। 'সবুজপত্র' ও 'নারায়ণের' 'বিশ্ব বনাম বাঙ্গলার' সাহিত্যযুদ্ধ চিত্তরঞ্জনের জীবনের একটা বিশিষ্ট অধ্যায়। সাগর-সঙ্গীতের পর তাঁহার 'অন্তর্য্যামী' 'মালঞ্চ' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থের মধ্যে আমরা কেবল বাঙ্গলার গীতি কবিতার সুরের রেশই পাই নাই,—আমরা কান পাতিয়া শুনিয়াছি, হরজটাজাল নিবদ্ধ জাহ্নবীর নির্গমনের আবেগে অবরুদ্ধ কলধ্বনির মত একটা অশান্ত অতৃপ্ত জীবনের গণ্ডী কাটিয়া বাহির হইবার দুরন্ত প্রয়াস। চণ্ডীদাসের কাব্য ও মহাপ্রভুর ধর্ম্ম লইয়া ভাবরসমুগ্ধ কবি চিত্তরঞ্জন—জাতির পারম্পর্য্যের সহিত নিজের সামঞ্জস্য বিধান করিয়া বাঙ্গালীর নব অভ্যুদয়ের ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। এইকালে তাঁহার সাহিত্য-জীবনের সহিত যাঁহারা ঘনিষ্ট ছিলেন তাঁহারা বুঝিতেন, বাহিরের সমস্ত কর্ম্মকোলাহলের মধ্যেও তিনি যেন এক মহামৌন তপস্যায় মগ্ন। অর্থাগম, ভোগ বিলাসের মধ্যেও অনাসক্ত চিত্তরঞ্জন যেন নিজেকে এক সুকঠিন ব্রতের জন্য প্রস্তুত করিতেছেন। অস্ত্রে ও বর্ম্মে সুসজ্জিত সেনাপতি যেন একটা আহ্বানের জন্য প্রতীক্ষমান, বারুদ যেন বিস্ফোরণের আশায় অগ্নিকে কামনা করিতেছে। বিলাস-ব্যসনের লঘু আনন্দের মধ্যে তিনি শ্মশানের শূন্যতা

অনুভব করেন, নিজের অজ্ঞাতসারেই ভিতরের মানুষটি বলিয়া উঠে— ভাল লাগে না, ভাল লাগে না। কিন্তু মুক্তির দিন কবে—কত দূরে!

আইন ব্যবসায়ের ক্রমশঃ প্রসার হইতেছে—কিন্তু আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করিয়াও তাঁহাকে সন্ত্রাসবাদী রাজদ্রোহের মামলা লড়িতে হয়। পুলিসের কলঙ্কমলিন কাহিনীর অপবাদ হইতে তিনি বাঙ্গলা ও বাঙ্গালীর সুনাম রক্ষা করিবেন এবং বৃটিশ আইনের ভণ্ডামী ও কাপট্য উদ্ঘাটন করিবেন, এই তাঁহার পণ। সাধারণের কাজের চাপ বাড়িতে লাগিল। ১৯১৬ সালে লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে পুনরায় জাতীয় দল, মডারেটদের সহিত একযোগে জাতীয় দাবীকে প্রবল করিয়া তুলিলেন, মুসলিম লীগ কংগ্রেসের সহিত যোগ দিয়া উহা সমর্থন করিল। নির্ব্বাসন হইতে লোকমান্য তিলক ফিরিয়াছেন। ইয়োরোপে প্রথম মহাযুদ্ধে লিপ্ত বৃটিশ ও মার্কিন নেতারা স্বায়ত্তশাসন ও প্রত্যেক জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের বড় বড় কথা বলিতেছেন। ১৯১৭ সালের আগস্ট মাসে বৃটিশ গভর্নমেণ্ট ভারতকে স্বায়ত্তশাসন দিবার প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় জাতীয় আন্দোলনে এক নবীন উৎসাহ দেখা দিল। ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তীর নেতৃত্বে গঠিত বাঙ্গলার নূতন জাতীয় দলের প্রাণস্বরূপ হইলেন চিত্তরঞ্জন। বিপিনচন্দ্র তাঁহাকে আইন ব্যবসায় হইতে রাজনীতিক্ষেত্রে টানিয়া আনিলেন। জনসাধারণ ও ছাত্র সমাজের প্রিয় চিত্তরঞ্জনের আবেগময়ী বক্তৃতায় সমস্ত বাঙ্গলা দেশে উৎসাহের তরঙ্গ উঠিল।

মহাযুদ্ধের অবসানে বৃটিশ আমলাতন্ত্র ক্রমবর্দ্ধিত রাজনৈতিক আন্দোলন দমন এবং সাম্রাজ্যের শৃঙ্খল পাকা করিবার জন্য সংশোধিত ফৌজদারী আইনের বিল তৈয়ারী করিলেন এবং কেন্দ্রীয় আইন সভার প্রতিবাদ সত্ত্বেও, বড়লাট উহা আইনে পরিণত করিলেন; তবে উহার মেয়াদ তিন বৎসর নির্দ্দিষ্ট করা হইল। এই দুর্নীতিমূলক আইনের

বিরুদ্ধে মহাত্মা গান্ধী সত্যাগ্রহ ঘোষণা করিলেন। এতদিনে চিত্তরঞ্জন বাহির হইবার পথের সন্ধান পাইলেন এবং বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের ময়মনসিংহ অধিবেশনে নিজেকে সত্যাগ্রহী বলিয়া ঘোষণা করিলেন। তারপর পাঞ্জাবে সামরিক আইন, জালিওয়ালানাবাগ, কংগ্রেস তদন্ত কমিটি, অমৃতসর কলিকাতা ও নাগপুর কংগ্রেস—চিত্তরঞ্জন সর্ব্বত্যাগী হইয়া দেশবন্ধু রূপে স্বরাজ সাধনার সর্ব্বভারতীয় নেতারূপে আত্মপ্রকাশ করিলেন। গর্ব্ব ও গৌরবের সহিত বাঙ্গলার স্বাধীনতাকামীরা দেশবন্ধুর নেতৃত্বে বিঘ্নবহুল দুর্গম পথের যাত্রী হইল।

বাঙ্গালী ও বাঙ্গলাদেশকে যিনি এতকাল সমস্ত অন্তর, সমস্ত সেবা দিয়া ভালবাসিয়াছেন—রূপান্তরের পথে মহভারতের মুক্তি দিশারী রূপে তিনি আর এক মূর্ত্তিতে দেখা দিলেন। মানুষকে প্রাণ দিয়া ভালবাসার উদার হৃদয়বত্তা, মানুষকে বিশ্বাস করিবার আশ্চর্য্য ঔদার্য্য যাঁহার মধ্যে দীর্ঘকাল লক্ষ্য করিয়াছি—স্বজাতিপ্রীতি ও দেশাভিমানের মূর্ত্তবিগ্রহ সেই চিত্তরঞ্জনের আহ্বানে বাঙ্গলার জনসমুদ্র যে চন্দ্রাকর্ষিত সমুদ্রের মত উদ্বেল হইয়া উঠিবে তাহাতে আর বিচিত্র কি? মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের বাণী-মূর্ত্তি বাঙ্গালীর চক্ষুর সম্মুখে প্রকট হইল—"আপনি আচরি ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়।" বাঙ্গলার ঐতিহ্য ও পারমার্থের ধারায় স্বীয় প্রখর ব্যক্তিত্বের উপর দণ্ডায়মান হইয়া যে মহামানব নবযুগের নূতন ইতিহাস রচনা করিয়াছেন—সেই দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মহত্ব ও করুণা, প্রেম ও বীর্য্যের কত কাহিনী আজিকার দিনে ঘুরিয়া ফিরিয়া মনে পড়িতেছে। ফরিদপুর হইতে দারজিলিং যাত্রার প্রাক্কালে তিনি বলিয়াছিলেন—"আর কলহ ও ভেদ নয়, দলাদলিতে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছি। এবার ফিরিয়া সকলকে, সমস্ত দেশকর্ম্মীকে কংগ্রেসী কেন্দ্রে মিলিত করিব।" তাঁহার সে আশা পূরণ হয় নাই এবং আমরাও মিলন ও ঐক্যের নামে দীর্ঘকাল

অবাঞ্ছিত দলাদলির জের টানিয়া চলিয়াছি এবং অবশেষে কংগ্রেসকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়াছি। সেই দুর্ব্বলতার উপর বৃটিশ আমলাতন্ত্র নিরপেক্ষভাবে দুই পক্ষকেই আঘাত করিয়াছে। বৃটিশ দমননীতিতে জর্জ্জরিত এবং কূটনীতিতে জাতীয় ঐক্য বিশ্লিষ্ট হইলেও জাতীয় কংগ্রেস মরে নাই—জাতীয় স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাও অনির্ব্বান রহিয়াছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষ অঙ্কে আন্তর্জ্জাতিক রাষ্ট্রক্ষেত্রে যে সকল ঘটনার সমাবেশ হইতেছে তাহার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিবার জন্য সমগ্র ভারতের সহিত বাঙ্গালীকেও প্রস্তুত হইতে হইবে। আমাদের সৌভাগ্যক্রমে জাতীয় ঐক্যের প্রতীক স্বরূপ গান্ধিজী এখনো নেতৃত্বের ভূমিকায় স্বাধীনতা আন্দোলনের রশ্মি ধারণ করিয়া আছেন; এই সময় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের ১৯২৬ সালের ফরিদপুরের সর্ব্বশেষ আহ্বানবাণী আমাদের উদ্বুদ্ধ করুক। নষ্টবুদ্ধির দ্বারা প্রতারিত, লুব্ধ বিষয়ীর পাটোয়ারী বুদ্ধির দ্বারা বিশ্লিষ্ট, ভাগ্যান্বেষী ও সুবিধাবাদীদের কুযুক্তিতে বিভ্রান্ত বাঙ্গলাকে আবার কেন্দ্রসংহত ও আত্মস্থ করিবার সাধনার প্রেরণা আমরা মালিন্যমুক্ত চিত্তে দেশবন্ধুর মহৎ জীবন হইতে গ্রহণ করিব। এতবড় একটা ঐতিহাসিক সুযোগকে ব্যর্থ করিয়া দিয়া অরণ্যে রোদনের দীনহীনের আত্মবঞ্চনা বীরের ব্রত নহে।

১৫ই জুন, ১৯৪৫

মহাত্মা গান্ধী

মহাত্ম গান্ধীর ষট্-সপ্ততিতম জন্মদিনে আমরা সমগ্র দেশবাসীর সহিত মিলিত হইয়া তাঁহার উদ্দেশ্যে প্রণাম ও শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি। আজ পৃথিবীতে দ্বিতীয় গান্ধী নাই, তাঁহার চিন্তাধারা কঠোর নৈতিক জীবন সমগ্র জগতের বিস্ময়। তাঁহার সমগ্র জীবন, আধুনিক সভ্যতার প্রতিবাদ। যন্ত্র-জটিল আধুনিক জীবনযাত্রা প্রণালীর বহুমুখী বৈচিত্রকে তিনি উন্নতি বলিয়া মনে করেন না, কৃষি ও কুটির শিল্পের উপর প্রতিষ্ঠিত সরল অনাড়ম্বর সয়ম্পূর্ণ পল্লীজীবন তাঁহার কাম্য। বর্ত্তমান যুগের অর্থনৈতিক বৈষম্য প্রসূত শ্রেণী সংঘর্ষের মধ্য দিয়া শোষক শ্রেণীর ক্রমবিলুপ্তির ঐতিহাসিক অপরিহার্য্য দ্বন্দ্বের মধ্যে হিংসা দেখিয়া তিনি ব্যথিত হন। তাঁহার অহিংসার আদর্শ এক রহস্যময় আধ্যাত্মিক বস্তু। এই দৃষ্টিভঙ্গী হইতে রাষ্ট্র, সমাজ, পরিবার ও ব্যক্তি সম্পর্কে তিনি যাহা বলেন, তাহা যুক্তিপন্থী বৈজ্ঞানিক যুগের অনুকূল নহে। কিন্তু স্বদেশের স্বাধীনতা, মানবকল্যাণ ও সামাজিক সুবিচারের জন্য প্রবলের বিরুদ্ধে তাঁহার আজীবন সংগ্রাম তাঁহাকে সভ্য জগতে এবং ভারতে এক অসামান্য মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। ঘটনাক্রমে গান্ধিজী রাজনৈতিক আন্দোলনের নেতা, যদি ঘটনাচক্র অন্য কোনভাবে আবর্ত্তিত হইত অর্থাৎ গান্ধিজী যদি ধর্ম্ম-প্রচারকের ভূমিকা গ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে অদ্যকার জগতে বুদ্ধ খৃষ্ট অপেক্ষাও তিনি অধিকতর জনপ্রিয় হইতেন। অবতার রূপে নিজেকে প্রচার করিয়া সর্ব্বদেশের লোক সমাজে প্রতিষ্ঠালাভের প্রলোভন তিনি জয় করিয়াছেন। ঈশ্বরানুরাগ, অন্তরের বাণী, উপবাস

কৃচ্ছ্র ব্রত সত্ত্বেও তিনি ধর্ম্মগুরুর ভূমিকায় অবতীর্ণ না হইয়া ভারতের রাষ্ট্রগুরু এ জন্য আমরা তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ। ১৯০৬ সাল হইতে তিনি অহিংস প্রতিরোধ নীতির উপর দাঁড়াইয়া অন্যায় অবিচার পীড়ন ও শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াছেন এবং সেই সংগ্রাম জনসাধারণকে শিক্ষা দিয়াছেন। দুর্নীতিমূলক আইন ও ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংযত অবাধ্যতা দ্বারা প্রবলের নৈতিক বোধ জাগ্রত করিবার প্রয়াস—এই অভিনব সংগ্রাম কৌশল গান্ধিজীর আবিষ্কার এবং বিশ্বসভ্যতায় ইহা তাঁহার শ্রেষ্ঠ দান। নিরস্ত্র পরাধীন ভগ্নমেরুদণ্ড জাতি তাঁহার সত্যাগ্রহের বাণীতে অনুপ্রাণীত হইয়া অসাধ্য সাধন করিয়াছে, মানবীয় মর্য্যাদা ফিরিয়া পাইয়াছে।

১৯২০-২১ এ তাঁহার অহিংস অসহযোগের কর্ম্মপন্থা গ্রহণ করিয়া জাতীয় কংগ্রেস প্রথম গণশক্তির সহযোগিতায় দুর্জ্জয় হইয়া উঠিয়াছিল। পরাধীন ভারতের প্রতিনিধিরূপে কটিমাত্র কৌপিন সম্বল কৃশজীর্ণতনু গান্ধিজী যেদিন প্রবল প্রতাপ বৃটিশ সাম্রাজ্য ধুরন্ধরদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, “এই শয়তানী সাম্রাজ্য আমি ধ্বংস করিতে চাই” সেদিন সমগ্র জগত চমৎকৃত হইয়াছিল। এমন নৈতিক শক্তিতে বিশ্বাসী স্পর্দ্ধাবাক্য ইতিহাসে বিরল। সেদিন ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে এক অভিনব রূপান্তর দেখিয়া বাঙ্গলার কবি উচ্ছ্বাসিত হইয়া বলিয়াছিলেন, “কুলী কৌঁসুলী করে কোলাকুলী কবে বা ছিল এ রঙ্গ !” গান্ধী দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণীত জননায়কগণ জনসাধারণের মধ্যে নামিয়া আসিলেন, কংগ্রেস গণশক্তির স্বরাজ-সাধনার পীঠভূমিতে পরিণত হইল। ত্যাগ ও দুঃখের পথে তাঁহার নৈতিক সংগ্রামের মধ্য দিয়া জাতীয় চরিত্রে অভূতপূর্ব্ব সৎসাহস জাগ্রত হইল। ১৯২১-৪৫ এই সুদীর্ঘ কাল ভারতবাসীকে তিনি বারম্বার সংঘর্ষে প্রবৃত্ত করিয়াছেন। অথচ জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী হইয়াও তিনি

কখনো সম্মানজনক আপোষের পথ রুদ্ধ করেন নাই। প্রতিক্রিয়াশীল বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের রূঢ়তাই তাঁহাকে অনন্যোপায় করিয়া সংগ্রামের পথে টানিয়া লইয়াছে। ভারত ও বৃটেনের পরম দুর্ভাগ্য যে রক্ষণশীল বৃটিশ শাসকেরা গান্ধিজীর মত বান্ধবের প্রতি বারম্বার উদ্ধত ব্যবহার করিয়া ভারতবাসীর লাঞ্ছনা ও অসন্তোষ বৃদ্ধি করিয়াছেন।

সত্যাগ্রহী পরাজয় কাহাকে বলে জানে না। এই জ্বলন্ত বিশ্বাস লইয়া গান্ধিজী আজিও ভারতের সর্ব্বজনশ্রদ্ধেয় জননায়করূপে অটলোন্নত শিরে দাঁড়াইয়া আছেন। মানুষের ক্ষুদ্রতা, নীচতা, স্বার্থপরতা তিনি দেখিয়াছেন, অযোগ্যের বহু অপভাষণ ও ক্রূর বৈরতা তিনি স্নিগ্ধহাস্যে সহ্য, ক্ষমা এবং উপেক্ষা করিয়াছেন। প্রবলের প্রচণ্ডতর দুর্নীতি কলুষিত আঘাতে, দুরভিসন্ধিপূর্ণ হীন পরিবাদরটনায় তাঁহার হৃদয় বহু রেখায় বিদীর্ণ হইয়াছে। অন্ধকার পৃথিবী রণহিংসায় উন্মত্ত—মানুষের প্রাচীন প্রতিষ্ঠান পুরাতন বিশ্বাস খান খান হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। ৪ কোটি সশস্ত্র মানুষ সপ্তসমুদ্রের তীরে তীরে নরমেধযজ্ঞে ব্রতী। এই দ্রুত পরিবর্ত্তিত জগতে, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের মূঢ় আস্ফালন এবং সত্যের অপলাপ করিবার চেষ্টা দেখিয়াও তিনি মানুষের শুভবুদ্ধির উপর বিশ্বাস হারান নাই। তাঁহার সুপরামর্শ বারম্বার প্রত্যাখ্যান করা সত্ত্বেও, তিনি তাঁহার নিরভিমান সারল্য লইয়া বৃটিশ শাসকশ্রেণীকে কল্যাণের পথ গ্রহণ করিতে এবং ন্যায় ধর্ম্ম ও সত্যকে অবমাননা হইতে রক্ষা করিবার অনুরোধ করিতেছেন। ইতিহাসের এতবড় একটা সঙ্কটের দিনেও প্রকৃতি-কৃপণ চার্চিল-এমেরী কোম্পানী গান্ধিজীর সহযোগীতার জন্য উন্মুখ হস্তে শৃঙ্খল পরাইয়া দিতে লজ্জাবোধ করেন নাই। কংগ্রেসকে বে-আইনী ও নেতৃবৃন্দকে কারারুদ্ধ করিয়া, তাঁহারা ভারতের জাতীয় দাবীকে কৃত্রিম উপায়ে ঠেকাইয়া রাখিয়াছেন। ক্ষোভে, বেদনায় ম্রিয়মান

গান্ধিজী আজ ভারতের জনগণের পক্ষ হইতে মানবতার বিচারশালায় সুবিচার প্রার্থনা করিতেছেন। আজ যাহারা গান্ধিজীকে আসামী করিয়া অভিযোক্তার ভূমিকায় অভিনয় করিতেছে, কাল ইতিহাসের অমোঘ সাক্ষ্যের ফলে তাহাদেরই আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াইয়া জবাবদিহি করিতে হইবে। ভারতের ন্যায্য প্রাপ্য স্বাধীনতার দাবীর কণ্ঠ সিভিলিয়নী আমলাতন্ত্রের কঠোরহস্ত দীর্ঘদিন চাপিয়া রাখিতে পারিবে না।

গান্ধী-চরিত্র দুরবগাহ। রাজনীতিক্ষেত্রে তাঁহার চিন্তায় ও কার্য্যে আমরা বহু স্ববিরোধীতা দেখিয়াছি। রাজনৈতিক আন্দোলনে বহু অভাবনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া সময় সময় তিনি অনুগামীদের বিস্ময়ে হতবাক করিয়াছেন। বারম্বার দীর্ঘ উপবাস করিয়া দেশবাসীকে প্রচুর বেদনা দিয়াছেন। তিনি এমন অনেক কথা বলিয়াছেন ও বলেন, যাহা যুক্তিপন্থী মনের পক্ষে মানিয়া লওয়া কঠিন। কিন্তু হতদরিদ্র, দৈবনির্ভর শতাব্দীচয়ের পীড়নে সঙ্কুচিত মনের অন্ধ সংস্কার ভরা ভারতের সাধারণ মানুষ, বিশেষভাবে কৃষক শ্রেণীর মনোভাবের সহিত তাঁহার সংস্কার ও মানসিক গঠনের আশ্চর্য্য সাদৃশ্য আছে, ফলে, তিনি জনমণ্ডলীর উপর এক আশ্চর্য্য প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন। বর্ত্তমান ভারতে জনসাধারণের সহিত তাঁহার কোন পার্থক্য নাই, কোটি কোটি নরনারীর চেতন ও অচেতন আকাঙ্ক্ষার তিনি ঘনীভূত প্রতীক। একটা পরাধীন জাতির ক্লিষ্ট ও পীড়িত আত্মার তিনি সজীব বিগ্রহ। তাঁহার কণ্ঠ আশ্রয় করিয়া ভারতবর্ষ কথা বলে, তাঁহার চিন্তার সহিত ভারত চিন্তা করে, তাঁহার অঙ্গুলীহেলনে আসমুদ্র হিমাচল চন্দ্রাকর্ষিত সমুদ্রের মত উদ্বেল হইয়া উঠে। মানবসুলভ বহু কোমলতা সত্ত্বেও তিনি কঠোর তপস্বী জীবন যাপন করেন, বসনে ভূষণে জীবনযাত্রায় তিনি একজন আদর্শ ভারতীয় কৃষক। তাঁহার অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্ব মানুষকে চুম্বকের মত

আকর্ষণ করে, মানুষ স্বেচ্ছায় তাঁহার নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া সুখী হয়। তাঁহার সদাহাস্য রঞ্জিত মুখে যাদু আছে, যাহা নিমেষে হৃদয়ের ভার লঘু করিয়া দেয়, তাঁহার শিশুর মত সারল্য সকলকে মুগ্ধ করে। তিনি যখন কোন স্থলে প্রবেশ করেন, তখন চারিদিক নির্ম্মল ও প্রশান্ত হইয়া উঠে। তিনি যে ভারতের কংগ্রেসী রাজনৈতিক আন্দোলনে সকলশ্রেণীর নরনারীকে একত্র করিয়াছেন, তাহা বলপ্রয়োগ করিয়া নহে ঐহিকের প্রতিষ্ঠা ও সুখের লোভ দেখাইয়াও নহে, স্বীয় জীবনের সুমহৎ দৃষ্টান্ত সম্মুখে রাখিয়া নিত্য ত্যাগ সেবা দুঃখবরণের পথেই সকলকে আহ্বান করিয়াছেন। তাঁহার মহোচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণীত ভারতের অগণিত নরনারী অসামান্য ত্যাগস্বীকার করিয়া জাতীয় দাবীকে আজ আন্তর্জাতিক প্রশ্নের মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। ১৯১৯-২০-এ- সত্যাগ্রহের প্রথম সূচনা কালে বোম্বাইএর বিখ্যাত ব্যবসায়ী ও খিলাফৎ নেতা ওমর শোভানী তাঁহাকে আদর করিয়া বলিতেন, "ক্রীতদাসদিগের প্রিয়তম প্রভু"—এই কথাটি আজ বিশেষ ভাবে মনে পড়িল, আজিও তিনি ক্রীতদাসদের প্রিয়তম প্রভু।

বহু ব্যর্থতা, নৈরাশ্যের পর নৈরাশ্য, সাম্রাজ্যবাদী বিষাক্ত কূটকৌশলের গূঢ় দংশন, স্বদেশবাসীর দুর্ম্মতি ও প্রবলের উপাসনার প্রলোভন কিছুতেই তিনি বিচলিত হন নাই। তাঁহার চিরকাম্য হিন্দু-মুসলমান মিলনের সর্ব্বশেষ চেষ্টা সফল না হওয়ায় তিনি বিষণ্ণ হইলেও ক্ষুব্ধ হন নাই। স্বীয় আদর্শ এবং মানুষের মানবতার উপর অটল বিশ্বাস লইয়া অনন্ত আশাবাদী গান্ধী,—লাঞ্ছিত অপমানিত ক্ষুধা ও ব্যাধিজীর্ণ ভারতের শিয়রে বসিয়া আছেন। উত্তুঙ্গ হিমগিরির মত মনুষ্যত্বের এই অভ্রভেদী মহিমার সম্মুখে আজ সম্ভ্রমভরে মস্তক অবনত করিয়া আমরা কি ভাবিয়া দেখিব না, আজ বিরক্ত হইবার দিন নহে। দুঃখবেদনা আশাভঙ্গ-

জনিত মনোবেদনা কেবল আমাদের নহে, আজ প্রবলের উদ্ধত অভিযানে সমগ্র মনুষ্য-সমাজ পীড়িত ; দুঃস্থ মানবের দীর্ঘশ্বাস ও হাহাকারে বাতাস মন্থর। কত সন্তানহীনা জননী, জননীহারা শিশু, কত অকালবিধবা নারীর অসহায় অশ্রুবাষ্পে ধরণীর উপর, বিষাদের কুজ্মটিকা। কোথায় শান্তি, কল্যান, সর্ব্বমানবের মুক্তি ?—দৃষ্টি প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসে। স্বদেশের স্বাধীনতা সমষ্টি-মানবের সভ্যতা ও সংস্কৃতির সম্পদ রক্ষার যুদ্ধে কত দেশের সহস্র সহস্র বীরযুবকের বক্ষরক্তে ধরিত্রী রঞ্জিত হইতেছে। ধ্বংস ও হত্যার এই ভয়াল প্রলয়ের মধ্যেও যিনি তাঁহার আশ্বাস ও অভয়বাণী লইয়া আমাদিগকে কল্যাণের পথে শ্রেয়ের পথে পরিচালনা করিতেছেন, সেই পুরুষোত্তম গান্ধীকে আমরা নিশ্চয়ই অনুসরণ করিব। অন্ধকার জগতে অনেক বড় বড় নামধারী মিথ্যাপ্রতাপ বুদ্বুদের মত কাল-সমুদ্রে বিলীন হইয়া যাইবে—কিন্তু সর্ব্বমানবের ইতিহাসে যে মহাপুরুষের কীর্ত্তির বিজয়কেতন বহু শতাব্দী উড্ডীন থাকিবে—আমরা যেন তাঁহার অনুসরণ করিতে পারি,—স্বাধীনতাকামী ভারতের আজ ইহাই সঙ্কল্প হউক।

১৩ই অক্টোবর, ১৯৪৪